রফিকুল ইসলাম

বীরের এ রক্তস্রোত মাতার এ অশ্রুধারা

ভগবান, তুমি যুগে যুগে
দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে—
তারা বলে গেল
'ক্ষমা করো সবে',
বলে গেল 'ভালোবাসো—
অন্তর হতে বিদ্বেষবিষ
নাশো।'
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা,
তবুও বাহির-দ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের
ব্যর্থ নমস্কারে।

আমি যে দেখেছি,
গোপন হিংসা কপটরাত্রি-ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে।
আমি যে দেখেছি,
প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে
নিভৃত কাঁদে।...

বীরের এ রক্তস্রোত মাতার এ অশ্রুধারা

রফিকুল ইসলাম

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

প্রথম সংস্করণ
২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩৮০
১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৭৩

বাএ ৪৬২

প্রকাশনায়
ফজলে রাব্বি
পরিচালক
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় পরিদপ্তর
বাংলা একাডেমী
ঢাকা-২

মুদ্রণে
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় পরিদপ্তরের
মুদ্রণ বিভাগ

প্রচ্ছদ
কালাম মাহমুদ

মূল্য : বারো টাকা

BEERER A RAKTOSROT MATAR A ASRUDHARA
By RAFIQUL ISLAM

A commemorative anthology on the martyr intelectuals murdered by the brutal Pakistani Soldiers and their Bengali/Non-Bengali Collaborators during the liberation war in Bangladesh in 1971. Published by the Bangla Academy, Dacca, Bangladesh, 1973. Price : Tk. 12·00

প্রসঙ্গ-কথা

এ কথা আজ আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না যে, বাংলাদেশে বর্বর পাক-বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত নির্মম হত্যালীলা যে কোন সংজ্ঞানুসারে গণহত্যা বা 'জেনোসাইড' নামে অবিহিত হবার যোগ্য। ত্রিশ লক্ষ মানুষের আত্মাহুতি, কয়েক কোটি মানুষের অন্তহীন দুঃখ-দুর্দশা, অনেক রক্তের প্রবাহ, বিপুল সম্পদের ধ্বংস— এ সবই আজ বাস্তব সত্য। আমাদের চোখের সামনেই এ সব ঘটে গেল।

পৃথিবীতে নিত্য নব নব ইতিহাস সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু সবাই ইতিহাস সৃষ্টি করে না। সবাই ইতিহাসকে দৃষ্টি-দিগন্তে জীবন্ত অবস্থায় দেখতেও পারে না। আমরা পেরেছি। আমরা ইতিহাস সৃষ্টি করেছি। চোখের সামনে যে ইতিহাস যন্ত্রণাক্ত রক্তের পিচ্ছিল পথে হেঁটে গেল আমরা তা নিরীক্ষণ করেছি। যে ইতিহাস বলিষ্ঠ সোচ্চার কণ্ঠে অগ্নিমন্ত্র উচ্চারণ করে গেল আমরা কান পেতে তার কথাও শুনেছি। আমরা বীর্যবান অগ্নিসন্তান সাড়ে সাত কোটি মানুষের অনেকেই ইতিহাসের স্রষ্টা—ইতিহাসের একএকজন জীবন্ত সাক্ষী। অথবা আমরাই ইতিহাস।

বহু যন্ত্রণা, ত্যাগ আর তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জন্ম। বাংলার মাটিতে ইতিহাস তার নতুন পৃষ্ঠা উন্মোচন করেছে। সে পৃষ্ঠাগুলো চাপ চাপ রক্তের অক্ষরে বড়ই ভারী, অশ্রুভারাক্রান্ত ক্রন্দনের আর্তনাদে বড়ই করুণ, বেদনাঘন। 'বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা' বৃথা যায়নি—রাত্রির তপস্যা নতুন সূর্যালোকের দিন সম্ভব করে তুলেছে।

সেই দিনের আলোয় দাঁড়িয়ে স্মরণ করি রাত্রির তপস্যাকে—তপস্যায় নিবেদিত ত্রিশ লক্ষ মানুষের অমর স্মৃতিকে—স্মরণ করি রাত্রির অন্ধকারে রক্ত পিপাসায় মত্ত অনেক নরপিশাচকে— তাদের পৈশাচিক তাণ্ডবতাকে।

এই পিশাচকুল সবই পাকিস্তান থেকে এসেছিল একথা সত্য নয়। বাংলার মাটিতেও অনেক নরপিশাচের জন্ম হয়েছে। আল্-বদর, আল্-শামস্, রাজাকার, আকাশ থেকে নেমে আসেনি। তারা এদেশেরই সন্তান। এদেশের বিকৃত ধর্মীয় অন্ধকারে তাদের জন্ম। ইসলামের বিকৃতি থেকে এদের আবির্ভাব।

আবার স্বাধীন বাংলাদেশে মাদ্রাসা-শিক্ষাকে গুরুত্ব দেবার প্রচেষ্টা চলছে। আবার ধর্মকে সর্বস্তরে প্রাধান্য দেবার চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা যেন নতুন করে শিক্ষা নিতে পারি। আমাদের স্মৃতিশক্তি যেন দুর্বল হয়ে না পড়ে।

ধর্মের আবির্ভাব মানুষের কল্যাণের জন্য। কিন্তু ধর্মের বিকৃতি যে কী ভয়াবহ অভিশাপময় হতে পারে তার নৃশংসরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। বিগত তিন দশক ধরেই দেখেছি। মুসলমান হিন্দুকে, হিন্দু মুসলমানকে এবং অতঃপর মুসলমান মুসলমানকে ধর্মের নামে বিনাদ্বিধায় কি নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

আমাদের বুদ্ধিজীবীরা অনেকে এদের শিকার হয়েছেন। ভবিষ্যতেও হবেন বলে আশংকা করি, যদি না ধর্ম সম্পর্কে অবিলম্বে আমরা সাবধানতা অবলম্বন করি।

ধর্মকে নয়, ধর্মের বিকৃতিকে ভয় করি। ধর্মের বাড়াবাড়ি থেকে বিকৃতির জন্ম হয়। এ কারণেই অনেক মনীষী ধর্মরূপ সর্পকে রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে বলেছেন। তাঁদের এই যুক্তি জোরালো এবং তীব্র। ব্যক্তিগত জীবনে থাকুক, কিন্তু রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মকে প্রশ্রয় দিলে আমাদের সাংঘাতিক অকল্যাণ হবে। বিগত ত্রিশ বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেও যদি আমাদের এই

শিক্ষা না হয়ে থাকে তবে তার মত হঠকারিতা আর কিছু হতে পারে না। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়, এ কথা স্বীকার করি, কিন্তু তাই বলে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে রাষ্ট্রীয় জীবনে সকল ধর্মকে নিয়ে এসে জড়ো করাও বোঝায় না। তা দৃষ্টিভঙ্গী যত নিরপেক্ষই হোক। মহামতি লেনিনের দেশ থেকে আমরা নিঃসঙ্কোচে এ বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে ধর্মের কচকচি বন্ধ করাই সমীচীন।

ধর্মান্ধতাকে ভয় করি। বাংলাদেশের আবির্ভাবে বাধা দিয়েছেন অনেক ধর্মান্ধ ধর্ম-দার্শনিক। তাঁরা বাংলাদেশকে, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদকে কতটুকু শ্রদ্ধা করতে পারবেন সে সম্পর্কে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এদের সম্পর্কে অতীতে যেমন বর্তমানে এবং ভবিষ্যতেও তেমনি সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে। ধর্মের বিকৃতি যদি সর্প হয়, তাহলে এরা সেই সর্পের বিষ-ফণা।

বিষধর সাপের ছোবলে নিঃশেষিত বাঙ্গালী সন্তানদের স্মরণ করে বর্তমান গ্রন্থটি লিখিত। যে উদ্দেশ্যে বাংলা একাডেমীর এই পবিত্র প্রয়াস, তা সফল হোক।

মযহারুল ইসলাম
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী
ঢাকা

ভূমিকা

‘বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা’ ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল দৈনিক ‘পূর্বদেশ’ পত্রিকায়। ১৯৭২ সালে ১৪ই নভেম্বর থেকে ১৪ই ডিসেম্বর প্রতিদিন ঐ শিরোনামায় একজন করে শহীদ বুদ্ধিজীবীর কাহিনী ‘পূর্বদেশ’ পত্রিকায় ছাপা হয়। তখন অনেকেই আমাকে রচনাটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের অনুরোধ করেন, বাঙলা একাডেমীর আনুকুল্যে তা বাস্তবায়িত হল। ‘পূর্বদেশ’ পত্রিকায় ত্রিশজন শহীদ বুদ্ধিজীবীর কাহিনী ছাপা হয়। এ গ্রন্থে আরো কয়জন শহীদের কাহিনী সংযোজিত হল। আমার পরিকল্পনা ছিল মোট পঞ্চাশ জন শহীদ বুদ্ধিজীবীর কথা এ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হবে কিন্তু কয়েকজন শহীদ বুদ্ধিজীবীর পরিবার থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা না পাওয়ায় তা সম্ভব হল না। শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মত্যাগের কাহিনী প্রচারের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ শহীদ বুদ্ধিজীবীরাই অনুপ্রাণিত করতে পারে দেশপ্রেমিক সৃষ্টিতে, দালাল বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টান্তে বিশ্বাসঘাতক ছাড়া আর কিছুতো সৃষ্টি হতে পারে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ স্বাধীন বাংলাদেশে শহীদদের আদর্শ ও আত্মত্যাগের গুরুত্ব বিশেষ অনুভূত হতে দেখা যাচ্ছে না। স্মরণীয় যে, আজ অবধি বুদ্ধিজীবী হত্যা রহস্য উদ্ঘাটিত হয়নি অথচ দালালরা রেহাই পেয়ে যাচ্ছে, ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে আমরা কি দৃষ্টান্ত রেখে যাচ্ছি তা আজ গভীরভাবে চিন্তা করে দেখার সময় এসেছে।

রফিকুল ইসলাম
শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস
১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৭৩

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে—
তারা বলে গেল 'ক্ষমা করো সবে', বলে গেল 'ভালোবাসো—
অন্তর হতে বিদ্বেষবিষ নাশো'।
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির-দ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে।

আমি যে দেখেছি, গোপন হিংসা কপটরাত্রি-ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে।
আমি যে দেখেছি, প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।···

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?

সূচী

পঁচিশে মার্চ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১
ডক্টর গোবিন্দচন্দ্র দেব ১০
অধ্যাপক মুনিরুজ্জামান ১৫
ডক্টর জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা ২০
মামুন মাহমুদ ২৫
ডক্টর ফজলুর রহমান ৩১
মোহাম্মদ সাদেক ৩৬
লেফটেন্যান্ট কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম ৪১
মুহম্মদ শামসুল হক ৪৬
অধ্যাপক মূক্‌তাদির ৫২
কাজী আলী ঈমাম ৫৭
কবি মেহেরুন্নেসা ৬২
শহীদ সাবের ৬৫
হানাদার কবলিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ৬৯
অধ্যাপক হাবিবুর রহমান ৭২
অধ্যাপক সুখরঞ্জন সমাদ্দার ৭৭
এ. কে. এম. শামসুদ্দীন ৮১
ডাক্তার শামসুদ্দীন ৮৫
সায়ীদুল হাসান ৮৮
আলতাফ মাহমুদ ৯৪
সৈয়দ হাফিজুর রহমান ৯৮
অধ্যাপক মীর আবদুল কাইয়ুম ১০০

সিরাজুদ্দীন হোসেন ১০৩
সৈয়দ নজমুল হক ১০৭
নিজামুদ্দীন আহমেদ ১১২
আ. ন. ম. গোলাম মোস্তফা ১১৫
সেলিনা পারভিন ১২০
ডক্টর আমিনউদ্দীন ১২৩
ডক্টর সিদ্দিক আহমদ ১২৬
ডক্টর আবুল কালাম আজাদ ১২৮
ডক্টর ফয়জুল মহী ১৩১
ডক্টর সিরাজুল হক খান ১৩৪
অধ্যাপক রশিদুল হাসান ১৩৭
অধ্যাপক আনোয়ার পাশা ১৪১
অধ্যাপক গিয়াসুদ্দীন আহমেদ ১৪৭
অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্য ১৫১
ডক্টর আবুল খয়ের ১৫৬
ডাক্তার মোহাম্মদ মর্তুজা ১৬১
ডাক্তার আলীম চৌধুরী ১৬৬
ডাক্তার ফজলে রাব্বী ১৭২
অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ১৭৭
অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ১৮০
শহীদুল্লাহ কায়সার ১৮৪
জহির রায়হান ১৮৯

বীরের এ রক্তস্রোত মাতার এ অশ্রুধারা
রফিকুল ইসলাম

পঁচিশে মার্চ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পঁচিশে মার্চ, একাত্তর। অসহযোগের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস বন্ধ, ছাত্র শিক্ষক কেউ ক্লাসে যোগ দিচ্ছেন না। তবুও মার্চের চব্বিশ দিনের মতো সেদিনও যথারীতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মিলনায়তনে আমরা কয়েকজন সমবেত হয়েছি। পুরো মার্চ মাস আমরা শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে প্রতিবাদ সভা, শোভাযাত্রা, যুক্ত বিবৃতি প্রচার নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। প্রতিদিনই কিছু না কিছু কাজ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করত, সেদিনও ব্যতিক্রম ছিল না। ডক্টর খান সারওয়ার মোরশেদ বৃটিশ সরকারের কাছে প্রেরণের জন্যে একটি আবেদনপত্র তৈরী করেছিলেন, কয়েকদিন আগে সংবাদপত্রে একটা খবর প্রকাশিত হয়েছিল, পাকিস্তান নৌ-বাহিনী নাকি বৃটিশ আশ্রিত মালদ্বীপে জাহাজ ভেড়ানোর এবং জ্বালানী সংগ্রহের অনুমতি পেয়েছে। আমাদের আশংকা হচ্ছিল চরম সময়ে ভারত নৌ-অবরোধ সৃষ্টি করলে পাকিস্তানী জাহাজ মালদ্বীপ হয়ে চট্টগ্রাম আসবে। তাই বৃটিশ সরকারের কাছে নিবেদন, আমাদের ঐ আবেদনপত্রে গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ ছিল। আমরা কয়েকদিন ধরে ঘুরে ঘুরে কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিকের স্বাক্ষর সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলাম। প্রাক্তন রাষ্ট্রদুত কামরুদ্দীন আহমদ সাহেব ঐ আবেদনপত্রে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন কিন্তু প্রাক্তন গবর্নর সুলতানউদ্দীন সাহেব স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করেন।

যাই হোক পঁচিশে মার্চ সকালে ঐ আবেদন পত্রটি ডক্টর মোরশেদ, ডক্টর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ডক্টর বেলায়েত, অধ্যাপক আহসানুল হক, অধ্যাপক গিয়াসুদ্দীন আহমেদ (পরে আল-বদরের হাতে নিহত) অধ্যাপক জয়নাল আবেদীন (মরহুম) এবং আরো কয়েকজন মিলে আমরা বৃটিশ ডেপুটি হাই কমিশনে গিয়ে ফার্স্ট সেক্রেটারীর হাতে দিয়ে আসি। ওখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এলে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতা তোফায়েল আহমদ এবং শেখ কামালের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। একটা গাড়ীতে করে এসে শেখ কামাল দ্রুত তোফায়েল আহমদকে কোথায়ও নিয়ে যাচ্ছিলেন। তোফায়েল আহমদ আমাকে জানালেন, ইয়াহিয়ার সঙ্গে শেখ সাহেবের আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে কি ঘটবে কিছুই বলা যায় না।

বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে গেলাম, সব শিক্ষক উৎকণ্ঠিত, মাথা গরম শিক্ষকদের মধ্যে দু'একজন তখন পর্যন্ত স্বাধীনতা ঘোষণা না করায় চীৎকার করে আওয়ামী লীগ নেতাদের সমালোচনা করছিলেন। সন্ধ্যা সাতটায় টেলিভিশনের ইংরেজী সংবাদে বঙ্গবন্ধুর প্রেস কনফারেন্সের খবর প্রচারিত হল, তিনি বলেছেন, 'পাকিস্তান সেনাবাহিনী যদি নিরীহ শান্তিপ্রিয় বাঙ্গালীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাহলে বাংলার বীর সন্তানেরা তা বিনা চ্যালেঞ্জে যেতে দেবে না······ইত্যাদি ইত্যাদি'। রাত্রে ক্লাব থেকে বাসায় ফেরার সময়ে ইকবাল হলের কিছু পরিচিত ছাত্রের সঙ্গে দেখা হল। ফিরোজ এবং মহসিন নামে দু'জন ছাত্র আমাকে জানালেন ওঁরা হল ছেড়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছে, আমাকে ওঁরা আরও বললেন, ইকবাল হলের সঙ্গে বাসা এখানে পরিবার-পরিজন নিয়ে থাকা নিরাপদ নয়, অন্যত্র চলে যাওয়া উচিত। কিন্তু রাত্রি তখন প্রায় দশটা, অত রাত্রে সবাইকে নিয়ে কোথায় যাব? তখনও জানি না আর মাত্র দুইটি ঘণ্টা পরে কি ঘটতে যাচ্ছে আমাদের ভাগ্যে।

ইকবাল হলের পিছনে নীলক্ষেত অঞ্চলে ২৩, ২৪ ও ২৫ নং বিশ্ববিদ্যালয় আবাস, মোট চব্বিশ জন শিক্ষক তাঁদের পরিবার-পরিজন নিয়ে সেখানে বসবাস করেন। আমি তখন ছিলাম ২৪ নম্বরের তিনতলার বাশিন্দা। মৃত্তিকাবিজ্ঞানের ডক্টর ফজলুর রহমান থাকতেন ২৩ নম্বরের বাড়ীতে, একই বাড়ীতে চারতলার দুটো ফ্ল্যাটে অধ্যাপক আনোয়ার পাশা ও অধ্যাপক রশিদুল হাসান থাকতেন সপরিবারে। ২৫নং বাড়ীর পরেই নীলক্ষেত রেল লাইনের ওপারে বস্তী। সেখানে বাস করেন হাজার হাজার বাস্তুহারা পরিবার। আমাদের বাড়ীগুলোর সামনেই নীলক্ষেত রোডের সমান্তরাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মচারীদের চারটি আবাস। ইকবাল হল ও সংলগ্ন এই আবাসিক অঞ্চলটি পঁচিশে মার্চ রাত্রি থেকে সাতাইশে মার্চ সকাল পর্যন্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমণের মূল লক্ষ্যস্থল ছিল।

পঁচিশে মার্চ রাত্রি ঠিক বারটায় সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রাবাস ও স্টাফ কোয়ার্টার্সগুলোর ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনী সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের হেড কোয়ার্টার্স ইকবাল হলে অবস্থিত ছিল বলে পাকিস্তানী বাহিনীর সবচেয়ে বেশী ক্রোধ ছিল ইকবাল হলের ওপর আর আক্রমণের প্রচণ্ডতাও ছিল অনুরূপ। ইকবাল হলের সামনের পুকুর পাড় থেকে এবং পেছনে নীলক্ষেত ফাঁড়ির কাছ থেকে ঠিক রাত্রি বারটার সময় পাকিস্তান বাহিনী ভারী মর্টার ও মেশিন গান থেকে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ শুরু করে ইকবাল হল লক্ষ্য করে। সঙ্গে সঙ্গে ইকবাল হল থেকে ছাত্র ও বিয়ারাররা এবং নীলক্ষেত পুলিশ ফাঁড়ি থেকে বাঙালী পুলিশ কর্মচারীরা পালিয়ে এসে সংলগ্ন শিক্ষক ও কর্মচারীদের বাড়ীতে আশ্রয় নিতে শুরু করেন। প্রেসিডেন্ট হাউসে যে-সব বাঙালী ই. পি. আর. ডিউটিতে ছিলেন তাঁদের নিরস্ত্র করে রমনা রেসকোর্সে নিয়ে গুলী করে

মারা হয়। সেখান থেকেই কিছু সংখ্যক ই. পি. আর. ভাই পালিয়ে এসে আমাদের এলাকায় আশ্রয় নেয়। পাকিস্তানী পশুরা নীলক্ষেত রেল লাইনে অবস্থিত বস্তী এলাকায় অগ্নি সংযোগ করে এবং আগুন থেকে বাঁচার জন্যে পলায়নপর হাজার হাজার অসহায় নরনারী ও শিশুকে নীলক্ষেত রেল গেইটে মেশিন গান বসিয়ে কুকুর-বেড়ালের মতো হত্যা করতে থাকে। ঐ বস্তী এলাকা থেকেও অনেক নরনারী ও শিশু পালিয়ে এসে আমাদের এলাকায় বিভিন্ন বাড়ীতে, ছাদে, সিঁড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করে।

পঁচিশে মার্চ সমস্ত রাত্রি, ছাব্বিশে মার্চ সমস্ত দিন ও রাত্রি এই ছত্রিশ ঘন্টা সময় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বিশেষতঃ ইকবাল হল, জগন্নাথ হল ও সংলগ্ন আবাসিক এলাকাসমূহে যে নারকীয় ও বীভৎস তাণ্ডবলীলার সৃষ্টি হয়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই। ইকবাল হল অঞ্চলে যা ঘটেছে তা নিজে দেখেছি, চারিদিকে আগুন আর আগুন, বস্তীতে আগুন, আবাসিক এলাকায় পার্ক করা গাড়ীগুলোতে আগুন, বস্তী এলাকার মৃতদেহগুলি নীলক্ষেত রেল গেট সংলগ্ন পেট্রোল পাম্পের কাছে খাদে স্তূপীকৃত করে পেট্রোল ঢেলে তাতে আগুন। তার ওপরে প্রচণ্ড গোলাগুলী বর্ষণ ধোয়া, আগুন, বারুদ আর পোড়া মৃতদেহের গন্ধে সমগ্র এলাকাটা একটা প্রজ্বলিত নরককুণ্ডে পরিণত হয়েছিল। আমাদের বাড়ীগুলো প্রতি মুহূর্তে গুলীর আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছিল। এর মধ্যে আমরা প্রাণের আশা পরিত্যাগ করে পরিবার-পরিজন, আশ্রয় গ্রহণকারী ইকবাল হলের ছাত্র, বিয়ারার, বস্তীবাসী সবাই মিলে একটা ঘরের কোণে মেঝেতে পড়ে থেকে মৃত্যুর প্রহর গুণছিলাম। পুরো মার্চ ধরে প্রায় প্রতি রাত্রেই ছাত্রনেতা নূরে আলম সিদ্দিকী এবং শাহজাহান সিরাজ আমাদের বাড়ীতে রাত্রি যাপন করেছেন, কিন্তু পঁচিশে মার্চ রাত্রে তাঁরা আমার এখানে ছিলেন না। সে রাত্রে

ওঁরা এখানে থাকলে ওঁদের নিরাপত্তা নিয়ে আমাদের খুবই উৎকণ্ঠিত থাকতে হত।

পঁচিশে মার্চ সমস্ত রাত্রি ধরে কামান, মর্টার, মেশিন গান, ট্যাঙ্ক, রকেট ও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র থেকে অবিরাম গোলাগুলী বর্ষণের পর ছাব্বিশে মার্চ ভোরের দিকে পাকিস্তানী ঘাতকেরা ইকবাল হলের ঘরে ঘরে ও আবাসিক এলাকার বিভিন্ন বাড়ীতে ঢুকে পড়ে হত্যা ও লুণ্ঠন চালাতে থাকে। গোলার আঘাতে ইকবাল হল ও ইকবাল হলের পুকুরের ধারে অবস্থিত কর্মচারীদের আবাসগুলোয় অসংখ্য বড় বড় গর্ত দেখা দেয়, ঐ গোলার আঘাতে কয়েকজন কর্মচারী নিহত হন। ইকবাল হলের যেসব হতভাগ্য ছাত্র ও বিয়ারার পালাতে পারেননি তাঁরা সকলেই পাকিস্তানীদের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের শিকার হন। কয়েকজন ছাত্রকে তারা ধরে নিয়ে পেট্রোল ঢেলে ইকবাল হল রেস্টুরেন্টের মধ্যে ঢুকিয়ে আগুনে পুড়িয়ে মারে। 'আজাদ' পত্রিকার বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা হেলালুর রহমান চিশতীকে ইকবাল হল মিলনায়তনের পাশে দাঁড় করিয়ে হত্যা করা হয়, হত্যা করা হয় হল বিয়ারার শামসুকে। ইকবাল হলের পানির পাম্পের কর্মীদের এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের বিয়ারারদেরও নির্মমভাবে গুলী করে হত্যা করা হয়।

ইকবাল হলে নিধনযজ্ঞ শেষ করে পাকিস্তানী নরপশুরা শিক্ষকদের বাড়ীতে ঢুকে পড়ে, প্রথমে তারা প্রবেশ করে তেইশ নম্বর নীলক্ষেত বাড়ীর বিভিন্ন ফ্ল্যাটে, এখানেই তারা মৃত্তিকা-বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর ফজলুর রহমান এবং তাঁর দু'জন আত্মীয়কে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। তারা অধ্যাপক আনোয়ার পাশা ও অধ্যাপক রশীদুল হাসানের বাড়ীতেও প্রবেশ করে, কিন্তু, উভয়েই পরিবারের সকলকে নিয়ে অন্ধকারে চৌকির নীচে লুকিয়ে ছিলেন। ঘরে ঢুকে পশুরা টর্চের আলো ফেলে কাউকে না দেখে চলে যায়, যাবার সময় তাদের

বলতে শোনা যায় 'বাঙালী কুত্তা ভাগ গিয়া'। অধ্যাপক আনোয়ার পাশা ও অধ্যাপক রশিদুল হাসান পঁচিশে মার্চ রাত শেষে পাকিস্তানী বর্বরদের হাত থেকে আশ্চর্যজনকভাবে রেহাই পেলেও চৌদ্দই ডিসেম্বর তারিখে স্বাধীনতার পূর্ব মূহূর্তে জামাতে ইসলামী, ইসলামী ছাত্রসংঘের দোসর আল-বদরের মুসলিম বাংলার ঘাতকদের হাত থেকে রেহাই পাননি। পঁচিশে রাতে পাকিস্তানী বর্বরদের হাত থেকে তেইশ নং বাড়ীর অপর বাশিন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী গ্রন্থাগারিক মৃধা সাহেবও আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে যান। কিন্তু তেইশ নম্বর নীলক্ষেত আবাসের ছাদে আশ্রয় গ্রহণকারী প্রায় ত্রিশজন বস্তীবাসী নরনারী, শিশু সেদিন পাকিস্তানী জল্লাদদের হাত থেকে রেহাই পায়নি, তাদের প্রত্যেককে হত্যা করা হয়েছিল পৈশাচিকভাবে আর তাদের মৃতদেহ মাসাধিকাল পর্যন্ত ঐ ছাদে চিল শকুন আর কাকে সৎকার করেছে। পঁচিশে মার্চের কয়েকমাস পরে ঐ কংকালগুলি ছাদ থেকে নামিয়ে আনা হয়েছিল যেদিন রোকেয়া হলের প্রায় পঞ্চাশ জন কর্মী ও তাদের পরিবারবর্গের কংকাল সরানো হয় সেই একই দিনে।

পাকিস্তানী হায়েনারা চব্বিশ নম্বর নীলক্ষেত অর্থাৎ যে আবাসে আমরা থাকতাম সেখানেও ঢুকেছিল, ঐ বাড়ীর তিনতলার সিঁড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন বস্তী থেকে আগত দুপায়ে গুলীবিদ্ধ দুইটি মা। সঙ্গে ছিল তাদের শিশু সন্তান। তাদের রক্তে চব্বিশ নম্বর বাড়ীর সিঁড়ি ভেসে যাচ্ছিল। চব্বিশ নম্বরে ঢুকতে গিয়ে ঐ রক্তের ঢল দেখে পশুরা ভেবেছিল বোধহয় অন্য কোন দল এসে হত্যাকাণ্ড সমাপ্ত করে গেছে তাই আর তারা ঢোকেনি চব্বিশ নম্বরে। তাই চব্বিশ নম্বরের সবাই আমরা বেঁচে গেছি, তাই আমরা আজো জীবিত। ওই দুটি মাকে আমরা সাধ্যমত সেবা করে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম এবং ২৭শে মার্চ সকালে নীলক্ষেত ছেড়ে যাবার সময় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিলাম।

পঁচিশে রাত্রে পাকিস্তানী পিশাচেরা মধুর রেস্টুরেন্টে এবং রোকেয়া হলেও হানা দেয়, মধু দা, তাঁর পরিবারের কয়েকজন এবং রোকেয়া হলের বিয়ারার, ঝি ও তাদের পরিবার-পরিজনের অনেকে হতভাগ্য পাকিস্তানীদের হাতে নিহত হয়।

জগন্নাথ হলেও পাকিস্তান বাহিনী সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং পঁচিশে মার্চ সমস্ত রাত্রি এবং ছাব্বিশে মার্চ সকাল পর্যন্ত চলতে থাকে প্রচণ্ড গোলাগুলী ও হত্যার তাণ্ডবলীলা। প্রথমে প্রচণ্ড গোলাগুলী বর্ষণ, পরে ঘরে ঢুকে ঢুকে ছাত্র, কর্মচারীদের ধরে মাঠে নিয়ে আসা, তাদের দিয়েই গণ-কবর তৈরী এবং শেষে মাঠে লাইন করে দাঁড় করিয়ে হত্যা ও গণ-কবরে মাটি চাপা দেওয়া। বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোর মধ্যে জগন্নাথ হলেই সবচেয়ে বেশী ছাত্র ও কর্মচারী নিহত হন। জগন্নাথ হলের এসেম্বলি হাউসে টিচার্স কর্নারে থাকতেন ফলিত পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য। পঁচিশে মার্চ শেষ রাত্রে তাঁর ঘরে ঢুকে তাঁকে বেয়নেটবিদ্ধ করে হত্যা করে পাকিস্তানী পশুরা। তাঁর মৃতদেহ প্রথমে হল মিলনায়তনের বড় গাছটার গোঁড়ায় পড়েছিল পরে বোধহয় মাঠের মাঝে গণ-সমাধিতে নিয়ে চাপা দেওয়া হয়। পঁচিশে মার্চ রাত শেষে পাকিস্তানী পশুরা জগন্নাথ হলের বিপরীত দিকে অবস্থিত ডক্টর গোবিন্দচন্দ্র দেবের বাড়ীতে হানা দেয়, তাঁর ঘরে ঢুকে প্রথমে তাঁর মাথায় গুলী এবং পরে বেয়নেট চার্জ করা হয়। ডক্টর দেবের মৃতদেহ তারা টেনে বাইরে নিয়ে যায়, প্রকাশ যে মৃতদেহের উপর দিয়ে তারা ট্রাক চালিয়ে দেয়, শেষ পর্যন্ত ওঁর মৃতদেহ তারা জগন্নাথ হলের মাঠে নিয়ে যায় এবং সম্ভবতঃ সেখানেই মাটিচাপা দেয়। ডক্টর দেবের বাড়ীর কাছে শহীদ মিনারের বিপরীত দিকে থাকতেন অধ্যাপক মুনিরুজ্জামান এবং ডক্টর জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, রাত প্রায় তিনটার দিকে তাঁদের বাড়ীতে চৌত্রিশ নম্বর আবাসে মিলিটারীরা

ঢুকে পড়ে, ঐ বাড়ীর সিঁড়ির গোড়ায় পিশাচেরা অধ্যাপক মুনিরুজ্জামান, তাঁর পুত্র আকরাম এবং ডক্টর জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাকে গুলী করে ফেলে রেখে যায়। অধ্যাপক মুনিরুজ্জামান ও আকরাম সঙ্গে সঙ্গে প্রাণত্যাগ করেন। জ্যোতির্ময়বাবু পরে হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করেন। সে রাত্রে ঐ বাড়ীর অপরাপর বাশিন্দা অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক এবং ডক্টর আনিসুর রহমান আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে যান। পঁচিশে রাত্রে ফুলার রোডের আবাসিক এলাকায়ও পাকিস্তানী সৈন্যরা হানা দিয়েছিল, এই এলাকায় প্রথমে তারা এগার নম্বর বাড়ীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরী স্কুলের শিক্ষক মোহাম্মদ সাদেকের বাড়ীতে ঢুকে পড়ে, সাদেক সাহেবকে পশুরা বেয়নেট চার্জ ও গুলী করে হত্যা করে। তাঁর মৃতদেহ ২৭শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ঐ বাড়ীতে ছিল। পরে ২৭ তারিখ সকালে এগার নম্বর বাড়ীর পিছনে তাঁকে কবর দেওয়া হয়। ফুলার রোডের বার নম্বর আবাসেও পিশাচেরা হানা দিয়েছিল, প্রথমে তারা নামিয়ে নিয়েছিল সমাজ বিজ্ঞানের অধ্যাপক সৈয়দ আলী নকী এবং সৈয়দ সাইয়েদুল ইসলাম নামক এক ভদ্রলোককে। তাঁদের গুলী করতে নিয়েও গুলী করেনি ওরা, কিন্তু ঐ বাড়ীর উপরের তলায় উঠে গিয়ে পশুরা ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল মুকতাদিরকে নিষ্ঠুরভাবে গুলী করে হত্যা করে। তাঁর মৃতদেহ টেনে নিয়ে যায়। পরে ২৭ তারিখে তাঁর লাশ ইকবাল হলে পাওয়া যায়, সেখান থেকে নিয়ে গিয়ে পল্টনে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে তাঁকে দাফন করা হয়। পাক পশুরা সলিমুল্লা হল এবং ঢাকা হলেও হানা দিয়েছিল, সলিমুল্লা হলের হাউস টিউটর অধ্যাপক মুনিমকে তারা নির্দয়ভাবে প্রহার করে আর ঢাকা হলে তারা হত্যা করে অঙ্কের অধ্যাপক এ. আর. খান খাদিমকে।

এভাবেই কেটেছে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আমাদের পঁচিশে মার্চ রাত্রি, ছাব্বিশে মার্চ দিন-রাত্রি। তারপর ২৭শে মার্চ সকালে

তথাকথিত কারফিউ উঠে গেলে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ছেড়ে চলে যাই যে যেদিকে পারি। পঁচিশে মার্চ রাত্রি থেকে সাতাইশে মার্চ ভোর, ভেবেছিলাম বুঝি সব শেষ হয়ে গেল, চিরদাসত্ব বুঝি লেখা হয়ে গেল আমাদের অদৃষ্টে ; কিন্তু সাতাইশে মার্চ চট্টগ্রাম থেকে প্রচারিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দৃঢ় বলিষ্ঠ কণ্ঠ আমাদের জানিয়ে দিল আমরা মরিনি, আমরা আবার বেঁচে উঠলাম। তাই আজও আমরা বেঁচে আছি।

ডক্টর গোবিন্দচন্দ্র দেব

একাত্তর সালে পঁচিশে মার্চের কাল রাত্রিতে পাকিস্তানী নরপশুরা যে সুপরিকল্পিত বাঙালী নিধনযজ্ঞ শুরু করে তার প্রথম শিকার হয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকরা। এই শহীদদের মধ্যে আজ যাঁর নাম আমাদের সবার আগে মনে আসে তিনি হলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় দার্শনিক অধ্যাপক ডক্টর গোবিন্দ্রচন্দ্র দেব। পাকিস্তানী বর্বরেরা ডক্টর গেবিন্দচন্দ্র দেবকে নির্মমভাবে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি, ডক্টর দেবের বিশ্ববিদ্যালয় আবাসটিও তারা পৈশাচিক উল্লাসের সঙ্গে ধ্বংস ক'রে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয় দানবিক উন্মত্ততায়। সারা বিশ্ব স্তম্ভিত হয়ে শুনেছিল ছাত্রদের, অধ্যাপকদের হত্যার খবর বিশেষতঃ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই দার্শনিকের নির্মম হত্যাকাণ্ডের সংবাদ। সমগ্র পৃথিবী বিশেষতঃ পণ্ডিত সমাজ পাকিস্তানী বর্বরতার নিন্দায় মুখর হয়ে উঠেছিল, পাকিস্তান সভ্য সমাজের কলংক বলে বিবেচিত হয়েছিল। পাকিস্তানী পশুরা নিজেদের কলংক ঢাকার জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, ডক্টর মোহর আলী, ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ প্রমুখ অধ্যাপকদের স্বাক্ষর প্রমাণ সম্বলিত একটি বিবৃতি আন্তর্জাতিক বিশ্বে প্রচার করেছিল, তাতে বলা হয়েছিল :

> We have read with surprise a statement issued in New York by a body called the International Committee on

> University Emergency, expressing anxiety at which it choses to describe as "massacre of scholars at Dacca" ·· Some of us were very intrigued to find ourselves listed as among those 'shot and killed'. The misunderstanding may have arisen from the fact that on account of the disturbances in Dacca and other places most of us went away to our villages in the first week of march...This was the period when the Awami League's massive defiance of the legally established Government got into full swing··· This period also saw the collossal abuse of academic facilities far party political ends. For instance, Jagannath Hall on the Dacca University campus was a secret arsenal of such military epuipment as machineguns and mortars, and the training ground of the "Bangla Desh Mukti Fauj".

জগন্নাথ হলে একাত্তরের মার্চ মাসে গোপন অস্ত্রাগার ছিল, সেখানে মর্টার মেশিনগান ইত্যাদি সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ছিল এবং সেখানে বাংলাদেশ মুক্তিফৌজের শিক্ষাকেন্দ্র ছিল ইত্যাদি মিথ্যা প্রচারণা দিয়ে পাকিস্তানী জল্লাদেরা সম্ভবতঃ জগন্নাথ হলের সংখ্যালঘু ছাত্রদের এবং জগন্নাথ হলের প্রাক্তন ও তদানীন্তন প্রভোস্ট ডক্টর গোবিন্দচন্দ্র দেব এবং ডক্টর জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার বর্বর হত্যাকাণ্ডের সাফাই গাইতে চাইছিল, কিন্তু বিশ্ববিবেক পাকিস্তানীদের ঐ মিথ্যাচার গ্রহণ করেনি; ফলে ঐ মিথ্যাকে আরও সরবে প্রচারের জন্যে বিচারপতি নুরুল ইসলাম, ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, ডক্টর মোহর আলী, ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ প্রেরিত হয়েছিল ইংলণ্ড, ইউরোপ, আমেরিকায়। তাঁরা পাকিস্তানী কসাইদের নির্দোষ প্রমাণের জন্যে ঐসব দেশের রাজনৈতিক নেতা, সাংবাদিক, অধ্যাপকদের কাছে দেন-দরবার করে ফিরেছেন। কিন্তু বিশ্ববিবেককে তাঁরা প্রতারিত করতে সক্ষম হননি। আজ তাঁদের স্থান হয়েছে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে।

ডক্টর গোবিন্দচন্দ্র দেব পাকিস্তানীদের চোখে কেন অপরাধী ছিলেন? তিনি তো রাজনীতি করতেন না, তিনি তো সব দলমতের উর্ধ্বে ছিলেন, তাঁর চোখে তো হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান সব সমান ছিল। তাঁকে তো আমরা দেখেছি মুসলমানের মিলাদ শরীফে, বৌদ্ধদের বৌদ্ধ পূর্ণিমায়, খ্রীস্টানদের বড় দিনে। সব ধর্মের সার যে অহিংসার বাণী, মিলনের মন্ত্র তাইতো ছিল গোবিন্দ দেবের ধর্ম অথচ তাঁকে কেন হত্যা করা হল? ডক্টর গোবিন্দ দেবের অপরাধ তিনি বাঙালী ছিলেন, তিনি পণ্ডিত ছিলেন, তিনি অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর আরও অপরাধ ছিল এই যে, তিনি হিন্দু ছিলেন অথচ মুসলমান ছাত্ররা, অধ্যাপকেরা তাঁকে ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত। সে অপরাধেই গোবিন্দচন্দ্র দেবকে প্রাণ দিতে হল বর্বর পশুদের হাতে, যুগে যুগে যেমন ক্রুশ-বিদ্ধ হয়েছে সত্য সাধকেরা এই মানবতার পূজারী মরমী দার্শনিকও তেমনি ক্রুশবিদ্ধ হলেন পশু-শক্তির হাতে।

ডক্টর গোবিন্দ দেবের কাছে মানুষের ধর্মের পরিচয়ের চেয়ে মানবিক পরিচয়ই বড় ছিল; তাই '৪৭ সালে দেশ বিভাগের পরে যখন অধিকাংশ অমুসলমান শিক্ষাবিদ তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে চলে যান গোবিন্দ দেব তখন দিনাজপুর কলেজের অধ্যক্ষের পদ ছেড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগে এসে যোগদান করেন। সিলেটের এই কৃতী সন্তান তার পরে অনেক সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও কোনদিনই মাতৃভূমি ত্যাগ করে চলে যাবার কথা ভাবতে পারেননি। একাধিকবার তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গেছেন অধ্যাপনার জন্যে নিমন্ত্রিত হয়ে, সেখানে যা উপার্জন করেছেন সেখানেই তা জ্ঞান চর্চার জন্যে ফাউণ্ডেশান করে দান করে এসেছেন। ইচ্ছে করলেই ঐ দেশে তিনি বসবাস করতে পারতেন বা দেশে না ফিরে ভারতে চলে যেতে পারতেন, কিন্তু বার বারই তিনি দেশে ফিরে এসেছেন। দেশে তাঁর কেউ ছিল না, চিরকুমার গোবিন্দ দেব কিসের টানে

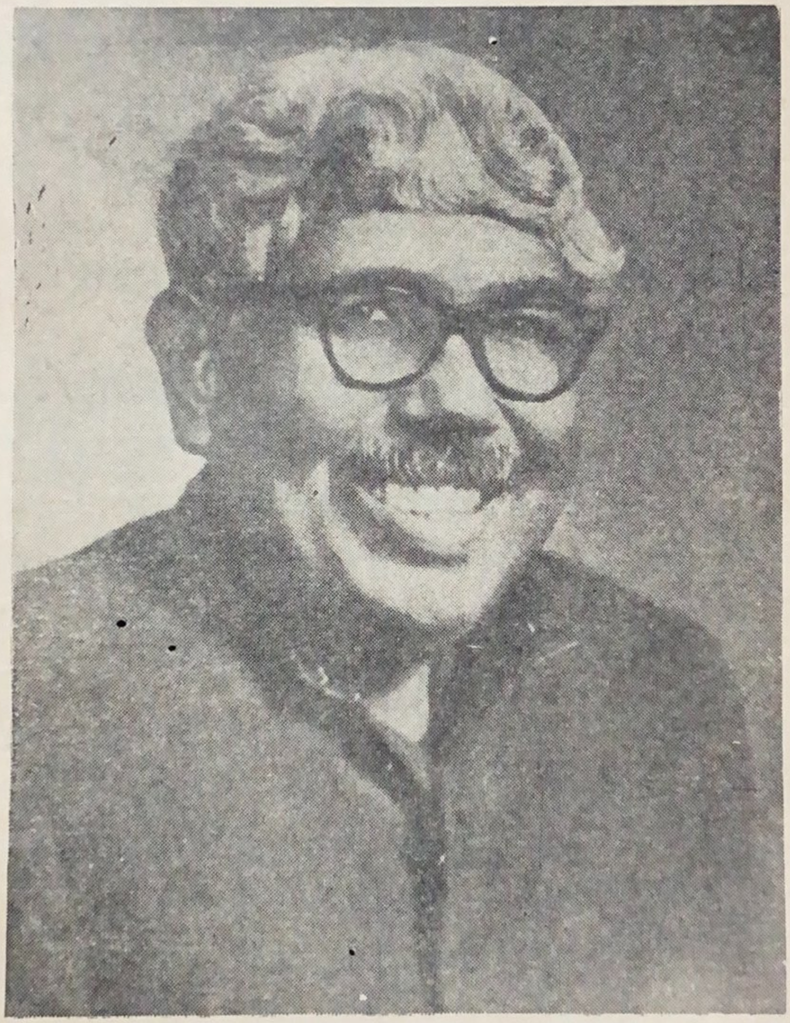

বার বার ফিরে এসেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে? এ বিশ্ববিদ্যালয়কে, তার দর্শন বিভাগকে তিনি ভালবাসতেন, এই মহান বিদ্যাপীঠই ছিল তাঁর আত্মীয়, পরিজন, ঘর, বাড়ী সব। এ ছেড়ে কোথায় যাবেন তিনি? জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কত অভাবগ্রস্ত ছাত্রছাত্রী তাঁর সহায়তায় তাদের শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করেছে, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাঁর সংসারে কত অনাথ, এতিম লালিত পালিত হয়েছে তার খবর কে রাখে? আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর মতো আর একজন সহৃদয় জ্ঞান সাধককে কি খুঁজে পাওয়া যাবে?

পঁচিশে মার্চ রাত্রির অন্ধকারে যখন রক্তপিপাসু হিংস্র পাকিস্তানী সৈন্যরা তাঁর দরজায় বুটের লাথি মারছিল তখন এই জ্ঞান তাপস একটি প্রদীপ হাতে দরজা খুলে দিয়েছিলেন, যে জ্ঞানের প্রদীপ হাতে বিগত দুই দশক তিনি বিচরণ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে। অকাতরে বিলিয়েছেন জ্ঞানের আলো শিষ্যদের মধ্যে, সতীর্থদের উদ্বুদ্ধ করেছেন সত্য সন্ধানে। সেই আলোকবর্তিকা ধূলায় লুণ্ঠিত হয়েছে, সেই জ্ঞানের প্রদীপ পাকিস্তানী অন্ধরা চিরদিনের জন্যে নির্বাপিত করে দিতে চেয়েছে। তাঁকে তারা পৈশাচিক উল্লাসে নির্মমভাবে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি, তাঁর মৃতদেহ টেনে নিয়ে গেছে জগন্নাথ হলের মাঠে। সেখানে তাঁর প্রিয় ছাত্রদের মৃতদেহের সঙ্গে নিক্ষেপ করেছে গণসমাধিতে।

পাকিস্তানীদের দর্শন হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নি অর্থাৎ ধ্বংসের দর্শন অন্যদিকে, ডক্টর গোবিন্দচন্দ্র দেবের দর্শন মিলনের, আনন্দের, কল্যাণের, সমন্বয়ের, শান্তির দর্শন। তাই পাকিস্তানী বর্বরেরা ডক্টর গোবিন্দ দেবকে হত্যা করে তাঁর অহিংস মানবতাবাদী দর্শনকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল, গোবিন্দ দেবের সত্য কথনকে টুটি চেপে চিরকালের জন্যে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানীরা ইতিহাসের একটা সত্য জানেনি সে হল, মানুষের মৃত্যু আছে

কিন্তু আদর্শের মৃত্যু নেই। গোবিন্দ দেবের আদর্শ যুগ যুগ ধরে অনুপ্রাণিত করবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে তাঁর ছাত্র ও শিক্ষকদের, গোবিন্দ দেবের সেই প্রদীপের আলোকে যুগ যুগ ধরে তারা অন্ধকারে পথের দিশা পাবে। আদর্শের সেই অনির্বাণ শিখাকে নির্বাপিত করার শক্তি কোন দানবের নেই। আজ আমরা কবির ভাষায় গোবিন্দ দেবের অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলব,

কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ
জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস—
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো,
পাগল ওগো, ধরায় আস।
এই অকূল সংসারে দুঃখ আঘাত
তোমার প্রাণে বীণা ঝংকারে।
ঘোর বিপদ মাঝে কোন জননীর
মুখের হাসি দেখিয়া হাসো।।
তুমি মরণ ভুলে কোন অনন্ত
প্রাণসাগরে আনন্দে ভাসো।।

অধ্যাপক মুনিরুজ্জামান

পঁচিশে মার্চের বিভীষিকাময় রাত্রে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কমাণ্ডো ইউনিটের দুই ব্যাটেলিয়ান অর্থাৎ দেড় হাজারেরও বেশী সৈনিক নিয়োজিত হয়েছিল কেবলমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাতে নিধনকার্য চালানোর জন্যে। এই দুই ব্যাটেলিয়ান পদাতিক সৈন্য যাতে তড়িৎগতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের আবাসিক এলাকাগুলোয় আক্রমণ চালাতে পারে সে জন্যে তারা এসেছিল ট্রাক, উইপন ক্যারিয়ার আর ট্যাংক ক্যারিয়ারে করে। এই পদাতিক সৈনিকেরা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র-শস্ত্র সুসজ্জিত ছিল, সর্বোপরি তাদের সহায়তার জন্যে ছিল জিপ, ট্রাক ও উইপন ক্যারিয়ারে বসান ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী রিকয়েললেস রাইফেল, ভারী মেশিন গান, মর্টার, রকেট লঞ্চার ইত্যাদি। এমনকি তারা বেশ কিছু ট্যাঙ্কও সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। এই পাকিস্তান বাহিনীর আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল ইকবাল হল; জগন্নাথ হল ও সন্নিহিত আবাসিক এলাকাসমূহ। একই ধরনের অন্য সব পাকিস্তানী বাহিনী একই সময়ে একই সঙ্গে পিলখানার ই. পি. আর. ক্যাম্প এবং রাজারবাগ পুলিশ কেন্দ্র আক্রমণ করেছিল। পাকিস্তানী সৈনিকদের ধারণা দেওয়া হয়েছিল যে তারা হিন্দু বা কাফের, বাঘী বা বিদ্রোহী, গাদ্দার, মোনাফেক বা বিশ্বাসঘাতক নিধনে নিয়োজিত। সুতরাং

জেহাদী উন্মাদনা নিয়ে পাকিস্তানী সৈনিকেরা পঁচিশে মার্চ রাত্রে তাদের নরমেধ যজ্ঞ শুরু করেছিল, এর সঙ্গে ছিল লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও ধর্ষণের পৈশাচিক উল্লাস।

জগন্নাথ হল আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে পাকবাহিনী ডক্টর গোবিন্দ দেবের বাসভবন এবং নিকটবর্তী ৩৪নং বিশ্ববিদ্যালয় আবাসটিও (শহীদ মিনারের বিপরীতে অবস্থিত) আক্রমণ করে। এই বাড়ীর বিভিন্ন ফ্ল্যাটে বাস করতেন অধ্যাপক মুনিরুজ্জামান, ডক্টর জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক, ডক্টর আনিসুর রহমান এবং মরহুম অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই সাহেবের পরিবার। সলিমুল্লাহ হলের তদানীন্তন প্রভোস্ট ডক্টর মফিজুল্লা কবীরের বাসভবনও ছিল একই এলাকায়। উল্লিখিত প্রতিটি বাড়ীতে পাক বর্বরেরা বার বার হানা দেয় কিন্তু ডক্টর জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা এবং অধ্যাপক মুনিরুজ্জামান ছাড়া অন্যান্য অধ্যাপকেরা তাঁদের পরিবারবর্গসহ আশ্চর্যজনকভাবে রক্ষা পেয়ে যান। অধ্যাপক মুনিরুজ্জামান পঁচিশে মার্চের মাত্র কয়েকদিন পূর্বে ৩৪ নম্বর বাড়ীতে উঠে আসেন। এর আগে তিনি ইকবাল হলের কাছে থাকতেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় ইকবাল হলে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের প্রধান কেন্দ্র থাকায় ইকবাল হল অঞ্চলটি সর্বদাই কোলাহলময় ও উত্তেজনাপূর্ণ থাকত। শান্তিপ্রিয় মুনিরুজ্জামান সাহেব সম্ভবতঃ ইকবাল হলের গোলযোগপূর্ণ পরিবেশ থেকে দূরে চলে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন কিন্তু তিনি কি জানতেন নিয়তি তাঁকে মৃত্যুর মুখোমুখি ঠেলে দিয়েছে?

পরিসংখ্যানবিদ অধ্যাপক মুনিরুজ্জামান নিরীহ শান্তিপ্রিয় মানুষ ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সভা-সমিতি কোন অনুষ্ঠানে তাঁকে আমরা কখনো দেখিনি। অসহযোগ আন্দোলনের সময় পুরো মার্চ মাস ধরে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক সভা, শোভাযাত্রা করেছি

কিন্তু অধ্যাপক মনিরুজ্জামানকে তাতে টানা যায়নি। এই সরল ধর্মপ্রাণ মানুষটি তাঁর ভ্রাতা অধ্যাপক নুরুজ্জামান ওরফে ডক্টর হাসান জামানের ঠিক বিপরীত প্রকৃতির ছিলেন। ডক্টর হাসান জামান রাজনীতি, ক্ষমতা, ও নামের প্রতি যতটা আসক্ত ছিলেন অধ্যাপক মুনিরুজ্জামান ঐ সবের প্রতি ছিলেন ততটা উদাসীন ও নিরাসক্ত। তিনি ধর্মভীরু ছিলেন কিন্তু ধর্ম ছিল অধ্যাপক মুনিরুজ্জামানের আধ্যাত্ম সাধনার পথ, হাসান জামানের মত ধর্মকে তিনি রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেননি। অধ্যাপক মুনিরুজ্জামান যে নিষ্ঠাবান পরহেজগার মুসলমান ছিলেন তা তাঁকে দেখলে ভুল হবার কোন উপায় ছিল না। তার বাড়ীতে ঢুকে পাকিস্তানী পশুরা তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে তিনি স্পষ্ট উচ্চারণ করেছিলেন, 'মুনিরুজ্জামান' কিন্তু সৌম্য শ্মশ্রুমণ্ডিত কপালে নামাজের সেজদার চিহ্ন সম্বলিত মুনিরুজ্জামান বাঁচতে পারলেন না পাকিস্তানের ইসলামী জেহাদীদের হাত থেকে। অধ্যাপক মুনিরুজ্জামান তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আকরাম, কনিষ্ঠ ভ্রাতা শামসুজ্জামান, ভাগ্নে মঞ্জু সহ শহীদ হলেন। মুনিরুজ্জামান সাহেবকে পুত্র, ভ্রাতা ও ভাগনে সহ বাড়ী থেকে বের করে নীচে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। বেগম মুনিরুজ্জামান ছুটে বাইরে গিয়ে দেখেন সব শেষ, স্বামী, পুত্র, দেবর, ভাগনে সব রক্তের স্রোতে, তিনি আরও দেখেন গুলীবিদ্ধ রক্তাক্ত ডক্টর জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাকে, জ্যোতির্ময় বাবু তখনও জীবিত, অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করছেন, কাতরাচ্ছেন একটু পানির জন্যে। বেগম মুনিরুজ্জামান সব হারিয়েছিলেন কিন্তু জ্ঞান হারান নি, তিনি ওপর তলা থেকে পানি এনে জ্যোতির্ময় বাবুকে পানি খাওয়ান, বাসন্তী গুহঠাকুরতাকে ডেকে বলেন, 'দিদি, জ্যোতির্ময় বাবু এখনও বেঁচে আছেন'। সঙ্গে সঙ্গে গুলীবিদ্ধ জ্যোতির্ময় বাবুকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। ২৭শে মার্চের পরে তাঁকে হাসপাতালেও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস

ত্যাগ করেন। পাকিস্তানী পশুরা আবার ফিরে আসে, এবারে তারা অধ্যাপক মুনিরুজ্জামান, তাঁর ভ্রাতা, পুত্র ও ভাগ্নের লাশ নিয়ে যায় জগন্নাথ হলের মাঠে—সেখানে গণসমাধিতে নিক্ষেপ করে।

ডক্টর গোবিন্দচন্দ্র দেবের এবং অধ্যাপক মুনিরুজ্জামানের লাশ একই সমাধিতে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। হিন্দু গোবিন্দচন্দ্র দেব এবং মুসলমান মুনিরুজ্জামানের মৃতদেহ পাকিস্তানীদের হাতে একই পরিণতি লাভ করে। কারণ হিন্দু বা মুসলমান এই পরিচয়ের চেয়েও তাদের যে পরিচয় পাকিস্তানীদের কাছে বড় ছিল সে হ'ল বাঙালী পরিচয়। অধ্যাপক মুনিরুজ্জামানকে কেন পাকিস্তানীরা হত্যা করল তা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, বহু গবেষণা হয়েছে, অনেকে আশ্চর্যও হয়েছেন তাঁর মৃত্যুতে, শোনা যায় অধ্যাপক মুনিরুজ্জামানের ভ্রাতা ডক্টর হাসান জামান তাঁর ভ্রাতার মৃত্যু সম্পর্কে ভ্রাতৃহন্তা জেনারেল টিক্কা খানের কাছ থেকে একটি সার্টিফিকেট সংগ্রহ করেছিলেন, তাতে নাকি লেখা ছিল 'এক্সিডেন্টাল ডেথ' বা 'দুর্ঘটনামূলক মৃত্যু'! ডক্টর হাসান জামান নাকি তাঁর ভ্রাতৃহন্তার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ পঁচিশ হাজার টাকার একটি চেকও আদায় করতে পেরেছিলেন। কিন্তু এটা কি ঠিক যে অধ্যাপক মুনিরুজ্জামানের মৃত্যুর জন্যে ডক্টর হাসান জামান টিক্কা খানকে দায়ী করেননি, তিনি দায়ী করতেন 'দুষ্কৃতিকারীদের'?

বেগম মুনিরুজ্জামান সাতাইশে মার্চের পরে অবশিষ্ট দু'টি ছেলেমেয়েকে নিয়ে এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অধ্যাপক মুনিরুজ্জামানের পরিবারকে বাসস্থান ও ভাতার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মুনিরুজ্জামান এ দেশে পরিসংখ্যানতত্ত্বের চর্চা ও প্রসারের অন্যতম পথিকৃত, এ প্রসঙ্গে ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেনের পরেই তাঁর নাম

উল্লেখযোগ্য। গত দুই দশক ধরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান ইন্সটিটিউট ও পরিসংখ্যান বিভাগের সুষ্ঠু বিকাশে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, শেষ পর্যন্ত তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করে গেলেন বাংলাদেশের শৃংখল মোচনে। ডক্টর গোবিন্দ দেবের মতো অধ্যাপক মুনিরুজ্জামানের হত্যাকাণ্ডেও বিশ্ব স্তম্ভিত হয়েছিল, শিউরে উঠেছিলো, ঘৃণায় মুখর হয়ে উঠেছিল পাকিস্তানী পশুদের নিন্দায়। অধ্যাপক মুনিরুজ্জামানের মৃত্যু বৃথা যায় নি, এমন এক একটি মৃত্যুই তো আমাদের বজ্র কঠিন করে তুলেছিল দেশমাতৃকার শৃংখল মোচনে, আমাদের দাসত্বের বন্ধন মোচনে আর তাইতো আজ আমরা স্বাধীন, মুক্ত। কিন্তু স্বাধীনতা বার্ষিকীর লগ্নে যেন আমরা ভুলে না যাই ঐ মহৎপ্রাণদের কথা, মুনিরুজ্জামানের কথা।

ডক্টর জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা

পঁচিশে মার্চ কালো রাত্রির অন্যতম পাকিস্তানী শিকার ডক্টর জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা। জ্যোতির্ময় বাবু এবং অধ্যাপক মুনিরুজ্জামান প্রতিবেশী ছিলেন, ৩৪ নং বিশ্ববিদ্যালয় আবাসের (শহীদ মিনারের বিপরীতে অবস্থিত) ওপরে নীচে তাঁরা থাকতেন সপরিবারে। অধ্যাপক মুনিরুজ্জামান এ বাড়ীতে উঠে এসেছিলেন ইকবাল হল সন্নিহিত আবাসিক এলাকা থেকে আর জ্যোতির্ময় বাবু গেণ্ডারিয়া থেকে। ডক্টর গুহঠাকুরতা পূর্বে দীর্ঘদিন গেণ্ডারিয়া মহিলা বিদ্যালয়ে তাঁর স্ত্রী বাসন্তী গুহঠাকুরতার বাসভবনে কাটিয়েছেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক রকম জোর করে জগন্নাথ হলের প্রভোস্টের দায়িত্বভার তাঁর ওপর চাপিয়ে দিলে অনেক ইতস্ততঃ করে শেষ পর্যন্ত তিনি জগন্নাথ হলের কাছে বসবাস করতে আসেন এবং তাই তাঁর কাল হ'ল।

পাকিস্তানী ঘাতকেরা যখন তাঁর দরজায় আঘাত হানে তখনও তিনি বুঝতে পারেননি তাঁর জীবন শেষ হয়ে এসেছে, তিনি ভেবেছিলেন তাঁকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হবে তাই তিনি একটি জামা গায়ে চাপিয়ে ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন, বর্বরদের প্রশ্নের উত্তরে যথাযথ নিজের নাম এবং কোন্ ধর্মাবলম্বী তা বলেছিলেন। তিনি যে হিন্দু ছিলেন এ পরিচয় এর আগে কখনও তাঁকে এমনভাবে দিতে হয়নি। বস্তুতঃ তিনি সেই শ্রেণীর মানুষ ছিলেন যাঁরা বিশ্বাস করে

থাকেন জন্মগত কারণেই এক একজন মানুষ এক এক ধর্মাবলম্বী, পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত এই উত্তরাধিকার নিয়ে তাঁরা তাই কোন দায়িত্ব অনুভব করেন না। জ্যোতির্ময় বাবু জাতি-ধর্মের উর্ধ্বে ছিলেন, তাঁর প্রকৃত ধর্ম ছিল রেডিক্যাল হিউম্যানিজম। এম. এন. রায়ের ভাবশিষ্যরূপে তিনি প্রগতিশীল মানব ধর্মে দীক্ষিত ছিলেন এবং সারা জীবন তারই সাধনা করে গেছেন। কিন্তু পাকিস্তানী ঘাতকদের কাছে জ্যোতির্ময় বাবুর এ পরিচয় মুখ্য ছিল না, জ্যোতির্ময় বাবু যে একটি হিন্দু নাম ধারণ করেছিলেন, তিনি যে 'হিন্দু' হলের প্রভোস্ট ছিলেন, তিনি যে বাঙালী ছিলেন এই পরিচয়ের জন্যেই পাকিস্তানীদের বুলেটের হাত থেকে জ্যোতির্ময় বাবু রেহাই পেলেন না।

জ্যোতির্ময় বাবু গুলীবিদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ ত্যাগ করেননি, কারণ গুলী তাঁর মস্তকে বা বক্ষে বিদ্ধ হয়নি হয়েছিল কণ্ঠে এবং স্কন্ধে। বুলেটবিদ্ধ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা ৩৪ নং বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসে পড়েছিলেন, রক্ত ক্ষরণে ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে পড়ছিলেন, তাঁর নিকটেই পড়েছিলেন গুলীবিদ্ধ অধ্যাপক মুনিরুজ্জামান, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আকরাম। বেগম মুনিরুজ্জামান গুলীর শব্দে স্বামী, পুত্র, দেবরের সন্ধানে ছুটে আসেন নীচে কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ কেবল বুলেটবিদ্ধ জ্যোতির্ময় বাবু তখন কাতরাচ্ছেন অসহ্য যন্ত্রণা আর পিপাসায়, তিনি বেগম মুনিরুজ্জামানের কাছে জল পান করতে চাইলেন। মহীয়সী মহিলা বেগম মুনিরুজ্জামান সব হারালেও জ্ঞান হারাননি তখনও। ছুটে গেলেন ওপরে, পানি নিয়ে এলেন, তৃষ্ণা মেটালেন মৃত্যুপথ যাত্রীর, ডাকলেন বাসন্তী গুহঠাকুরতাকে। ইতিমধ্যে সকলে মিলে চেষ্টা করলেন গুলীবিদ্ধ জ্যোতির্ময় বাবুকে বাড়ীর মধ্যে তুলে নিয়ে যেতে।

বুলেটবিদ্ধ জ্যোতির্ময় বাবু তখনও জ্ঞান হারাননি, তিনি বললেন শরীরের কোথায় কোথায় তাঁর বুলেট লেগেছে শরীরের কোন্ কোন্ অংশ অবশ হয়ে গেছে, তাঁকে তুলে নেবার সময়

যেন ঐ সব জায়গায় হাত না পড়ে তাও বললেন। ঐ চরম মুহূর্তেও জ্যোতির্ময় বাবু যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের, যে ধৈর্যের, স্থৈর্যের, সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন তার কোন তুলনা নেই। পাকিস্তানী ঘাতকেরা ফিরে এসে জ্যোতির্ময় বাবুর বুলেটবিদ্ধ দেহটি পায়নি তবে অধ্যাপক মুনিরুজ্জামান ও অন্যান্যের লাশগুলো টেনে নিয়ে জগন্নাথ হল মাঠের গণসমাধিতে নিক্ষেপ করেছিল যেখানে ইতিপূর্বে তারা ডক্টর গোবিন্দ দেবের লাশটিও এনে ফেলেছিল। ২৭শে মার্চে কিছুক্ষণের জন্যে কারফিউ উঠে গেলে জ্যোতির্ময় বাবুকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়, কিন্তু অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণ এবং ঐ গোলযোগপূর্ণ দিনে হাসপাতালে রক্ত পরিসঞ্চালনের অভাবে তাঁকে বাঁচানো সম্ভবপর হয়নি, দু'তিন দিন পরে তাঁর মৃত্যু হয়। তবে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর জ্ঞান ছিল, মৃত্যুচিন্তায় একটিবারের জন্যেও তিনি বিচলিত হননি। জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা এই অস্বাভাবিক মৃত্যুকেও গ্রহণ করেন সহজভাবে।

মানুষ যে মৃত্যুকে এমন সহজ, স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারে তা জ্যোতির্ময় বাবুকে না জানলে বিশ্বাস করা যায় না। বস্তুতঃ আমাদের সমাজে জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার মতো মানুষ বিরল। সদা হাস্যময় এই মানুষটি ভালবাসতেন সাহিত্য, দর্শন, নন্দনতত্ত্ব, রাজনীতি, অর্থনীতি। সব জটিল তত্ত্ব, সহজ সাবলীল হয়ে উঠত তাঁর কাছে। তিনি কথা বলতেন খুব, কথা বলতে ভালবাসতেন, পছন্দ করতেন তর্ক করতে। যে-কোন বিষয় নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা তিনি অনায়াসে কথা বলতে পারতেন, তর্ক করতে পারতেন এবং তা প্রাণভরে উপভোগ করতেন। তর্কের খাতিরে যে-কোন বিষয়ের পক্ষ বা বিপক্ষ অবলম্বন করে সমান নৈপুণ্যে তিনি বিলক্ষণ তর্ক চালিয়ে যেতে পারতেন। বিবিধ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক

দর্শনে তাঁর ছিল ব্যুৎপত্তি কিন্তু গোঁড়ামির কোন প্রশ্রয় ছিল না তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে। আধুনিক, সার্বজনীন, উদার মানবিক অথচ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণপ্রবণ মানসিকতা ছিল জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার। জাতি-ধর্মের উর্ধ্বে ছিলেন তিনি, তাই সংখ্যালঘু হয়েও পঁচিশ বছরের পাকিস্তানী জীবনে কোন মানসিক হীনমন্যতায় ভুগতে হয়নি কোন দিন তাঁকে। তাই বিলেত থেকে উচ্চ শিক্ষা সমাপন করে ভারতে চলে না গিয়ে ফিরে এসেছিলেন আইয়ুব খানের পাকিস্তানে, মোনায়েম খানের পূর্ব পাকিস্তানে, ডক্টর ওসমান গনির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়নের ইংরেজী বিভাগে যে ইংরেজী বিভাগের তিনি ছিলেন প্রাণ, সর্বজনপ্রিয় শিক্ষক। বস্তুতঃ আমাদের দেশে ইংরেজী সাহিত্যে আদর্শ অধ্যাপকের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা। দেশীয় ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিতে অগাধ জ্ঞান, সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিতে দক্ষতা, এ দু'য়ের মিলনে জ্যোতির্ময় বাবু ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের আদর্শ শিক্ষক, তাঁর অবর্তমানে ইংরেজী বিভাগ শুধু ক্ষতিগ্রস্তই নয় দরিদ্রও বটে। ইংরেজীর অধ্যাপক অনেক পাওয়া যাবে কিন্তু জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার মতো সাহিত্যের অধ্যাপক মিলবে না।

জ্যোতির্ময় বাবু ছিলেন সেই শ্রেণীর মানুষ যাঁরা হাস্যমুখে অদৃষ্টকে পরিহাস করতে পারেন। এমানুষটির জ্যোতির্ময় নামটিও সার্থক, তাঁর ব্যক্তিত্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সর্বদা ঐ নামের মহিমা প্রচার করেছে। বরিশালের অভিজাত জমিদার পরিবারের সন্তান জ্যোতির্ময় বাবুর মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্যের কিছু অবশিষ্ট ছিল না তবে তাঁর জীবন ধারণের মধ্যে, জীবনযাপনের মধ্যে শিক্ষার, রুচির, চিন্তার আভিজাত্য ছিল এবং যার স্ফুরণ ছিল স্পষ্ট। এমন অধ্যাপক শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যেই নয়, সহকর্মীদের জন্যেও শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এ শিক্ষক বন্ধুর মত সহজ, উপভোগ্য, আনন্দদায়ক।

এমন শিক্ষকের সাহচর্য এক মূল্যবান অভিজ্ঞতা সবার জন্যেই। জ্যোতির্ময় বাবু জ্ঞানী ছিলেন কিন্তু পণ্ডিত ছিলেন না, তিনি জ্ঞানের ভারে কুব্জ ছিলেন না, ছিলেন জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত। তিনি আমাদের জ্ঞানের দুরূহতায় ভারাক্রান্ত করতেন না, জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করতেন। পাকিস্তানী দস্যুরা সে আনন্দ, সে সাহচর্য থেকে আমাদের বঞ্চিত করল; আর আমরা শিক্ষক মিলনায়তনে সেই উজ্জ্বল সদা হাস্যময় মুখটি দেখতে পাব না, আমাদের শিক্ষক মিলনায়তন থেকে অনেক মুখই হারিয়ে গেছে কিন্তু এমন প্রাণবন্ত, সজীব মুখ আর একটিও ছিল না। তাই জ্যোতির্ময় বাবুর অভাবে শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মিলনায়তনটিই শ্রীহীন নয়, ইংরেজী বিভাগটিই শুধু ফাঁকা নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও জ্যোতিহীন।

মামুন মাহমুদ

বাংলাদেশের স্বাধীনতার বেদীমূলে আত্মাহুতি দিতে হয়েছে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সব শ্রেণীর সব পেশার মানুষকে। প্রাণ দিয়েছেন ছাত্র, শিক্ষক, সাংবাদিক, শ্রমিক, রাজনৈতিক কর্মী, সরকারী কর্মচারী। আত্মাহুতি দিয়েছেন পুলিশ, ই. পি. আর., বাঙালী সৈনিক। বাঙালী অস্ত্রধারীদের ওপর ছিল পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বিশেষ দৃষ্টি তাই পঁচিশের রাতে একযোগে সারা দেশে বাঙালী সৈনিক, বাঙালী পুলিশদের ওপরে আক্রমণ চালান হয়েছিল যাতে একজন বাঙালী অস্ত্রধারীও বেঁচে থাকতে না পারেন। আমাদের পুলিশ, ই. পি. আর., ইস্ট বেঙ্গল রেজিম্যান্টের সৈনিক ও অফিসাররা বীর বিক্রমে পাকিস্তান বাহিনীর সঙ্গে সে রাত্রে লড়াই করে আত্মত্যাগের দেশ প্রেমের যে পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন তার নজির দুনিয়ার ইতিহাসে বিরল। বাঙালী জওয়ানদের এ সংগ্রামে আমাদের পুলিশ বাহিনীর ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর সেই সংগ্রামে যাঁর আত্মাহূতি সবচেয়ে বেশী প্রেরণা যুগিয়েছিল তিনি হলেন মামুন মাহমুদ। বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদের আদরের দুলাল, মরহুম হাবিবুল্লাহ বাহারের প্রিয় ভাগ্নে মামুন মাহমুদ, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদের প্রথম সারির একটি উজ্জ্বল নাম।

একাত্তরের পঁচিশে মার্চ সমস্ত দিন রাজশাহী রেঞ্জের পুলিশের ডি. আই. জি. মামুন মাহমুদ ছিলেন অত্যন্ত চিন্তিত, স্থানীয়

ডি. সি., এস. পি. এবং তিনজন রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে রুদ্ধদ্বার কক্ষে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে তাঁর। তিনি স্থানীয় নেতাদের কাছে দশ হাজার স্বেচ্ছাসেবক চেয়েছিলেন তাদের সঙ্গে তার পুলিশ বাহিনী নিয়ে রাজশাহীতে মোতায়েন শক্তিশালী পাকিস্তান বাহিনীর সঙ্গে মোকাবেলার সংকল্প করেছিলেন। রাজশাহীতে পাকিস্তানী বর্বরেরা মার্চের শুরু থেকেই ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিল ; তাদের হত্যাযজ্ঞ ৩রা মার্চ থেকে চলতে থাকে। ৩রা মার্চ টেলিফোন অফিসের সামনে এবং ৪ঠা মার্চ বাজার এলাকায় পাকিস্তানীরা অকারণে বহু বাঙালীকে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে মামুন মাহমুদ তাঁর বাসভবন ও অফিসে কালো পতাকা উত্তোলন করেন। ২৫শে মার্চ তারিখে রাত্রে সাংঘাতিক কিছু ঘটার আশংকা তিনি করছিলেন, পুলিশ বাহিনীকে তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন, তাদের বলে দিয়েছিলেন অযথা রক্তক্ষয় এড়িয়ে যেতে। তাঁর আশংকা সত্যে পরিণত হয়, পঁচিশে মার্চ রাত্রি দেড়টার সময় ঝাঁকে ঝাঁকে পঁশ্চিম পাকিস্তানী সৈনিক রাজশাহীর পুলিশ লাইন এবং পদস্থ বাঙালী কর্মচারীদের বাসভবনগুলো ঘিরে ফেলে। ২৬শে মার্চ সকালে একজন পাঞ্জাবী ক্যাপ্টেন সসৈন্যে ট্রেজারীতে ঢুকতে গিয়ে পুলিশ গার্ডদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। ক্ষিপ্ত হয়ে ক্যাপ্টেন স্থানীয় এস. পি. মজিদ সাহেবকে আদেশ দেয় ঐ গার্ডদের সামরিক বাহিনীর কাছে সমর্পণের জন্যে। মজিদ সাহেব ক্যাপ্টেন ও তার দলকে ঐ গার্ড দুইজন সহ নিয়ে আসেন ডি. আই. জি. মামুন মাহমুদের কাছে। মামুন সাহেব ক্যাপ্টেনকে স্পষ্ট বলে দেন, 'আমার গার্ডরা কোঁন অন্যায় করেনি, তারা 'পাসওয়ার্ড' ছাড়া কাউকে ট্রেজারীতে ঢুকতে দেয়নি, তারা তাদের কর্তব্য পালন করেছে মাত্র।' কিন্তু পাঞ্জাবী ক্যাপ্টেন তবু ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করলে তাকে মামুন মাহমুদ স্পষ্ট বলে

দিয়েছিলেন :

> My men have done the right thing…you are in power you can shoot anybody, you can kill any body if you want to use the power in that way.

মামুন মাহমুদ কি জানতেন পাকিস্তানী ঘাতকেরা অনতিবিলম্বে বাস্তবিকই তা করতে যাচ্ছিল ?

২৬শে মার্চ মামুন মাহমুদের বিবাহ বার্ষিকী, ষোল বছর আগে এই দিনটিতে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন মোশফেকা মাহমুদের সঙ্গে। একাত্তরের ২৬শে মার্চেও তার কথা বিস্মৃত হননি তিনি। ২৫শে মার্চেই ঐ উপলক্ষে তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে দুজনের জন্যে কয়েকটি বই সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। চৌদ্দ বছরের মেয়ে যেবাকে তিনি দিয়েছিলেন কার্ল মার্কস-এর সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী, তাতে লিখে দিয়েছিলেন,

> Zeba, when Bangladesh is in the throes of its struggle for freedom, this book one who preached emancipation of the downtrodden, should we hope inspire you.

লেনিন সম্পর্কে একটি গ্রন্থও তিনি যেবাকে দিয়ে তাতে লিখে দিয়েছিলেন,

> Zeba, This is about a devoted Leader of a valiant people who once struggled for emancipation from exploitation like the people of Bangladesh today.

স্ত্রী মোশফেকা মাহমুদকে দিয়েছিলেন, 'সুকান্তের সমগ্র কবিতা' তাতে লিখেছিলেন, 'মনিকে'— স্বাধিকার সংগ্রামে স্মরণীয় এবারের ২৬শে মার্চ, '৭১ মামুন। নিজের জন্যেও একটি বই এনেছিলেন তিনি, বইটি ছিল চে-গুয়েভারার, কিউবার বিপ্লবী সংগ্রামের স্মৃতি সম্পর্কিত একটি ইংরেজী গ্রন্থ, তাতে লাল কালিতে বাংলায় লিখেছিলেন নিজের নাম মামুন— ২৬শে মার্চ, '৭১।

মামুন নামটি রক্তাক্ষরেই লেখা হয়ে গেল স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা লগ্নে। ২৬শে মার্চ সারাদিন সবগুলো বই তিনি স্ত্রী, পুত্র,

কন্যাকে নিয়ে পড়ে শেষ করেন। মার্কস, লেনিন, গুয়েভারা আর সুকান্ত, বোঝা যায় আসন্ন সংগ্রামের মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তিনি। ২৬শে মার্চ সন্ধ্যা ৭টায় মামুন মাহমুদকে ক্যান্টনমেণ্টে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়, রংপুর থেকে ব্রিগেডিয়ার আবদুল্লাহ্ ওয়ারলেসে কথা বলতে চেয়েছেন এই ছিল অজুহাত। আর তিনি ফিরে আসেননি। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে রাজশাহী থেকে পাকিস্তান বাহিনী সাময়িকভাবে পশ্চাদপসারণ করে, কিন্তু ১৪ই এপ্রিল তারিখে পাকিস্তান বাহিনী নরঘাতক কর্নেল তাজের নেতৃত্বে রাজশাহীতে পুনঃ প্রবেশ করে। কর্নেল আবদুল্লাহ্ সামরিক ইনটেলিজেন্স-এর মেজর ইকবাল ও ক্যাপ্টেন সালমান মাহমুদকে নিয়ে যে সব বাঙালীকে হত্যা করতে হবে তার একটি তালিকা প্রণয়ন করে এবং সে অনুসারে এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত চলতে থাকে রাজশাহী অঞ্চলে সুপরিকল্পিত হত্যা, ধর্ষণ, লুট, আর ধ্বংসলীলা।

বেগম মোশফেকা মাহ্‌মুদ অনেক মাথা খুঁড়ে নরপিশাচ ফরমান আলীর দফতর থেকে স্বামীর পরিণতি সম্পর্কে এই উত্তরটি পেয়েছিলেন,

> It has been checked with all army HQS, Mr. Mamun Mahmud is not under detention with any army authority, Army authority in Rajshahi lost track of him after they were forced to vacate Rajshahi during the first week of April 1971.

ঐ সাফাই থেকে মনে হয় এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে পাক-বাহিনীর রাজশাহীতে থেকে পশ্চাদপসারণের সময় অথবা এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে রাজশাহীতে পুনঃপ্রবেশের সময় মামুন মাহমুদের ভাগ্যে চরম পরিণতি ঘটে।

বস্তুতঃ মামুন মাহমুদকে পাকসামরিক চক্র চিহ্নিত করেছিল বহু পূর্বেই, ১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দে যখন তিনি খুলনায় এস. পি. ছিলেন। স্মাগলিং বন্ধ করতে গিয়ে খান সবুরের ডান হাতকে গ্রেফতার করে বসেছিলেন,

তিনি। শুধু তাই নয় ৬৬ সালের ৭ই জুন তারিখে ৬-দফা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদ দিবসে তিনি মোনায়েম খানের আদেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছিলেন তাই তখন তাঁকে লিখিতভাবে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল, মামুন মাহমুদকে এসিস্ট্যান্ট ইনসপেক্টর-জেনারেল অব পুলিশ লিখেছিলেন:

> It has recently been brought to the notice of this Directorate in connection with the holding of the Protest Day Hartal at Khulna on 7.6.66., called by the Awami League, that generally speaking, the local M.L. leaders are a little averse to you in view of the fact that normally you maintain good relations with some of the opposition parties. It was also held that you could afford to take more initiative and become a little more strict in your actions in respect of the rowdy elements of the opposition parties and also more discreet in your dealing with the political parties.

মামুন মাহমুদ চিহ্নিত হয়েছিলেন ৬-দফা আন্দোলনের সময় খুলনায় শেখ মুজিবর রহমানকে গ্রেপ্তার না করে।

মামুন মাহমুদ আরও চিহ্নিত হয়েছিলেন ৬৯ সালের ১লা নভেম্বর তারিখে। লেঃ কঃ আকবরের নেতৃত্বে নিষ্ক্রিয় পাক সৈন্যদের সামনে উচ্ছৃঙ্খল সশস্ত্র বিহারীদের হাত থেকে যখন তিনি নিজের পুলিশ বাহিনীকে রক্ষা করতে গিয়ে গুরুতররূপে আহত হয়েছিলেন। এবং সেই আহত অবস্থায় রাজারবাগ পুলিশ লাইনে গিয়ে পুলিশদের বিদ্রোহ শান্ত করেছিলেন। এই জনপ্রিয় পুলিশ অফিসারটি সেদিন থেকেই চিহ্নিত।

মামুন মাহমুদ আরও বেশী করে চিহ্নিত হয়েছিলেন মালেকের মৃত্যু সম্পর্কিত ঘটনায়। ৭০ সালের জানুয়ারী মাসে জামাতে ইসলামী আর ইসলামী ছাত্র সংঘের কর্মীরা ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের সভায়

হামলা করলে ইসলামী ছাত্রসংঘের মালেক আহত হয় ও পরে মারা যায়। সে দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপরে গুলী না চালানোর অপরাধে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে ঢাকা ছাড়তে বাধ্য করা হয়, পাঠিয়ে দেওয়া হয় ময়মনসিংহে।

মামুন মাহমুদ সবচেয়ে বেশী চিহ্নিত হয়েছিলেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সময়, যেদিন তিনি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে অন্যতম আসামী শামসুর রহমানকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন আর পাকিস্তানী সামরিক অফিসারের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিলেন, 'হ্যাঁ এই আসামী আমার বন্ধু, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

মামুন মাহমুদের মতো বাঙালী পুলিশ অফিসারের তাই এ পরিণতি।

ডক্টর ফজলুর রহমান

ইকবাল হলের পেছনে নীলক্ষেত অঞ্চলে ২৩, ২৪ ও ২৫ নং বিশ্ববিদ্যালয় আবাসে মোট চব্বিশ জন শিক্ষক তাঁদের পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস করেন। আমি তখন ২৪ নম্বরের বাশিন্দা, ডক্টর ফজলুর রহমান থাকতেন ২৩ নং বাড়ীতে, একই বাড়ীতে অধ্যাপক আনোয়ার পাশা ও অধ্যাপক রশিদুল হাসান থাকতেন সপরিবারে। ২৫ নম্বর বাড়ীর পরেই নীলক্ষেত রেললাইনের ওপরে বস্তী, সেখানে বাস করেন হাজার হাজার বাস্তুহারা পরিবার। আমাদের বাড়ীগুলোর সামনেই নীলক্ষেত রোডের সমান্তরাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মচারীদের চারটি আবাস। পঁচিশে রাত্রি ঠিক বারোটার সময় আমাদের ওপর দিয়ে ইকবাল হলের ওপর পাকিস্তান আর্মি সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের হেডকোয়ার্টার ইকবাল হলে অবস্থিত ছিল বলে পাকিস্তান সামরিক শক্তির সবচেয়ে বেশী ক্রোধ ছিল ইকবাল হলের ওপরে। তাই আক্রমণের প্রচণ্ডতাও ছিল তদনুরূপ। ইকবাল হলের সামনে পুকুর পাড় থেকে এবং পেছনে নীলক্ষেত ফাঁড়ির কাছ থেকে ঠিক রাত্রি বারটার সময় পাকিস্তান গোলন্দাজ বাহিনী ভারী মর্টার ও মেশিনগান থেকে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ শুরু করে ইকবাল হল লক্ষ্য করে। সঙ্গে সঙ্গে ইকবাল হল থেকে ছাত্র ও বিয়ারাররা এবং নীলক্ষেত পুলিশ ফাঁড়ি থেকে বাঙালী পুলিশ

কর্মচারীরা পালিয়ে এসে সংলগ্ন শিক্ষক ও কর্মচারীদের বাড়ীতে আশ্রয় নিতে শুরু করে। 'প্রেসিডেন্ট হাউজে' যে সব ই. পি. আর. ডিউটিতে ছিলেন তাঁদের নিরস্ত্র করে রমনা রেসকোর্সে নিয়ে গুলী করে মারা হয়। সেখান থেকেও কিছু সংখ্যক ই.পি.আর. জওয়ান পালিয়ে এসে আমাদের এলাকায় আশ্রয় নেয়। পাকিস্তানী পশুরা নীলক্ষেত রেল লাইনে অবস্থিত বস্তী এলাকায়ও অগ্নিসংযোগ করে এবং আগুন থেকে বাঁচার জন্যে পলায়নপর হাজার হাজার নারী, পুরুষ ও শিশুর ওপর নীলক্ষেত রেল গেইটে মেশিনগান বসিয়ে কুকুর-বেড়ালের মত হত্যা করতে থাকে। ঐ বস্তী এলাকা থেকেও বহু নরনারী ও শিশু পালিয়ে এসে আমাদের এলাকায় বিভিন্ন বাড়ীর মধ্যে, বাড়ীর ছাদে সিড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করে। পঁচিশে মার্চ সমস্ত রাত্রি, ছাব্বিশে মার্চ সমস্ত দিন ও রাত্রি এই ছত্রিশ ঘণ্টা সময় ইকবাল হল সংলগ্ন আবাসিক এলাকা সমূহে যে নারকীয় তাণ্ডবলীলার সৃষ্টি হয়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই। চারিদিকে আগুন আর বিস্ফোরণ, বস্তীতে আগুন, আবাসিক এলাকায় পার্ক করা গাড়ীগুলোতে বিস্ফোরণ, বস্তী এলাকার মৃতদেহগুলো নীলক্ষেত রেলগেট সংলগ্ন পেট্রোল পাম্পের কাছে স্তূপীকৃত করে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। তার ওপরে প্রচণ্ড গোলাগুলি বর্ষণ। ধোঁয়া, আগুন, বারুদ আর মৃতদেহ পোড়ানোর গন্ধে সমস্ত এলাকাটা একটা প্রজ্বলিত নরক কুণ্ডে পরিণত হয়েছিল। আমাদের বাড়ীগুলো প্রতিমুহূর্তে গুলীর আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছিল। এর মধ্যে আমরা প্রাণের আশা পরিত্যাগ করে, পরিবার-পরিজন, আশ্রয়গ্রহণকারী ইকবাল হলের ছাত্র বিয়ারার, বস্তীবাসী সবাইকে নিয়ে ঘরের মেঝে পড়ে থেকে মৃত্যুর প্রহর গুণছিলাম।

পঁচিশে মার্চ সমস্ত রাত্রি ধরে কামান, মর্টার, মেশিনগান, ট্যাঙ্ক রকেট থেকে গোলাবর্ষণের পর ছাব্বিশে মার্চ খুব ভোরের দিকে

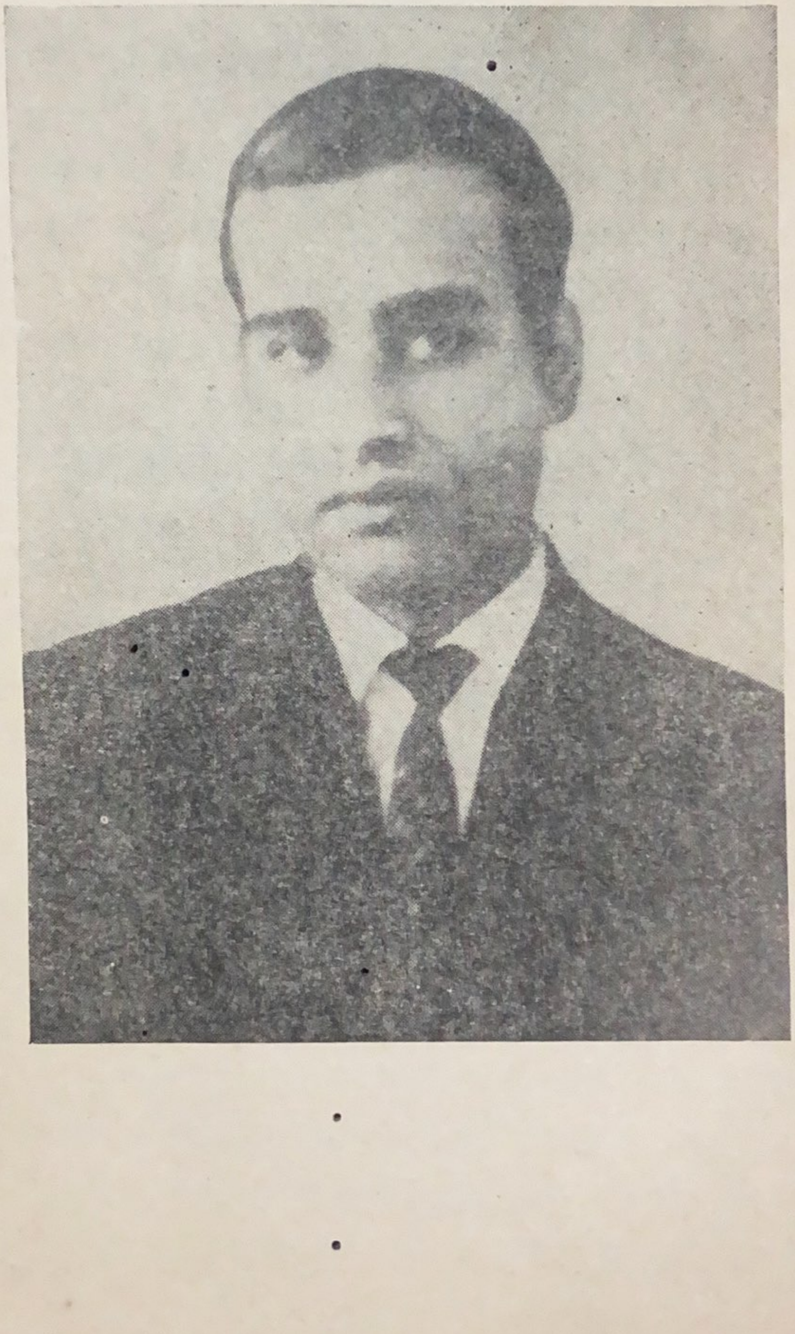

পাকিস্তানী ঘাতকেরা ইকবাল হলের ঘরে ঘরে ও আবাসিক এলাকার বিভিন্ন বাড়ীতে ঢুকে পড়ে হত্যা ও লুণ্ঠন চালাতে থাকে। ইকবাল হলের যে সব হতভাগ্য ছাত্র ও বিয়ারার পালাতে পারেননি তাঁরা সকলেই পাকিস্তানীদের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের শিকার হন। কয়েকজন ছাত্রকে তারা ধরে নিয়ে গায়ে পেট্রোল ঢেলে ইকবাল হল কাফেটেরিয়ার মধ্যে আগুনে পুড়িয়ে মারে। 'আজাদ' পত্রিকার বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা হেলালুর রহমান চিশতিকে ইকবাল হল মিলনায়তনের পাশে দাঁড় করিয়ে গুলী করে হত্যা করা হয়, হত্যা করা হয় হল বিয়ারার শামসুকে। ইকবাল হল শেষ করে পাকিস্তানী নরপশুরা শিক্ষকদের বাড়ীতে ঢুকে পড়ে। প্রথম তারা প্রবেশ করে ২৩ নং বাড়ীর বিভিন্ন ফ্ল্যাটে, এ বাড়ীর একটি ফ্ল্যাটেই তারা মৃত্তিকাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর ফজলুর রহমান এবং তাঁর দু'জন আত্মীয়কে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। তারা অধ্যাপক আনোয়ার পাশা এবং অধ্যাপক রশিদুল হাসানের বাড়ীতেও প্রবেশ করেছিল, কিন্তু উভয়েই পরিবারের সকলকে নিয়ে অন্ধকারে চৌকির নীচে লুকিয়ে ছিলেন, উভয়ের বাড়ীতে পাকিস্তানী পশুরা প্রবেশ করে টর্চের আলো ফেলে কাউকে না দেখে চলে যায়। যাবার সময় তাদের বলতে শোনা গিয়েছিল 'বাঙালী কুত্তা ভাগ গিয়া'। অধ্যাপক আনোয়ার পাশা ও অধ্যাপক রশিদুল হাসান পঁচিশে মার্চ তারিখে পাকিস্তানী বর্বরদের হাত থেকে আশ্চর্যজনকভাবে রেহাই পেলেও চৌদ্দই ডিসেম্বর তারিখে স্বাধীনতার পূর্ব মুহূর্তে রাজাকার আল-বদরের হাত থেকে রেহাই পাননি। ২৩ নং বাড়ীর অপর বাশিন্দা সহকারী গ্রন্থাগারিক মৃধা সাহেবও সেদিন আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে যান! কিন্তু ২৩ নং বাড়ীর ছাদে আশ্রয় গ্রহণকারী ত্রিশ জন বস্তীবাসী নরনারী শিশু সেদিন পাকিস্তানী বর্বরদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। তাদের প্রত্যেককে হত্যা করা হয়েছিল আর তাদের মৃতদেহগুলো মাসাধিক কাল পর্যন্ত ঐ ছাদে ছিল, শকুন আর কাকে

সৎকার করেছিল। মাসাধিক কাল পরে ঐ ৩০টি কঙ্কাল ছাদ থেকে নামিয়ে আনা হয়েছিল। পাকিস্তানী হায়েনারা ২৪ নং বাড়ীতেও ঢুকেছিল কিন্তু ঐ বাড়ীর তিনতলার সিঁড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছিল বস্তী থেকে দু'পায়ে গুলীবিদ্ধ দুইটি মা, সঙ্গে ছিল তাদের শিশু সন্তান। তাদের রক্তে ২৪ নম্বর বাড়ীর সিঁড়ি ভেসে যাচ্ছিল। চব্বিশ নম্বরে ঢুকতে গিয়ে ঐ রক্তের ঢল দেখে পশুরা ভেবেছিল বোধ হয় অন্য কোন দল এসে হত্যাকাণ্ড সমাপ্ত করে গেছে তাই ঢোকেনি চব্বিশ নম্বরে, তাই আমরা বেঁচে গেছি তাই আমরা আজও জীবিত। সৌভাগ্যক্রমে ঐ দুটি মাকে আমাদের সাধ্যমত সেবা করে আমরা বাঁচিয়ে রেখেছিলাম এবং ২৭শে মার্চ তারিখে হাসপাতালে পেঁছে দিয়েছিলাম।

২৭শে মার্চ সকালে কারফিউ উঠে গেলে আত্মীয় বন্ধুদের অনেকে এসেছিলেন খোঁজ নিতে বেঁচে আছি কিনা! প্রথমে এসেছিলেন জহির রায়হান, তার পরে এসেছিলেন আমার আব্বা, ঐ বাড়ী থেকে আমাকে বের করে নিয়ে গিয়েছিল আমার পরম স্নেহ ভাজন তরুণ রুমি (শফি ইমাম) আর আমাকে ঐ দুঃসময়ে আশ্রয় দিয়েছিল আর এক তরুণ বাবু বা ওয়াহিদ। আজ তারা কেউ বেঁচে নেই, স্বাধীনতা সংগ্রামের নয় মাস কালের মধ্যে একে একে সবাইকে হারিয়েছি, যেমন হারিয়েছি আমার প্রতিবেশী ডক্টর ফজলুর রহমানকে, প্রতিদিন সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার সময় যার সঙ্গে দেখা হত, মৃদু সম্ভাষণ হত, একটু আধটু আলাপ হত। ডক্টর ফজলুর রহমান কিছুদিন আগেই বিদেশ থেকে ফিরেছিলেন আবার বিদেশ যাবার পরিকল্পনা করছিলেন। স্ত্রী বেগম ফজলুর রহমান পদার্থ বিদ্যায় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য কিছু দিন আগে বিলেত গিয়েছিলেন কথা ছিল তিনি টিকিট পাঠাবেন, ডক্টর ফজলুর রহমানও চলে যাবেন স্ত্রীর কাছে। সে সুযোগ এই তরুণ বিজ্ঞানীকে পাকিস্তানীরা দিল না। ডক্টর

ফজলুর রহমান আর কোনদিন বিলেত গিয়ে প্রিয় স্ত্রীর ফরিদার সঙ্গে মিলিত হতে পারবেন না। বেগম ফরিদা রহমান বিদেশ যাবার আগে তাঁদের ছয় সাত মাসের একমাত্র সন্তানটি হারান, পঁচিশে মার্চে হারালেন স্বামীকে, জানিনা কি নিয়ে তিনি এখন বেঁচে আছেন বিদেশ বিজনে! ২৭শে মার্চ সকালে নীলক্ষেত ছেড়ে যাবার আগে ডক্টর ফজলুর রহমানের ঘরে গিয়েছিলাম, রক্তের শয্যায় তিনটি মৃতদেহ ডক্টর রহমান, তাঁর আপন ভাগনে আরও একজন। শেষ বিদায় নিলাম তাঁদের কাছ থেকে, গেলাম বাড়ীর ওপরে যেখানে ছাদময় ছড়নো মৃতদেহ নারী, পুরুষ, বাচ্চা ছমাসের শিশু পর্যন্ত। ছাদের চিলেকোঠার দেয়ালে এক হতভাগিনীর চুলের গুচ্ছ পুরোটা লেপটে আছে। বিদায় নিলাম নীলক্ষেত থেকে। আমি আজও বেঁচে আছি অথচ ওরা কেউ বেঁচে নেই, ডক্টর ফজলুর রহমান, জহির রায়হান, আব্বা, রুমি, বাবু, চিশতি আর বস্তীর সংখ্যাহীন আদম সন্তান, বেঁচে থাকাটা কি আশ্চর্য নয়?

মোহাম্মদ সাদেক

পঁচিশে মার্চ রাতে দুই ব্যাটেলিয়ান পাকিস্তানী সৈন্য গোলন্দাজ ও সাঁজোয়া বাহিনীর সহায়তায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের আবাসিক এলাকাসমূহ আক্রমণের সময় ফুলার রোডের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আবাসসমূহের দুটি বাড়ীতে প্রবেশ করেছিল, ১১ ও ১২ নং বাড়ীতে। তার আগেই পাকিস্তানী ঘাতকেরা বৃটিশ কাউন্সিল পাহারারত ই. পি. আর.-এর বাঙালী জওয়ানদের হত্যা করেছিল। ফুলার রোড কলোনিতে ঢুকে পড়েই পাকিস্তানী জল্লাদেরা ১১ নম্বর বাড়ীর দোতালায় উঠে যায়; সেখানে একটি ফ্লাটে থাকতেন ইনস্টিটিউট অব এডুকেশনের একজন অবাঙালী শিক্ষক অধ্যাপক সাবির। অধ্যাপক সাবিরের সঙ্গে পাকিস্তানীদের কিছু কথোপকথন হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে এই দালানের পূর্বে ইনস্টিটিউট অব এডুকেশনের আরও একজন অবাঙালী শিক্ষক থাকতেন তাঁর নাম ডক্টর কিদওয়াই। ডক্টর কিদওয়াইর সঙ্গে ফুলার রোডের বাঙালী শিক্ষকদের অনেকেরই ভাল সম্পর্ক ছিল না। ডক্টর কিদওয়াই ২৫শে মার্চের দু'দিন মাত্র আগে ঢাকা ছেড়ে সপরিবারে করাচী চলে যান। ১১ নং বাড়ীর নীচের তলার বাশিন্দা ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন পরিচালিত লেবরেটরি স্কুলের শিক্ষক মোহাম্মদ সাদেক। প্রকাশ যে, ডক্টর কিদওয়াই এবং অধ্যাপক সাবির কারও সঙ্গেই সাদেক

সাহেবের ভাল সম্পর্ক ছিল না। পাকিস্তানী ঘাতকেরা কেন বেছে বেছে ১১ নম্বর বাড়ীতে ঢুকছিল এবং তার সঙ্গে ডক্টর কিদওয়াই বা অধ্যাপক সাবিরের কোন যোগাযোগ ছিল কিনা ভাববার বিষয়। আরও উল্লেখযোগ্য যে ১১ নং বাড়ীর সামনের বাংলোতেই থাকতেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের প্রধান ডক্টর আফতাব আহমেদ সিদ্দিকী। ডক্টর সিদ্দিকীর বাংলোর পেছনেই ১২ নং বাড়ী, সে বাড়ীতেও পাকিস্তানী পশুরা প্রবেশ করে এবং অধ্যাপক মুক্তাদিরকে হত্যা করে। এটা বেশ রহস্যজনক যে পাক সৈন্যরা ফুলার রোড কেবলমাত্র ডক্টর আফতাব আহমেদ সিদ্দিকীর সামনের ও পিছনের বাড়ীতেই আক্রমণ চালায় অন্য কোন বাড়ীতে নয়। প্রকাশ যে সে রাত্রে পাকিস্তানী আক্রমণ শুরু হলে বাঙালী অধ্যাপকরা সবাই বাতি নিভিয়ে দিয়েছিলেন কেবলমাত্র অবাঙালী শিক্ষকদের বাড়ীতেই নাকি বাতি জ্বলছিল, সম্ভবতঃ সে কারণেই কোন অবাঙালী শিক্ষকের বাড়ীতে একটি গুলীও যায়নি। ডক্টর আফতাব আহমেদ সিদ্দিকীর বাড়ীটি বস্তুতঃপক্ষে মিলিটারি ক্যাম্পে পরিণত হয়; সমস্তক্ষণই, ক্যাপ্টেন মেজরদের আনাগোনা। পাকিস্তানী সৈন্যরা যখন বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের বটগাছটি কেটে ফেলে ও মধুর রেস্তোঁরাটির ধ্বংস সাধন করে তখন নাকি তাদের গাইড ছিলেন ডক্টর আফতাব আহমেদ সিদ্দিকী।

পাকিস্তানী ঘাতকেরা পঁচিশে মার্চ শেষ রাতে ১১ নং বাড়ীর দোতলায় উঠে অধ্যাপক সাবিরের সঙ্গে দেখা করে তাঁর কাছ থেকে জানতে চায় এ দালানে জয় বাংলার লোক কোথায় থাকে। প্রকাশ যে অধ্যাপক সাবির নাকি নীচের তলায় জনাব মোহাম্মদ সাদেকের বাড়ী দেখিয়ে দেন। অধ্যাপক সাবিরের এক দুধওয়ালার জবানী থেকে নাকি জানা যায় যে পরে ঐ পরিবার থেকেই সে এই তথ্য জানতে পারে। পাকিস্তানী জল্লাদেরা সাদেক সাহেবের দরজায় আঘাত করলে তাঁর ছোট ভাই আমিনুল হক দরজা খুলে দিতে চান

কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে সাদেক সাহেব নিজেই দরজা খুলে দেন। পাকিস্তানীরা ভেতরের বারান্দায় ঢুকে পড়ে এবং সাদেক সাহেবের নাম জানতে চায়। সাদেক সাহেব তাঁর নাম বললে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় তিনি বাঙালী না বিহারী ? সাদেক সাহেব জানান যে তিনি বাঙালী। তখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয় জয় বাংলা অর্থ কি ? সাদেক সাহেব উত্তরে জানান যে তিনি তা জানেন না। ফলে পাকিস্তানী পিচাশরা তাঁর দিকে বন্দুক উদ্যত করে, হতভাগ্য সাদেক দু'হাত জোড় করে প্রাণ ভিক্ষা করেন, কিন্তু পাক সৈন্যরা তাঁর হাত লক্ষ্য করে গুলী করে; ফলে, সাদেক সাহেবের হাত দুটি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়, তার পরেই পাকিস্তানী পিচাশেরা সাদেক সাহেবের গলায় বেয়নেট চার্জ করে। বেয়নেট সাদেক সাহেবের গলায় বিদ্ধ হয়ে এ ফোঁড় ও ফোঁড় হয়ে ঘাড় দিয়ে বেরিয়ে যায়। সাদেক সাহেব বারান্দায় পড়ে যান। হানাদাররা ঘরে ঢুকতেই ছোট ভাই আমিনুল হক একটি চৌকির নীচে, শ্যালক আনোয়ার হোসেন একটি ড্রামে এবং বেগম সাদেক একটি আলমারীর মধ্যে ঢুকে আত্মগোপন করেছিলেন। সৈন্যরা তাঁর শোবার ঘরে ঢুকে বেগম সাদেককে আলমারী থেকে টেনে বের করে এবং তাঁর অলঙ্কার টাকা-পয়সা সর্বস্ব লুণ্ঠন করে নিয়ে চলে যায়: ভাই আমিনুল হক ও বেগম সাদেক তখন ছুটে গিয়ে সাদেক সাহেবকে ধরেন, সাদেক সাহেব অনেক কষ্টে বলেন, 'আমাকে একটু ওঠাও, আমি একটু কথা বলি'; ভাই তাঁর মাথাটা নিজের বুকে তুলে ধরেন কিন্তু স্পষ্ট কিছু বলতে সক্ষম হন না, অস্পষ্ট কিছু বলার চেষ্টা করে তিনি ঢলে পড়েন ভাই-র কাঁধে। একফোঁটা পানি দেওয়া হয় তাঁর মুখে, সেখান থেকে ঘরে নিয়ে একটা চৌকির ওপরে শুইয়ে দেওয়া হয়, বুলেট আর বেয়নেটের ক্ষত থেকে রক্তে ঘর ভেসে যেতে থাকে, চৌকির নীচে একটি বালতি রাখা হয়, সেই বালতি কিছুক্ষণের মধ্যেই রক্তে ভরে যায়। সাদেক সাহেবও শেষ হয়ে যান।

কিন্তু তাতেও রেহাই নেই। পাকিস্তানী ঘাতকেরা আবার ফিরে আসে, ভাই আমিনুল হক সাদেক সাহেবের চারটি শিশু সন্তান নিয়ে আবার চৌকির নীচে ঢুকে পড়েন, বেগম সাদেক স্থানুর মত স্বামীর লাশ ধরে বসে থাকেন। সৈন্যদের বুটের শব্দ আর মত্ত চিৎকারে ভয় পেয়ে শিশু সন্তানেরা চৌকির নীচে ভয়ে কেঁদে উঠে তখন তাদের সবাইকে সেখান থেকে টেনে বের করা হয়। আমিনুল হককে দেয়ালের সঙ্গে দাঁড় করান হয়, বন্দুক উঁচিয়ে পাকিস্তানী দানবেরা চিৎকার করে ওঠে রেডি? আমিনুল হক উত্তর দেন, 'আমি রেডি, গুলী কর তবে তার আগে এদের সবাইকে শেষ করে দাও নইলে এই এতিমদের দেখবে কে?' সৈন্যরা তখন বেগম সাদেক আর শিশু সন্তানদের প্রাণ ফাটা আর্তনাদে বন্দুক নামিয়ে নেয়। আমিনুল হককে আদেশ করে ট্রাকে সাদেক সাহেবের লাশ উঠিয়ে দিতে, আমিনুল হক জানান তার একার পক্ষে এ লাশ ওঠান সম্ভব নয়। তখন কি মনে করে খুনীরা প্রস্থান করে। আবার বর্বরদের আগমনের আশঙ্কায় আমিনুল হক সাহেব সাদেক পরিবারের সকলকে নিয়ে কারফিউর মধ্যেই এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

২৭শে মার্চ সকালে কিছুক্ষণের জন্যে কারফিউ উঠে গেলে আমিনুল হক ও আনোয়ার সাহেব বাসায় ফিরে আসেন এবং তাঁরা দু'জন ১১ নং বাড়ীর নিকটেই সাদেক সাহেবের কবরের ব্যবস্থা করেন। সমস্ত ফুলার রোড তখন শূন্য, সবাই পালিয়েছেন, বেগম সাদেক ও শিশু সন্তানদের এক প্রতিবেশীর সঙ্গে অন্যত্র পাঠিয়ে দিয়ে তাঁরা একটি কোদাল সংগ্রহ করে সাদেক সাহেবের কবর খনন করেন। লাশ গোসল করানোর জন্যে পানি পর্যন্ত পাওয়া যায়নি, এক বোতল পানি সংগ্রহ করে সাদেক সাহেবের লাশটি তাঁরা মুছিয়ে দেন, বুলেটবিদ্ধ ছিন্ন ভিন্ন হাত দুটি একটা ছেঁড়া কাপড় দিয়ে বেঁধে দেন। বিছানার চাদরকে কাফনের কাপড় করা হয়।

দু' একটি বাঁশ ও চাটাই সংগ্রহ করে তাঁরা যথারীতি শহীদ মোহাম্মদ সাদেককে দাফন করেন।

স্মরণীয় যে পঁচিশে মার্চের শহীদ শিক্ষক, কর্মচারী, ছাত্রদের মধ্যে একমাত্র মোহম্মদ সাদেকেরই যথারীতি দাফন সম্পন্ন হয় এবং পঁচিশের শহীদদের মধ্যে একমাত্র শহীদ মোহাম্মদ সাদেকেরই কবর হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই কবরটির যথাযথ সম্মান হওয়া উচিত। সঙ্গে সঙ্গে ঐ সাহসী যুবকদের বিশেষতঃ সাদেক ভ্রাতা আমিনুল হককেও সম্মানিত করা উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে মোহাম্মদ সাদেকের কবর ফুলার রোডের আবাসিক এলাকার মধ্যে হওয়ায় প্রতিবেশী কেউ কেউ বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। আর আমিনুল হক সাহেব ইনস্টিটিউট অব এডুকেশনে সামান্য একটি কেরানীর চাকরির সংগ্রহে ব্যর্থমনোরথ হন। শুধু তাই নয়, শহীদ সাদেকের 'ডেথ সার্টিফিকেট' বের করতে গিয়েও সাদেক পরিবারকে হিমশিম খেতে হয়েছে। এই হচ্ছে আমাদের শহীদ পরিবারের প্রতি আমাদের আচরণ। বর্তমানে শহীদ মোহাম্মদ সাদেকের ভ্রাতা তাঁর বিধবা ভাবী ও চারটি সন্তানের দেখাশোনা করছেন, সম্বল বিশ্ববিদ্যালয়ের চারশত পঁচাত্তর টাকা ভাতা এবং আবাসিক ব্যবস্থা। শহীদ পরিবার কি আমাদের কাছে থেকে আর একটু সহৃদয়তা আশা করতে পারে না ?

লেফটেন্যাণ্ট কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম

উনসত্তরের মার্চ মাসে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা প্রহসনের অন্তরালে জেনারেল ইয়াহিয়া খান তাঁর রক্তপিপাসু সেনাপতি জেনারেল টিক্কা খান, জেনারেল নিয়াজী, জেনারেল ওমর, জেনারেল মিঠ্ঠা, জেনারেল গুল হাসানের সঙ্গে বিশ্বের জঘন্যতম গণ-হত্যার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে নিচ্ছিল। ঢাকা ক্যান্টনমেণ্টে অপারেশন হেড্ কোয়ার্টার্সে অধিষ্ঠিত স্বয়ং জেনারেল মিঠ্ঠা। পঁচিশে মার্চ মধ্য রাত্রির আগেই, প্রায় দু'শ ট্রাক, উইপন ক্যারিয়ার, ট্যাঙ্ক বোঝাই সৈন্যদল ক্যান্টনমেণ্টের রাস্তায় সার বেঁধে দাঁড়াল। তার আগেই প্রেসিডেণ্ট ভবনে প্রহরারত প্রায় দু'শ বাঙালী ই. পি. আর. জোয়ানকে নিরস্ত্র করে রমনা ময়দানে নিয়ে গুলী করে হত্যা করা হয়। ঠিক মধ্য রাত্রির কিছু আগে জেনারেল ইয়াহিয়া খান স্বয়ং আদেশ দিলেন সমবেত বাহিনীকে, বাঙালীদের নাম নিশানা দুনিয়া থেকে মুছে দিতে। তিনি বলে দিলেন, তিনি এ দেশে শুধু তামামাটি চান, কোন মানুষ চান না। এই আদেশ দিয়েই জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঢাকা বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। মিঃ জুলফিকার আলী ভুট্টো ইন্টারকন্টিনেণ্টাল হোটেলের ওপর থেকে উল্লসিত হয়ে দেখলেন পাকবাহিনী তাদের ধ্বংসলীলা শুরু করেছে। কিছুক্ষণ পর সতর্ক প্রহরায় তিনিও হোটেল ত্যাগ করে বিমান বন্দরের দিকে যাত্রা

করলেন। ইন্টারকন্টিনেন্টালে সমবেত সমস্ত বিদেশী সাংবাদিককেও নিয়ে যাওয়া হল বিমান বন্দরে।

ইয়াহিয়া খানের আদেশের সঙ্গে সঙ্গেই পাকিস্তানী সৈন্য বোঝাই গাড়ী আর ট্যাঙ্কগুলো অন্ধকারের মধ্যে বাতি নিভিয়ে অগ্রসর হতে শুরু করল, একটি কলাম এগিয়ে গেল রাজারবাগ পুলিশ লাইনের দিকে, একটি শক্তিশালী কলাম নীলক্ষেত বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়, তৃতীয় কলামটি সায়েন্স লেবরেটরী রোড, পিলখানায় ই. পি. আর. ক্যাম্পের দিকে। অপর দলগুলো অগ্রসর হল বিভিন্ন বাজার এলাকা, দমকল বাহিনীর বিভিন্ন কেন্দ্র, পুরানা পল্টন আওয়ামী লীগ অফিস, 'দি পিপল', 'ইত্তেফাক' অফিসের দিকে। মধ্যরাত্রির সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল ধ্বংসলীলা।

শেখ মুজিবের ধানমণ্ডী বাসস্থান আক্রমণের জন্যে কমাণ্ডো ইউনিট আগেই ধানমণ্ডী স্কুলে অবস্থান নিয়েছিল। শাহবাগ হোটেলের রাস্তা দিয়ে পাকিস্তান বাহিনীর গাড়ীগুলো হেডলাইট নিভিয়ে ধীরে ধীরে সায়েন্স লেবরেটরী রোড দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। ঐ রাস্তার ধারেই গলিতে আগরতলা মামলা খ্যাত লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেমের বাসভবন, একটি তিনতলা বাড়ীর নীচে তিনি থাকতেন সপরিবারে। সে রাত্রে তাঁর সঙ্গে আরও দু'জন সহকর্মী ছিলেন, তাঁর 'লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটি'র সদস্য, তাঁদের মধ্যে আবার কেউ হয়তো ছিলেন আগরতলা মামলার আসামী। মধ্য রাত্রিতে যখন চারিদিকে ধ্বংস আর হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়ে গেল, লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম তখন তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে তিনতলার ওপরে উঠে এলেন, এখান থেকে তাঁরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন সায়েন্স লেবরেটরী রোড দিয়ে পাকিস্তানী গাড়ী আর ট্যাঙ্কগুলোর যাতায়াত, বিশেষতঃ সেখান থেকে তাঁরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন নীলক্ষেত বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পাকিস্তানী বাহিনীর প্রচণ্ড গোলাগুলী বর্ষণ, নীলক্ষেত বস্তী এলাকায় অগ্নিসংযোগ,

নিউমার্কেট বাজার এলাকায় হত্যালীলা। সব দেখছিলেন তাঁরা সারা রাত ধরে, কিছুই তাঁদের বুঝতে বাকি নেই, কিন্তু কিছুই করতে পারছিলেন না ; অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম আর তাঁর সঙ্গীরা।

এ যন্ত্রণা পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বাঙালী সৈনিকেরা বিগত ২৫ বৎসর যাবত সহ্য করে এসেছেন। পাকিস্তান নৌ, বিমান ও স্থল-বাহিনীর বাঙালী সৈনিকেরা পাকিস্তানীদের প্রকৃত স্বরূপ বহু পূর্বেই অনুধাবন করেছিলেন। পাকিস্তানীদের বিশেষতঃ পাঞ্জাবীদের আসল চেহারা জানতেন কেবলমাত্র বাঙালী সৈনিকেরাই। পাঞ্জাবীদের সঙ্গে একত্রে বিভিন্ন ইউনিটে দীর্ঘদিন কাজ করে, বহুদিন পশ্চিম পাকিস্তানে অতিবাহিত করে বাঙালী সৈনিকেরা বহু পূর্বেই বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন যে 'ইসলাম' আর 'মুসলমান' সব ভাওতা সত্য শুধু পাঞ্জাবী স্বার্থ। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে বাঙালীদের পরিচয় ছিল কুত্তা, হিন্দু, কাফের, মোনাফেক, গাদ্দার, বাঘি এই। আগরতলা মামলায় প্রকাশিত হয়ে পড়ে পাকিস্তান সৈন্যদলে বাঙালীদের প্রতি কি আচরণ করা হয় সেসব কাহিনী বাঙালীরা সেদিন হতবাক হয়ে গিয়েছিল শুনে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাতেই লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম তাঁর ঐতিহাসিক জবানবন্দীতে ফাঁস করে দিয়েছিলেন পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীতে বাঙালী সৈন্যদের প্রতি কি জঘন্য, কি অমানবিক আচরণ করা হয় সে ইতিহাস। আমরা সেদিন শিউরে উঠেছিলাম বাঙালী সৈন্যদের করুণ অবস্থা জেনে আর পাক-সামরিক চক্র ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমের ওপর। সেদিনই তাঁর ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু উনসত্তরের গণ-বিক্ষোভে আইউব খান আগরতলা মামলা তুলে নিতে বাধ্য হয়, ফলে তারা সুযোগ পেল না লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমের ওপর প্রতিশোধ নিতে, বরং বাধ্য হল তাঁকে মুক্তিদান করতে, ফলে পাকিস্তানী কুকুরেরা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। ২৫শে মার্চ রাত্রে

বিশেষভাবে গঠিত একটি ইউনিটকে দায়িত্ব দেওয়া হল সেই আরব্ধ কর্ম সমাপনে অর্থাৎ আগরতলা মামলায় লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমের সত্য ভাষণের যথোপযুক্ত প্রতিফল দানে।

২৬শে মার্চ অতি প্রত্যুষে কর্নেল তাজের নেতৃত্বে দুই ট্রাক সৈন্য ও একটি অফিসার বোঝাই জীপ ৭১ ও ৭২ নং সায়েন্স লেবোরেটরী রোডের সামনে এসে থামল। গাড়ীগুলো থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল পাকিস্তানী হায়েনারা, তারা বিশেষ একটি বাড়ী খুঁজতে লাগল, এমন সময় রাস্তার অপরপারে অবস্থিত বিহারী বাশিন্দা কোরেশীর তরুণ পুত্রটি এসে উপস্থিত হল তাদের কাছে, তার দুই কোমরে দুইটি রিভলবার, কোরেশী পুত্র কাছেই গলির মধ্যে হলুদ রং-এর তিনতলা বাড়ীটি দেখিয়ে দিল। সঠিক নির্দেশ পেয়েই পাকিস্তানী পশুরা ছুটে গেল ৩৬ নং এলিফ্যান্ট রোডের বাড়ীটার দিকে, দমাদম বুটের লাথি মেরে ভেঙে ফেলল দরজা, ঢুকে পড়ল বাড়ীর প্রত্যেক তালায় প্রত্যেক ঘরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই চারজন পুরুষকে তিনতলা থেকে নামিয়ে নিয়ে আসা হল, তাঁদের সার করে দাঁড় করান হল নীচে রাস্তায়। একজন পাকিস্তানী অফিসার জিজ্ঞেস করল, কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম কৌন হায় ? হ্যাম হায় মোয়াজ্জেম, কোন ভাবান্তর নেই তাঁর মধ্যে, নিজের পরিচয় গোপনের বা পালানোর কোন চেষ্টা করেন নি তিনি। তাঁর কোমরে একটা রিভলবার ছিল সেটাও তিনি ব্যবহার করেন নি।

লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমের সঙ্গে আরও যে তিনজনকে নামিয়ে আনা হয়েছিল তাঁদের সরে যেতে আদেশ দেওয়া হল, একদিকে একজন অন্য দিকে দুইজন ছিটকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত নিকট থেকে পাঁচটি গুলী করা হল লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমকে। তাঁর বুকে দু'টি এবং তলপেটে একটি মোট তিনটি বুলেট বিদ্ধ হয়েছিল। দোতলার জানালা থেকে বেগম মোয়াজ্জেম ও তাঁর সন্তানেরা এ নির্মম হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ

করেন, বেগম মোয়াজ্জেম আর্তনাদ করে সেখানেই অচৈতন্য হয়ে পড়েন। বর্বর পাকিস্তানী পশুরা লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমের মৃতদেহটির পা ধরে টেনে হিঁচড়ে ট্রাকে নিয়ে তোলে, সমস্ত গলিটা রাঙা হয়ে যায় মোয়াজ্জেমের রক্তে। ৭১ নং সায়েন্স লেবরেটরী রোডের ওপরতলা থেকে একজন গৃহভৃত্য শাহাবুদ্দিন এই দৃশ্য উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করেছিল তাকেও একটি বুলেট চিরতরে খতম করে দেয়। উল্টোদিকের গলি থেকে একটি সাধারণ দিনমজুর শ্রেণীর মানুষ আসছিল এদিকে, মাথায় গামছা বাঁধা, বগলে একটা বস্তা, সৈন্যদের দেখেই হতভাগা লোকটি পালাতে চেষ্টা করেছিল তাকে পেছন থেকে বুলেটবিদ্ধ করা হয়, লোকটি বুলেট খেয়ে প্রচণ্ডবেগে গড়াতে গড়াতে কিছু দূরে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে পড়ে। পাকিস্তানী সৈন্যরা উল্লাসে চীৎকার করে ওঠে, 'দেখ কুত্তা বাঙালী কেইসে কু'দ রাহা।' সায়েন্স লেবরেটরী রোড মসজিদের ইমাম সাহেব ফজর নামাজ আদায় করে এ পথে আসছিলেন, মাথায় টুপি, হাতে তস্‌বিহ এবং কোরান শরীফ। সৈন্যদের দেখেই তিনি একটা ঘড়ি মেরামতের দোঁকানের বেড়ারঝাঁপ খুলে সেখানে ঢুকে আশ্রয় নিলেন, কিন্তু ইসলামের এই তথাকথিত বান্দারা ইমাম সাহেবকে রেহাই দিল না। ঝাঁপ তুলে একটি বুলেটে তাঁকেও শেষ করে দিল, ইমাম সাহেব ঢলে পড়লেন রক্তের শয্যায়, তাঁর হাতের পবিত্র কোরান শরীফ আর তস্‌বিও সেই রক্তে পড়ে রইল। লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমের মৃতদেহ নিয়ে ২৬শে মার্চ ভোরবেলা পাকিস্তানী ট্রাকগুলো ক্যান্টনমেন্টের দিকে চলে গেল। বাংলার স্বাধীনতার বেদীমূলে নিবেদিত হল আর একটি মহৎপ্রাণ।

মুহম্মদ শামসুল হক

চট্টগ্রামের জালালাবাদ পাহাড়ে একদিন স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করে জীবন দিয়েছিলেন সূর্যসেন আর তাঁর বীর সহকর্মীরা, সেই চট্টগ্রামেই রক্তের অক্ষরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে গেলেন বীর বাঙালী যোদ্ধারা। যেই যোদ্ধাদের মধ্যে ছিলেন বাঙালী পুলিশ, ই· পি· আর· আর সৈনিকেরা। আরও ছিলেন বাঙালী ছাত্র, যুবক ও রাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবকেরা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার প্রথম সংগ্রামে যে বীরেরা প্রাণ দিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বহু বাঙালী পুলিশ। চট্টগ্রাম পুলিশ লাইনে, টেলিফোন এক্সচেঞ্জে, স্টেট ব্যাঙ্কে, বেতার ভবনে বিভিন্ন থানায় ফাঁড়িতে পাকিস্তান সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করে যে অগণিত পুলিশ শহীদ হয়েছেন আজ পর্যন্ত তাঁদের মাত্র ৮১ জনের নাম পাওয়া গেছে। চট্টগ্রাম পুলিশ লাইনে এই ৮১ জন অমর শহীদ পুলিশ কর্মচারীর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়েছে।

চট্টগ্রামে বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে শহীদ পুলিশ কর্মীদের প্রথম নামটি হল মুহম্মদ শামসুল হক— পুলিশ লাইনে উৎকলিত শহীদ তালিকার শীর্ষে সে নামটি শোভা পাচ্ছে। বস্তুতঃ চট্টগ্রামের সংগ্রামে শহীদ শামসুল হকের যে গৌরবময় ভূমিকা তা যুগ যুগ ধরে বাঙালীদের প্রেরণা যোগাবে। পুলিশের এস. পি. শামসুল হককে যেন এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্যেই সিলেট থেকে

চট্টগ্রামে বদলি করা হয় একাত্তরের ৪ঠা ডিসেম্বর মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশে। চট্টগ্রামে নির্বাচনের আগে গোলযোগ সৃষ্টির জন্যে ফজলুল কাদের চৌধুরী চট্টগ্রামের উপকণ্ঠে একটি সংখ্যালঘু গ্রামে গোলযোগ সৃষ্টি করে। চট্টগ্রামের তদানীন্তন এস. পি'র নিষ্ক্রিয়তার ফলে ব্যাপারটি সংঘটিত হতে পেরেছিল ফলে তাঁকে বদলি করে শামসুল হককে নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্তে চট্টগ্রামের আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বভার দেওয়া হয়। ঠিক ঐ সময়ে শেখ মুজিবর রহমান চট্টগ্রামের উপকণ্ঠে উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শনে যান, একই সময়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার এক ষড়যন্ত্র করা হয়। সে সময়ে নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের নিরাপত্তার জন্যে পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করা হত। শেখ সাহেবের উপরে ইতিপূর্বেই তাঁর বাসভবনে আরও একবার হামলা হয়েছিল, ফলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছিল। নিয়ম মতো কোন রাজনৈতিক নেতা কোথাও যাবার সময় তাঁর গাড়ীর পেছনেই পুলিশের নিরাপত্তা বিভাগ বা ডি. এস. বি'র গাড়ী থাকতো। শেখ মুজিবর রহমান চট্টগ্রামের উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শন করে ফেরার সময় তাঁর গাড়ীর পেছনে ডি. এস. বি'র যে গাড়ী থাকবার কথা ছিল ষড়যন্ত্রকারীরা সেই গাড়ীর ড্রাইভারকে উৎকোচ দিয়ে বশীভূত করেছিল। তাঁর প্রতি নির্দেশ ছিল সামনের গাড়ীটাকে ধাক্কা দেওয়া এবং সংঘর্ষ বাঁধিয়ে দুর্ঘটনার সৃষ্টি করা।

কিন্তু এস. পি. শামসুল হক ডি. এস. বি'র গাড়ীটি শেখ সাহেবের গাড়ীর পেছনে না দিয়ে অন্যত্র দিলেন। তিনি নিজের গাড়ীটি রাখলেন শেখ সাহেবের গাড়ীর পেছনে, ফলে নিশ্চিত দুর্ঘটনা থেকে শেখ সাহেবের গাড়ীটি রক্ষা পেল। ডি. এস. বি'র গাড়ীর ড্রাইভার ষড়যন্ত্রকারীদের নির্দেশ মতো সামনের গাড়ীটিকে ধাক্কা দেন এবং সে দুর্ঘটনায় একজন ছাত্রলীগ কর্মী নিহত হন। এস. পি. শামসুল হক সাহেব যদি

ডি. এস. বি'র গাড়ীটিকে শেখ সাহেবের গাড়ীর পেছন থেকে সরিয়ে না দিতেন তাহলে সেদিন কি ঘটত বলা কঠিন। কিন্তু চট্টগ্রামে এসব ঘটনায় শামসুল হক সাহেব চিহ্নিত হয়ে যান, চিহ্নিত হন পাকিস্তানী সামরিক চক্রের কাছে।

২রা মার্চ তারিখে বিহারীরা চট্টগ্রামে এক ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে, উদ্দেশ্য ছিল এমন অবস্থার সৃষ্টি করা যাতে পাকিস্তান বাহিনী তাদের পূর্ব পরিকল্পিত গণহত্যা অভিযান শুরু করে দিতে পারে। ২রা থেকে ৪ঠা মার্চ এই তিন দিনে ব্যাপক হত্যা লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগের ফলে বাঙালীদের জান-মালের প্রভূত ক্ষতি হয়। এই সময়ে এস.পি. শামসুল হক সাহেব অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে অবস্থা আয়ত্তে আনেন। ৩রা মার্চ রাত্রে মার্শাল ল' কর্তৃপক্ষ কারফিউ জারি করতে চেয়েছিল কারণ তারা জানতো বাঙালীরা ঢাকার মতো চট্টগ্রামেও কারফিউ ভঙ্গ করবে, ফলে বাঙালী নিধনের সুযোগ পাওয়া যাবে। শামসুল হক সাহেবের চেষ্টাতেই সেদিন চট্টগ্রামে কারফিউ জারী হয়নি। শুধু তাই নয় তার চেষ্টাতেই ৫ই মার্চ তারিখে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে বের করা হয়। ২রা মার্চের গোলযোগের আর ৫ই মার্চের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সংক্রান্ত ব্যাপারে শামসুল হক আবার চিহ্নিত হলেন।

২৪শে মার্চে 'সোয়াত' জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাস করাকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রাম বন্দরে প্রচণ্ড গোলযোগের সৃষ্টি হয়। কুলি শ্রমিকেরা অস্ত্র খালাসে অসম্মতি জ্ঞাপন করলে সে কাজে সেনাবাহিনী নিয়োগ করা হয়, শ্রমিক জনসাধারণ বন্দর ও শহরের সর্বত্র ব্যারিকেডের সৃষ্টি করে। বর্বর পাকিস্তান বাহিনী বন্দরে রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়, অগনিত বাঙালীর মৃতদেহের ওপর দিয়ে জাহাজ থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ খালাস করা হয়। যে অস্ত্র পুনরায় ব্যবহৃত হয়েছিল বাঙালী নিধন যজ্ঞে। শামসুল হক সাহেব ২৫শে মার্চ সকালে বন্দর এলাকা

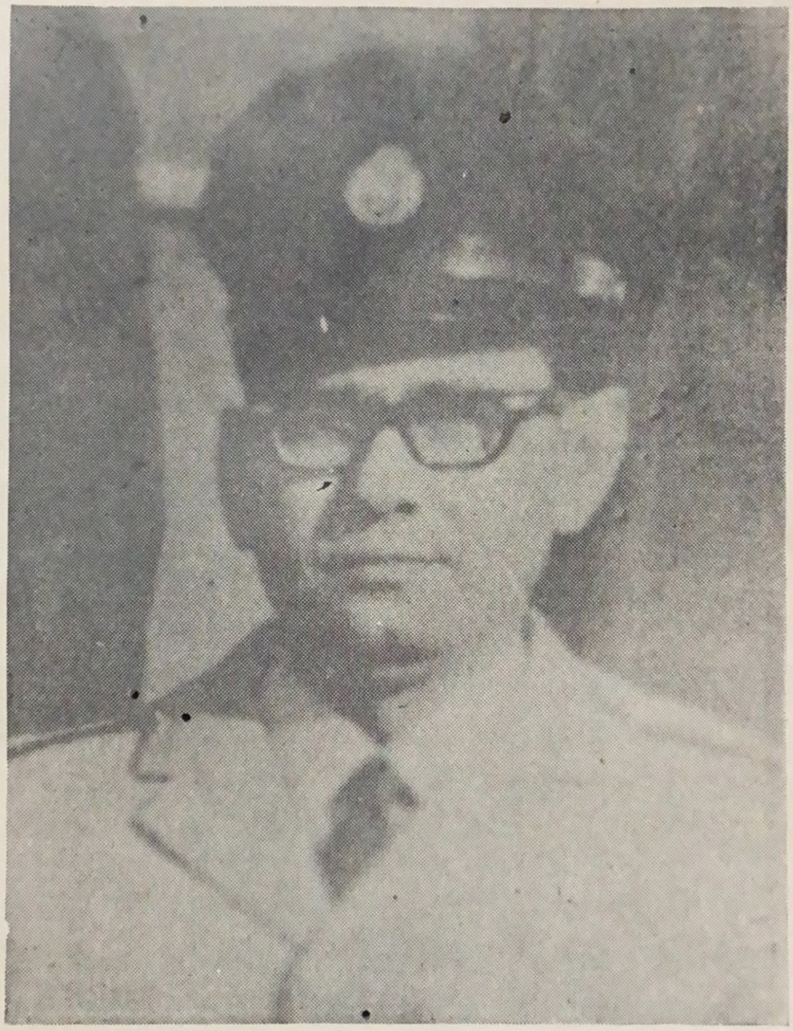

পরিদর্শন করে আসেন স্বচক্ষে দেখে আসেন পাকিস্তানীদের বর্বরতার প্রত্যক্ষ নিদর্শন আর সে রাতেই তিনি খবর পান ঢাকার রাস্তায় ট্যাঙ্ক বেরিয়েছে শুরু হয়ে গেছে বাঙালী গণহত্যা অভিযান। আরও খবর পান পাকিস্তান বাহিনী চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও করেছে শুরু করেছে বাঙালী সৈনিক হত্যালীলা, দখল করে নিয়েছে পোর্ট থানা হত্যা করেছে সেখানকার সব বাঙালী পুলিশকে।

২৬শে মার্চ থেকে শুরু হয় চট্টগ্রাম শহরে বাঙালী যোদ্ধাদের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম, তার আগেই বঙ্গবন্ধুর নামে মেজর জিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার কথা বেতার মারফত বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। ২৬ তারিখ সমস্ত দিন বেতার ও মাইক যোগে সে সংবাদ প্রচার করা হয়। বাঙালী সৈনিক ও ই. পি. আর.রা অস্ত্র-শস্ত্র সহ বেরিয়ে এসেছে ক্যান্টনম্যান্ট থেকে জড় হয়েছে বিভিন্ন গুরুত্ব-পূর্ণ অবস্থানে, গড়ে তুলেছে প্রতিরক্ষা-ব্যূহ। পুলিশ বাহিনীও পিছিয়ে পড়ল না। পুলিশ লাইন, বিভিন্ন থানা, ফাঁড়ি, বেতার কেন্দ্র, টেলিফোন একচেঞ্জ, স্টেটব্যাঙ্ক ইত্যাদি স্থানগুলোতে তারা তাদের অবস্থানগুলো শক্তিশালী করে তুলল। ২৬ তারিখ সারা রাতধরে পুলিশ লাইনে পরীখা খনন করা হল। চট্টগ্রামে পুলিশ বাহিনীর এই সংগ্রামে এস.পি. শামসুল হক এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ২৮ তারিখে পুলিশ লাইনে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়, শক্তিশালী পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে মাত্র ৫০ জন পুলিশ তাঁদের সাধারণ থ্রি, নট থ্রি রাইফেল নিয়ে বীর বিক্রমে লড়াই করেন, এখানে ৩৪ জন পুলিশ শাহাদৎ বরণ করেন। ২৯ তারিখে পুলিশ লাইনের পতন ঘটে। ডবল মুরিং থানার পতন হয়েছিল ২৭ তারিখে, আগ্রাবাদ থানারও একই দিনে পতন হয়। চট্টগ্রাম শহরে ই. পি. আর. বাহিনীর প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে ১লা এপ্রিল অবশ্য ই. বি. আর., ই. পি. আর. পুলিশ বাহিনীর সম্মিলিত প্রতিরোধ সংগ্রাম কালুরঘাট অঞ্চলে ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত চলেছিল।

২৮শে মার্চ তারিখে পাকিস্তান বাহিনী এস.পি-র বাংলো আক্রমণ করলে শামসুল হক সাহেব বাড়ীর পেছন দিয়ে বেরিয়ে যান এবং আওয়ামী লীগের একটি গাড়ী এসে তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। তার আগে শামসুল হক সাহেব এক দুঃসাহসী কাজ করেছিলেন। চট্টগ্রামে এস. পি-র বাংলো যে পাহাড়ে তার পাশের পাহাড়েই ছিল পোর্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান কমোডর মালিকের বাংলো। কমোডর মালিক তাঁর বাংলো থেকে দূরবীনের সাহায্যে শহরের বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানগুলো পর্যবেক্ষণ করে ঐসব স্থানে আক্রমণের জন্যে টেলিফোনযোগে সামরিক হেড কোয়াটার্সে খবর পাঠাচ্ছিলেন। এটা টের পেয়ে শামসুল হক সাহেব নিজে ক্রল করে গিয়ে কমোডর মালিকের টেলিফোনের লাইন কেটে দিয়ে আসেন। কমোডর স্বচক্ষে দূরবীনের সাহায্যে এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এবং এস. পি-র বাংলো আক্রমণের নির্দেশ দান করে।

২৯শে মার্চ থেকে শামসুল হক সাহেব এক আত্মীয়ের বাড়ীতে আত্মগোপন করেছিলেন তখন সমস্ত শহর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ঘেরাও করে ফেলেছে বেরিয়ে যাবার সব পথ বন্ধ, ৭ই এপ্রিল পর্যন্ত তিনি আত্মগোপন করেছিলেন কিন্তু সামরিক কর্তৃপক্ষ স্থানীয় ডি. আই. জি-র সহযোগিতায় তাঁকে খুঁজে বের এবং কাজে যোগদান করতে বাধ্য করে। ইতিমধ্যে পাকিস্তানী বর্বরেরা একদিন প্রকাশ্য রাজপথে পুলিশ হাসপাতালের একজন ডাক্তার ও তাঁর পুত্রকে গুলী করে। ডাক্তার সাহেব সঙ্গে সঙ্গে প্রাণত্যাগ করেন কিন্তু তার পুত্রটি ১৮টি বুলেটবিদ্ধ হয়েও মরেনি। শামসুল হক সাহেব তাকে তুলে নিয়ে আসেন, চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেন এবং বাঁচিয়ে তোলেন। ১৭ তারিখে ঐ ছেলেটির কৃতজ্ঞ মাতা টেলিফোন করে জানায় যে তাঁর পুত্র বেঁচে গেছে কিন্তু তার আগেই পাকিস্তানী জল্লাদেরা শামসুল হক সাহেবকে নিয়ে যায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে এবং সেদিনই

সম্ভবতঃ জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাঁকে পেছন থেকে গুলী করে কাপুরুষোচিত ভাবে হত্যা করা হয়। চট্টগ্রামে তাঁর বিশ্বস্ত সহকারী আর. আই. আকরাম হোসেন এবং কোতওয়ালীর ও. সি. আবদুল খালেককেও হত্যা করা হয়। এ-ভাবেই নিঃশেষিত হয়ে গেল একটি মহৎ প্রাণ মুহম্মদ শামসুল হক স্বাধীনতার বেদীমূলে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির কৃতী ছাত্র শামসুল হক জীবন দিয়ে চিরদিনের জন্যে অমর হয়ে গেলেন তাঁর স্মৃতি চর্চার জন্যে বেঁচে রইলেন তাঁর স্ত্রী মাহমুদা হক, দুটি সন্তান আর-সকৃতজ্ঞ দেশবাসী।

অধ্যাপক মুকতাদির

পঁচিশে মার্চে ভয়াবহ রাত্রি শেষ হয়ে আসছিল কিন্তু পাকিস্তানী বর্বরদের রক্ত পিপাসা তখনও মেটেনি, ফজরের নামাজের সময় হয়ে এল, প্রাণ ভয়ে ভীতু মানুষ চারদিক থেকে আজান দিতে শুরু করল কিন্তু এ আজান যেন নামাজের আহ্বান নয়— এ আজান যেন আল্লাহর দরবারে বিপন্ন মানুষের আকুল মিনতি 'হে আল্লাহ এই পাকিস্তানী শয়তানদের হাত থেকে তোমার বান্দাদের তুমি রক্ষা কর'। মানুষ ভেবেছিল ফজরের আজান শুনলে হয়তো পাকিস্তানীরা নরমেধযজ্ঞ বন্ধ করবে কিন্তু বৃথা আশা। পশুরা আজানরত অন্ততঃ দুইজন ইমামকে গুলী করে হত্যা করে। আজানের স্বর যতই তীব্র হচ্ছিল গুলী গোলার শব্দও ততই তীব্রতর হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সমস্ত আজানের স্বর, আল্লাহর দরবারে অসহায় মানুষের আকুল প্রার্থনাকে স্তব্ধ করে দিল পাকিস্তানী রাইফেল, মেশিনগান আর মর্টার, অপ্রতিহত চলল নরমেধযজ্ঞ।

পঁচিশে মার্চ রাত্রে ইকবাল হল, জগন্নাথ হল এলাকায় অসংখ্য ছাত্র, জনতা, শিক্ষকের রক্তে হাত রঞ্জিত করে পাকিস্তানী পশুরা ছাব্বিশে মার্চ অতি প্রত্যুষে ফজর নামাজের সময় ফুলার রোড স্টাফ কোয়ার্টার এলাকায় প্রবেশ্ করে। ফুলার রোডে ঢুকেই তারা প্রথম ১১ নং বাড়ীর অবাঙালী বাঁশিন্দা অধ্যাপক সাবিরের সঙ্গে

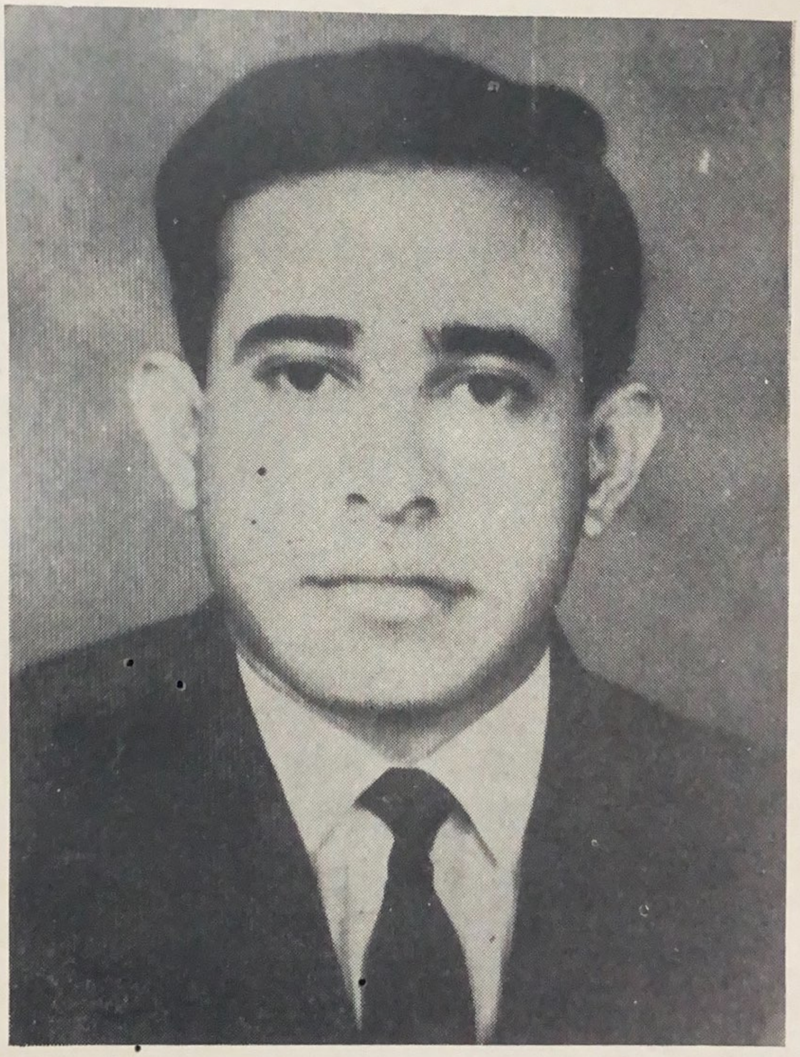

আলাপ-আলোচনা করে। ফুলার রোডে পাকিস্তানীদের প্রথম শিকার বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবোরেটরী স্কুলের শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ সাদেক। সাদেক সাহেবকে তারা প্রথমে হাতে গুলী করে এবং পরে গলায় বেয়নেটবিদ্ধ করে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। হতভাগা মোহাম্মদ সাদেককে শেষ করে তারা সামনের বাড়ীটিতে যায়। এই বাংলোটিতে অবস্থান করতেন উর্দুর অধ্যাপক ও প্রধান ডক্টর আফতাব আহমেদ সিদ্দিকী। তারা অবশ্য তাঁর বাড়ীতে প্রবেশ করেনি, জানালা দিয়ে নাকি কথোপকথন হয় পাকিস্তানী ঘাতকদের সঙ্গে আফতাব সিদ্দিকীর বাড়ীর বাশিন্দাদের। তারপর সে বাড়ীর পেছনে অবস্থিত ১২ নং বাড়ীর নীচে গিয়ে জড় হয়। ১১ নং ফুলার রোডের পরের বাড়ী ১৩ নং বা ১৪ নং ফুলার রোডে না গিয়ে আফতাব সিদ্দিকীর বাড়ীতে কথা বলে কেন তারা ১২ নং বাড়ীতে গিয়ে ঢুকল তা রহস্যজনক অথচ ১২ নং ফুলার রোডের বাড়ীটি বেশ আড়ালে অবস্থিত। উল্লেখযোগ্য যে, ফুলার রোডে ঘাতকেরা কেবলমাত্র ডক্টর আফতাব আহমেদ সিদ্দিকীর সামনের ও পেছনের বাড়ীতেই ঢুকেছিল অন্য কোন বাড়ীতে নয়।

১২ নং ফুলার রোডের বাশিন্দা ছিলেন, নীচের তলায় ভূতত্ত্বের অধ্যাপক মুকতাদির এবং কেয়ার টেকার দলিলউদ্দীন। দোতলায় সমাজ বিজ্ঞানের অধ্যাপক আলী নকি এবং অংকের অধ্যাপক শহীদুল্লাহ আর তিনতলায় ছিলেন ভূগোলের অধ্যাপক ফজলুল হক। অধ্যাপক শহীদুল্লাহ সে রাতে বাড়ী ছিলেন না তবে তাঁর ভ্রাতা আমানুল্লাহ সাহেব ছিলেন। পাকিস্তানী ঘাতকেরা ১২ নং বাড়ীর সামনে জড় হয়ে চীৎকার করে, বাড়ীর বাশিন্দাদের সকলকে নীচে নেমে আসতে আদেশ করে। তাদের আদেশে অধ্যাপক আলি নকী এবং দলিলউদ্দীনের এক আত্মীয় নীচে নেমে আসেন। অধ্যাপক ফজলুল হক, অধ্যাপক মুকতাদির বা আমানুল্লাহ নীচে নেমে আসেননি

পাক সৈন্যরা অধ্যাপক আলি নকী এবং অপরজনকে লাইন করে দাঁড় করায়।

প্রথমে তারা দলিলউদ্দীনের আত্মীয়টিকে জিজ্ঞেস করে তিনি পাঞ্জাবী কিনা এবং তাঁর পায়ের দুপাশে মাটিতে দু'টি গুলী করে এবং তাঁকে ছেড়ে দেয়। এরপর পাক জানোয়ারেরা অধ্যাপক আলি নকীকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে, আলি নকী জয় বাংলার লোক কিনা, জয় বাংলা বলে কিনা, ইত্যাদি বিষয়ে তারা আলি নকীকে প্রশ্ন করতে থাকে। আলি নকী ইতিমধ্যে প্রায় অচেতন অবস্থায় মাটিতে পড়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু তাঁকে ধরে দাঁড় করান হয় এবং তার পায়ের দুই পাশে মাটিতে দু'টি গুলী করে তাকেও ছেড়ে দেওয়া হয়। অধ্যাপক আলি নকী এবং ঐ ভদ্রলোক সে রাতে আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে যান। সম্ভবতঃ দলিলউদ্দীনের আত্মীয়টাকে পাঞ্জাবী মনে হওয়ায় এবং অধ্যাপক আলি নকী অচেতন হয়ে পড়ায় পাকিস্তানী বুলেটের হাত থেকে অব্যাহতি পান। তারপরেই পাকিস্তানী ঘাতকেরা ১২ নং ফুলার রোডের বিভিন্ন বাড়ীতে প্রবেশ করে।

১২ নং ফুলার রোডের পূর্বদিকের তিনটি ফ্ল্যাটেই তারা প্রবেশ করে কিন্তু পশ্চিম দিকের কোন ফ্ল্যাটে তারা ঢোকেনি। অধ্যাপক মুকতাদির ইতিমধ্যেই নীচের তলা ছেড়ে দোতলায় অধ্যাপক আলি নকীর ফ্ল্যাটে আশ্রয় নিয়েছেন। দোতলায় অধ্যাপক নকীর ঘরের বারান্দার একটি ডাইনিং টেবিলের ওপর আশ্রয় নিয়েছিলেন অধ্যাপক মুকতাদির সার্ট গায়ে লুঙ্গি পরা অবস্থাতেই। পাকিস্তানী ঘাতকেরা বারান্দায় প্রবেশ করেই অধ্যাপক মুকতাদিরকে গুলী করে হত্যা করে। অধ্যাপক আলি নকীর অপর এক আত্মীয়ও সে বাড়ীতে ছিলেন তাঁকেও গুলী করা হয় ভাগ্যক্রমে গুলী তাঁর হাতে লাগায় তিনি বেঁচে যান। অধ্যাপক মুকতাদিরকে হত্যা করে জল্লাদেরা বেরিয়ে যায় কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবার ফিরে আসে এবারে তারা অধ্যাপক আলি নকীর

রেডিওটি নিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর তারা আবার ফিরে আসে এবারে তারা অধ্যাপক মুকতাদিরের লাশটি টেনে টেনে নিয়ে যায় এবং ১২ নম্বরের সামনে ফেলে রাখে। ততক্ষণে সকাল হয়ে এসেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক ডাঃ মোর্তজা তাঁর বাড়ী থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখতে চেষ্টা করছেন চারিদিকে কি ঘটে গেছে। পাকিস্তানী সৈন্যদের দৃষ্টি এড়িয়ে তিনি কাছেই এক বাড়ীতে গিয়ে দুটি ছাত্রের চিকিৎসা করে আসেন, ছাত্র দুটি ইকবাল হল থেকে লাফ দিয়ে পালাতে গিয়ে পা ভেঙে ফেলেছিল। ডাঃ মোর্তজা ইকবাল হলের দিকেও গিয়েছিলেন সেখান থেকে দেয়াল টপকে ফেরার পথে তিনি সৈন্যদের নজরে পড়ে যান এবং তাঁকে ধরে ফেলা হয়, ডাঃ মোর্তজাকে ধরে নিয়ে আসা হয় এবং তাঁকে দিয়েই অধ্যাপক মুকতাদিরের লাশটি ১২ নম্বরের সামনে থেকে বৃটিশ কাউন্সিল পর্যন্ত বহন করান হয় বৃটিশ কাউন্সিলের সামনে ডিউটিরত যে সব ই.পি.আর. জওয়ানকে তারা হত্যা করেছিল তাদের লাশের সঙ্গে। অধ্যাপক মুকতাদিরের লাশটিকে ট্রাকে তুলে দেন ডাঃ মোর্তজা। এঁর লাশটি ইকবাল হলে নিয়ে যায় তারা। এবারে ডাঃ মোর্তজার পালা তাঁকে দাঁড় করান হয় গুলী করার জন্যে এ সময়ে একজন অফিসার সেখানে উপস্থিত হন এবং মোর্তজা সাহেব ডাক্তার জেনে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এ ভাবে ছাব্বিশে মার্চ তারিখে ডাঃ মোর্তজা বেঁচে গিয়েছিলেন পাকিস্তানীদের বুলেটের হাত থেকে কিন্তু ডাঃ মোর্তজা রেহাই পাননি আল-বদরের হিংস্র ছোবল থেকে, পরবর্তীকালে তিনি তাদের শিকার হন। অধ্যাপক মুকতাদিরের লাশ পরে পুরনা পল্টনে দাফন করা করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক মুকতাদির শান্ত নিরীহ, শান্তিপ্রিয় মানুষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের হৈ চৈ, কোলাহল, রাজনীতি থেকে সব সময় দূরে থেকেছেন, সভা সমিতিতেও তাঁকে বিশেষ

দেখা যেত না একবার কেবল বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের কার্যকর সংসদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য তিনি ১২ নং ফুলার রোডের বাশিন্দা হয়েছিলেন যেমন দুর্ভাগ্য মোহাম্মদ সাদেকের যিনি ১১ নং ফুলার রোডের বাশিন্দা হয়েছিলেন। আরও বড় দুর্ভাগ্য ১১ নং আর ১২ নং ফুলার রোড ডক্টর আফতাব আহমেদ সিদ্দিকীর বাংলোর সামনে আর পেছনে অবস্থিত। গুজব যে ১১ নং আর ১২ নং ফুলার রোডে হত্যা লুণ্ঠন ইত্যাদি শেষ করে ২৬শে মার্চ সকালে ক্লান্ত, শ্রান্ত পাকিস্তানী ঘাতকরা নাকি ডক্টর আফতাব আহমেদ সিদ্দিকীর বাড়ীতে কিছুক্ষণ ক্লান্তি বিনোদন করে এবং তাদের নাকি ঐ বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে চা পান রত দেখা যায়। স্মরণীয় যে পরবর্তীকালে যখন বিশ্ববিদ্যালয় কলা ভবনে পাক-বাহিনী বটগাছটি এবং মধুর রেস্তোঁরাটি ধ্বংস সাধন করছিল তখন তাদের সঙ্গে ছিলেন ডক্টর আফতাব আহমেদ সিদ্দিকী। মুক্তি যুদ্ধের নয় মাস কালতো অহরহ পাকিস্তানী ক্যাপ্টেন মেজর কর্নেলরা ঐ বাড়ীতে আসত অবসর বিনোদনের জন্য। বর্তমানে ডক্টর আফতাব আহমেদ সিদ্দিকী বাধ্যতামূলক ছুটিতে রয়েছেন। আমরা অধ্যাপক মুকতাদির, ডাঁঃ মোর্তজা, জনাব মোহাম্মদ সাদেকের স্মৃতি-চর্চা করে শহীদের প্রতি আমাদের কর্তব্য শেষ করছি।

কাজী আলী ঈমাম

স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়ে আর সে পতাকার মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে চট্টগ্রামকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। হানাদার পাকিস্তানী বর্বরদের হাত থেকে চট্টগ্রামকে মুক্ত রাখার সংগ্রামে প্রাণ দিয়েছেন অগণিত বাঙালী সৈনিক, ই.পি. আর. জওয়ান আর পুলিশ যোদ্ধা প্রাণ দিয়েছেন বহু তরুণ স্বেচ্ছাসেবক কিন্তু পাকিস্তান নৌ-বিমান আর স্থল বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণের মুখে তাদের সম্মুখ যুদ্ধ থেকে সরে যেতে হয়েছে, শুরু হয়েছে গেরিলা যুদ্ধ। এই সুযোগে পাকিস্তানী পশুরা ইতিহাসের বর্বরতম হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ আর ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করে চট্টগ্রামে। তাদের এই বীভৎস নরমেধযজ্ঞে পূর্ণ সহায়তা দান করেছিল ফজলুল কাদের চৌধুরী আর বিহারী গুণ্ডারা। ফজলুল কাদের চৌধুরী তার বাড়ীতেই একটি উৎপীড়ন কেন্দ্র স্থাপন করে। ফজলুল কাদের চৌধুরী আর বিহারী গুণ্ডারা নয় মাস ধরে চট্টগ্রামে বহু সোনার ছেলেকে ধরে নিয়ে যায়, চালায় তাদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার। সেই অত্যাচার, উৎপীড়নে যে কত সম্ভাবনাময় অমূল্য প্রাণ নিঃশেষ হয়ে গেছে কে তার হিসাব দেবে ? পাহাড়তলী অঞ্চলের রেলওয়ে কলোনীতে আর বন্দর অঞ্চলে অবাঙালীরা দিনের পর দিন বাঙালী নিধনকার্য চালাতে থাকে। রেলওয়ে এবং পোর্টের বহু বাঙালী কর্মী বহু

পদস্থ বাঙালী কর্মচারী অবাঙালীদের শিকারে পরিণত হয়। চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলেও বহু বাঙালী বৈরী মিজোদের হাতে প্রাণ দিয়েছেন। ধ্বংস আর লুণ্ঠনের ফলেও সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চট্টগ্রামের বাঙালীরা, তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করে নয় মাস ধরে পশ্চিম পাকিস্তানে চালান দেয়া হয়েছে। করাচী থেকে যে সব জাহাজ সৈন্য আর অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই হয়ে আসত সেগুলো ফিরে যেত লুণ্ঠিত ধন-সম্পদ নিয়ে। অথচ কি আশ্চর্য সেই চট্টগ্রাম শহরে না কি আজও পাকিস্তানের দালালরা 'মুসলিম বাংলার' কৃষ্টি প্রচার করে প্রকাশ্যে ?

চট্টগ্রামে যে সব বাঙালী বুদ্ধিজীবী এ সময়ে পাকিস্তানী নরঘাতকদের হাতে প্রাণ দেন তাঁদের মধ্যে একটি নাম আজ বারবার মনে পড়ছে। চট্টগ্রামের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের উদ্গাতা কাজী আলী ঈমাম, এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে পাকিস্তানীদের বর্বরতার শিকার। বীরভূমের সন্তান কাজী আলী ঈমাম সাংস্কৃতিক আন্দোলনে দীক্ষা নেন কোলকাতায় গণনাট্য সংঘ আর বহুরূপী নাট্য গোষ্ঠীতে তারপর দেশ বিভাগের সময় চলে আসেন চট্টগ্রামে। স্টেট ব্যাঙ্কে একটা সাধারণ চাকরি নিয়ে আত্মনিয়োগ করেন চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক আন্দোলন সংগঠনে, জন্ম নেয় প্রগতিশীল গণসংস্কৃতির সাধক 'প্রান্তিক' গোষ্ঠী। পঞ্চাশ দশকে চট্টগ্রামের প্রান্তিক গোষ্ঠী পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আলী ঈমামের প্রচেষ্টায় চট্টগ্রামে 'প্রান্তিক' থেকে দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় রচিত বিজন ভট্টাচার্য্যের 'জবানবন্দী' নাটকটি মঞ্চস্থ হয় ঢাকারও পূর্বে। তখন চট্টগ্রামে সহ-অভিনয়ের কোন রেওয়াজ ছিল না, ফলে স্ত্রী চরিত্রে অভিনয়ের জন্যে মেয়ে পাওয়া কঠিন ছিল। কাজী আলী ঈমামের নববিবাহিতা স্ত্রী 'জবানবন্দী'তে অভিনয় করেন স্বামীর সঙ্গে। শুধু

'জবানবন্দী' নয় পঞ্চাশ দশকে পর পর তুলসী মিত্রের 'বিভাব'ও মূলতঃ কাজী আলী ঈমামের প্রচেষ্টার ফলেই চট্টগ্রামে মঞ্চস্থ হয়েছিল। বস্তুতঃ পঞ্চাশ দশকের শুরু থেকেই চট্টগ্রামে গণনাট্য আন্দোলনের যে প্রয়াস দেখি তার মূলে ছিলেন কাজী আলী ঈমাম। শুধু গণনাট্য নয় গণসঙ্গীতেও তাঁর প্রেরণায় 'প্রান্তিক' পূর্ব বাংলায় পথিকৃৎ, এ প্রসঙ্গে কাজী আলী ঈমামের সঙ্গে শ্রী চিরঞ্জীব শর্মা ও জনাব কলিম শারাফীর নাম স্মরণীয়। ১৯৫৪ সালে ঢাকার ঐতিহাসিক সাহিত্য সম্মেলনে 'প্রান্তিক' শিল্পীগোষ্ঠী যোগদান করেছিল, গণসঙ্গীত পরিবেশন করা ছাড়াও সাহিত্য সম্মেলনে কাজী আলী ঈমামের পরিচালনায় 'বিভাব' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়, তিনি অভিনয়েও অংশ গ্রহণ করেন।

পঞ্চাশ দশকে কাজী আলী ঈমাম তাঁর গণ-সংস্কৃতি চর্চা ও তৎপরতার জন্যে তদানীন্তন মুসলিম লীগ সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়েন, 'প্রান্তিক'-এর ওপরেও সরকারের নজর পড়ে; ফলে কাজী আলী ঈমাম নতুন প্রতিষ্ঠান গড়েন 'কৃষ্টি কেন্দ্র'। এই কৃষ্টি কেন্দ্র থেকেও সাফল্যের সঙ্গে 'দুই পুরুষ,' 'প্লাবন,' 'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার' ইত্যাদি নাটক মঞ্চস্থ হয়। শুধু শহরে নাট্যাভিনয় নয়, শুধু শহরের সৌখিন মঞ্চে গণ-নাট্য পরিবেশনা নয় কাজী আলী ঈমাম গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন নাট্য আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যে। চট্টগ্রামের গ্রামাঞ্চলে তাঁর প্রচেষ্টায় অভিনীত হয়েছে বহু নাটক। শুধু ঢাকা সাহিত্য সম্মেলনে নয়, নাটক আর সাংস্কৃতিক দল নিয়ে কাজী আলী ঈমাম যোগ দিয়েছিলেন কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক সম্মেলনে, কাগমারী সম্মেলনে। পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাস কাজী আলী ঈমামের নাম চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

কাজী আলী ঈমাম কেবলমাত্র নবনাট্য আন্দোলন বা গণসঙ্গীতের বিকাশেই উৎসাহী ছিলেন না লোক-সংস্কৃতির বিকাশেও তিনি

সমান আগ্রহী ছিলেন। বস্তুতঃ পঞ্চাশ দশকের শুরুতে চট্টগ্রামে গোঁড়া ও রক্ষণশীল পরিবেশে নব-নাট্যের দল গড়া, গণ-সঙ্গীতের গোষ্ঠী গঠন করা যেমন সাহসিকতার পরিচায়ক ছিল, তেমন উদ্ভাবনাময় ছিল লোক সঙ্গীত, লোক-সংস্কৃতির সম্মেলনের আয়োজন করা। পূর্ব বাংলার ইতিহাসে এই প্রথম পঞ্চাশ দশকের গোড়ায় কাজী আলী ঈমাম রমেশ শীলকে নিয়ে চট্টগ্রামে সপ্তাহব্যাপী লোকসঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন করেন। লোক-সংস্কৃতির অকৃত্রিম রূপকে তারা পরিবেশন করার চেষ্টা করেন ঐ সম্মেলনে। চট্টগ্রামের দূরদূরান্তের গ্রামাঞ্চল থেকে লোক কবি, লোক শিল্পীদের জড় করা হয়েছিল এই সম্মেলনে সপ্তাহব্যাপী তাঁরা পরিবেশন করেন তাঁদের জারি গান, সারি গান, কবিগান, মাইজভাণ্ডারী আর মলখা বানুর গান। পূর্ব বাংলায় লোক-সংস্কৃতি চর্চার এই সূত্রপাত।

কিন্তু পূর্ব বাংলার প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের, নব-নাট্য আন্দোলনের, গণ-সংস্কৃতির এই পথিকৃতকে বেঁচে থাকতে দিল না পাকিস্তানী পশুরা। স্বাধীন বাংলাদেশকে বঞ্চিত করল কাজী আলী ঈমামের মত সাংস্কৃতিক কর্মীর সাধনা থেকে। কাজী আলী ঈমামের বাসভবন ছিল চট্টগ্রাম দামপাড়ায় পুলিশ লাইনের নিকটস্থ হাই লেভেল রোডে। এই পুলিশ লাইনেই ২৬শে মার্চ থেকে ২৯শে মার্চ পর্যন্ত প্রচণ্ড যুদ্ধ চলে, পাকিস্তানী সৈন্যরা দামপাড়া কলোনীর বিভিন্ন বাড়ীতে ঢুকে পড়ে পুলিশ লাইন ঘেরাও করে রাখে, পুলিশ লাইনে ম্যাগাজিন পাহারায় ছিলেন মাত্র ৫০ জন পুলিশ কর্মী আর তাদের সম্বল ছিল কেবলমাত্র থ্রি, নট থ্রি, রাইফেল। ২৬ তারিখ সমস্ত রাত্রি ধরে তারা পরিখা খনন করেন এবং রক্ষাব্যূহ রচনা করেন। ২৭ তারিখ থেকে সংঘর্ষ শুরু হয়, ২৮ তারিখে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। ঐ পঞ্চাশজন বীর পুলিশ বহু গুণ অধিক শক্তিসম্পন্ন সৈন্যদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্রমের সঙ্গে লড়াই করেন এবং ৩৪ জন শাহাদাত বরণ করেন।

পাকিস্তানীদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল অনেকগুণ বেশী। ২৯ তারিখে পুলিশ লাইনের পতন ঘটে, শুরু হয় সমগ্র এলাকা জুড়ে পাকিস্তানী দানবদের বিভীষিকার রাজ্য। ঐ এলাকার মানুষ খাদ্য, পানীয়ের অভাবে চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। কাজী আলী ঈমাম, তাঁর বড় ভাই, ভায়রা ও পরিবার-পরিজন নিয়ে পানির অভাবে পড়েন। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে তাদের ঘরে প্রাণ রক্ষার জন্যে এক ফোঁটা পানিও ছিল না। বাড়ীর কাছেই ছিল একটি পুকুর অথচ সেখান থেকে পানি আনার উপায় নেই। শেষ পর্যন্ত কাজী আলী ঈমাম তাঁর ভায়রাকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। পানি সংগ্রহ করতে গিয়ে কাজী আলী ঈমাম প্রাণ হারালেন পাকিস্তানী পশুদের গুলীতে। কারবালার পুনরাবৃত্তি ঘটল কাজী আলী ঈমামের হাই লেভেল রোডের বাড়ীতে। কাজী আলী ঈমাম পানি নিয়ে ঘরে ফেরেন নি ঘরে ফিরে এসেছিল তার লাশ। তাঁর বাড়ীর প্রাঙ্গণেই তাঁর কবর হল।

কবি মেহেরুন্নেসা

কবি মেহেরুন্নেসার সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯৬১ সালে, তিনি তখন বাংলা একাডেমীতে কাজ করতেন। বাংলা একাডেমীর প্রবেশপথেই ছিল 'লেখক সংঘের' অফিস। লেখক সংঘের ঐ অফিসে তখন নিয়মিত সাহিত্যসভা বসত আর ওখান থেকেই প্রকাশিত হত মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'পরিক্রম'। 'পরিক্রম' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক রূপে এবং ঐ সব সাহিত্যসভায় তখন যে সব কবি-সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার পরিচয়ের সুযোগ ঘটেছিল মেহেরুন্নেসা ছিলেন তাঁদের অন্যতম। মেহেরুন্নেসা কেবলমাত্র লেখক সংঘের সাহিত্যসভারই একজন নিয়মিত অংশ গ্রহণকারী ছিলেন না— বাংলা একাডেমীতে যে কোন অনুষ্ঠান হলেই তাঁকে ঐ সব অনুষ্ঠানে নিয়মিত অংশ গ্রহণ করতে দেখা যেত। তিনি সাধারণতঃ ঐ সব সাহিত্যসভায় স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করতেন। মেহেরুন্নেসা গীতি কবি ছিলেন এবং বাংলা গীতি কবিতার প্রবহমান ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করেই তিনি কবিতা রচনা করতেন। তাঁর কবিতা পত্র-পত্রিকা এবং বিভিন্ন সাময়িকীতে নিয়মিত প্রকাশিত হত।

যে বয়সে মেহেরুন্নেসা 'বাংলা একাডেমী' বা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কাজ করতেন আমাদের দেশে মেয়েরা সাধারণতঃ সে বয়সে চাকরিতে ঢোকেন না; কিন্তু জীবন সংগ্রামের তাগিদে

মেহেরুন্নেসাকে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী জীবনের পরিবর্তে অল্প বয়সেই বেছে নিতে হয়েছিল কঠিন সংগ্রামের পথ। মেহেরুন্নেসা এ দেশে এসেছিলেন পশ্চিম বঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে, তাঁর পিতা ছিলেন অসুস্থ, ভাইয়েরা উপার্জন অক্ষম, এ পরিস্থিতিতে সংসারের দায়িত্ব নিতে হয়েছিল মেহেরুন্নেসাকে। কিন্তু সংগ্রামের কঠিন জীবন সাহিত্য সাধনার পথ থেকে মেহেরুন্নেসাকে বিচ্যুৎ করতে পারেনি। পত্র-পত্রিকার অফিসেই হোক কিংবা ফিলিপ্‌স প্রতিষ্ঠানেই হোক যেখানেই তিনি চাকরি করে থাকুন না কেন কবিতা রচনা থেকে তিনি কোনদিন বিরত হননি বা জীবনের হতাশা তাঁর কবিতাকে কখনো আচ্ছন্ন করতে পারেনি। তাঁর কবিতায় তিনি এক আনন্দঘন জীবন-যাপন করেছেন, সে কবিতায় ভীড় করেছে বাংলার প্রকৃতি আর ঋতু বৈচিত্র্য তার সব রূপ-রস লাবণ্য নিয়ে। বস্তুতঃ ঢাকার সাহিত্যিক মহলে মেহেরুন্নেসার জন্যে একটি শ্রদ্ধার আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। মেহেরুন্নেসার কাছে সাহিত্য ছিলনা সৌখীন সময় কাটাবার উপকরণ, কবিতা ছিল মেহেরুন্নেসার জীবন ধারণ আর জীবন-যাপনের অবলম্বন; কিন্তু সে জীবনের অধিকার থেকে তাঁকে আর তাঁর পরিবারকে বঞ্চিত করল মানবতার শত্রুরা, জীবনের শত্রুরা। পৈশাচিকভাবে অগ্নিদগ্ধ করে কবি মেহেরুন্নেসাকে হত্যা করে অবাঙালীরা ২৭শে মার্চ তারিখে। কবি মেহেরুন্নেসার কি অপরাধ ছিল? তিনি তো রাজনীতি করতেন না, সাধারণ একটি চাকরি করতেন ‘ফিলিপ স’-এ। তিনিও তো তাঁর হত্যাকারীদের মতোই এ দেশে এসেছিলেন উদ্বাস্তু হয়ে, তিনিও তো বেঁচেছিলেন কঠিন সংগ্রাম করে, বাঁচিয়ে রেখেছিলেন নিজের মা, ভাইদের, অসুস্থ পিতার জীবন রক্ষার চেষ্টায় তিনি তো চেষ্টার কোন ত্রুটি করেননি; কিন্তু ধরে রাখতে পারেননি তাঁকে। তবুও তো ভেঙে পড়েননি মেহেরুন্নেসা, স্বার্থপরের মতো ঘর বেঁধে পিতৃ সংসারের দায়িত্ব

এড়াননি। তাঁর ভালবাসা ছিল সাহিত্যের সঙ্গে, সখ্য ছিল সুন্দরের সঙ্গে আর সেইটেই বোধহয় কবি মেহেরুন্নেসার সবচেয়ে বড় অপরাধ। সুন্দরের সাধক মেহেরুন্নেসার তাই জীবন্ত অগ্নিসমাধি হল যেমন হয়েছিল একই সময়ে আর একজন কবির শহীদ সাবেরের। মেহেরুন্নেসার মধ্যে ছিল এক সম্ভাবনাময় কবি প্রতিভা কিন্তু সে ফুল অকালে ঝরে গেল নিষ্ঠুর আঘাতে। সে আঘাতকারীদের কিন্তু আমরা শাস্তি বিধান করতে পারিনি, কিন্তু প্রকৃতির প্রতিশোধও কি বর্ষিত হবে না ঐ পিশাচদের ওপর ?

শহীদ সাবের

শহীদ সাবের চট্টগ্রামের ছেলে কিন্তু তার ছেলেবেলা কেটেছিল কলকাতায় আর ছেলেবেলা থেকেই সাবের বিভিন্ন কিশোর সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিল। মুকুল মেলা ও মুকুল ফৌজের মধ্যদিয়েই কিশোর সাবেরের সাহিত্যিক ও সংগঠন প্রতিভা আত্মপ্রকাশ করে। দেশ বিভাগের পরে সাবের তার বাবার সঙ্গে চট্টগ্রাম চলে আসে কিন্তু মুকুল আন্দোলনের সঙ্গে তার যোগাযোগ অক্ষুণ্ণই থাকে আর সে সূত্রেই সাবেরের সঙ্গে আমার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। আমরা এক সঙ্গে মুকুল ফৌজ করেছি, সাবের চট্টগ্রামে আমি ঢাকায়, দেখা হত বিভিন্ন শিবিরে বা সম্মেলনে। আমরা আমাদের বন্ধু সাবেরের ভক্ত ছিলাম কারণ সাবের ছোটদের কাগজে চমৎকার লিখত। সাবেরের লেখার ভাষার মতো কথা ও বক্তৃতার ভাষাও ছিল খুবই সুন্দর আর আবৃত্তির ভঙ্গি অনবদ্য। সে কারণেই সভা, সমিতিতে, সম্মেলনে, শিবিরে সাবের খুব প্রাধান্য পেত।

১৯৪৯ সালে সাবের যখন চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র তখন সে 'ছাত্র ফেডারেশান' করত, সে কালে ছাত্র ফেডারেশান ছিল বামপন্থী ছাত্রদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান। উনপঞ্চাশ-পঞ্চাশ সালে ভারতে বামপন্থী আন্দোলনে এক অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, বামপন্থীদের মধ্যে যারা চরমপন্থী তারা সশস্ত্র বিপ্লবের পথে নেমে যায়, তেলেঙ্গানার বিদ্রোহ যার ফলশ্রুতি।

বামপন্থী আন্দোলনের এই দ্বন্দ্ব-কলহের ঢেউ পূর্ব বাংলাতেও এসে পড়ে, পূর্ব বাংলার বিভিন্ন রাজনৈতিক, শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্র সংগঠনের একটা অংশ সশস্ত্র বিপ্লবের সমর্থক হয়ে পড়ে। নুরুল আমীনের মুসলীম লীগ সরকার এই সুযোগে পূর্ব বাংলার বামপন্থীদের ওপরে দমননীতির স্টীম রোলার চালিয়ে দেয়। শহীদ সাবের হয় ঐ দমননীতির অন্যতম শিকার। পঞ্চাশ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে গ্রেফতার হয়ে সাবের চার বৎসর বন্দী জীবন-যাপন করে। এ সময়ে ইচ্ছে করলেই মুচলেকা লিখে দিয়ে সাবের জেল থেকে বেরিয়ে আসতে পারত কিন্তু সে পথে সে যায়নি। চুয়ান্ন সালের নির্বাচনে মুসলীম লীগ সরকারের পতনের পরে সাবের অন্যান্য রাজবন্দীর সঙ্গে মুক্তি লাভ করে।

জেল থেকে বেরিয়ে সাবের সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। মুসলীম লীগ সরকারের পতনের পরে 'সংবাদ' পত্রিকা নুরুল আমীনের হাতছাড়া হয়ে যায়, 'সংবাদ' হয়ে ওঠে এদেশের প্রগতিশীল আন্দোলনের মুখপত্র। সাবের 'সংবাদ'-এর সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করে, এ সময়ে সাবেরের লেখা বিভিন্ন সম্পাদকীয় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। আইয়ুব খানের অভ্যুত্থানের আগে পর্যন্ত অর্থাৎ দেশে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হবার পূর্ব পর্যন্ত সাবেরের সংবাদিক জীবন অক্ষুণ্ণ ছিল। ১৯৫৮ সালের শেষ দিকে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হলে দেশ এক অন্ধকারময় যুগে প্রবেশ করে, সাবেরের মতো অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ দেশের এই পরিণতি সহ্য করতে পারেনি, ধীরে ধীরে সাবেরের মধ্যে মানসিক বৈকল্য উপস্থিত হয়। ১৯৫৯ সালের গোড়ারদিকে সাবেরের সঙ্গে আমার চট্টগ্রামে দেখা হয়, তখন তার অসংলগ্ন কথা বার্তায় এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সে তার স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলছে। সাবের আর কোনদিন পুরো স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারেনি, আর তা বোধহয় সম্ভবপরও ছিল না, যে পরিপার্শ্ব সাবেরকে সুস্থ থাকতে দেয়নি, যে

পরিবেশের সঙ্গে সাবের খাপ খাইয়ে চলতে পারেনি সে সমাজে সে পরিবেশে সাবেরের স্বাভাবিকতা ফিরে আশা বোধহয় সম্ভব ছিল না। কিন্তু সাবের কি যথার্থই অপ্রকৃতস্থ ছিল? সে কিন্তু কোনদিনই তার চিন্তা আর দৃষ্টির স্বচ্ছতা হারায়নি, তার প্রমাণ তার একটি কবিতা, অসুস্থ অবস্থায় লিখিত 'আমরা কথা বলছি' কবিতাটি,

অনেকগুলো তারার মধ্যে
একাকী উজ্জ্বল একটি তারা
শান্তির প্রচ্ছায়ে আলোর শিখার মতো
নয়া বন্ধুত্বের প্রারম্ভ।
নতুন পথের ইশারায়
উত্তীর্ণ হলো কাব্য গাথা
আমাদের মনে এলো অনেক কথা
আমরা কথা বলছি।

অনেক কথা বলার ছিল সাবেরের। সুন্দর কথা বলতে পারত সাবের। সে কথা গদ্যে, কাব্যে সুন্দর করে সাজিয়ে প্রকাশ করতে পারত। কিন্তু ছেদ পড়ল কারণ সুন্দর সমাজ গড়তে চেয়েছিল সাবের, সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছিল সাবের কিন্তু প্রতিকুল পরিবেশ বার বার ভেঙে দিয়েছে সে স্বপ্ন তাই সাবের সুস্থ থাকতে পারেনি।

কিন্তু 'সংবাদ' অফিসের কথা সাবের ভোলেনি, তাই 'সংবাদ' অফিসেই আশ্রয় নিয়েছিল ২৫শে মার্চ রাত্রে গণহত্যা যজ্ঞ শুরু হবার পর কারণ পথে আর তখন আশ্রয় ছিল না আর ৩১শে মার্চ সকালে 'সম্বাদ' অফিসেই সাবের হারিয়ে গেল, আলোর পিয়াসী সাবের অগ্নিশিখা হয়ে মিলিয়ে গেল।

সাবের আর কোনদিন আমাদের কাউকে বিরক্ত করবে না, প্রেস ক্লাবে কিংবা সংবাদপত্রের অফিসে সাবেরের অবাঞ্ছিত উপস্থিতি আর তার বন্ধুদের বিরক্তি উৎপাদন করবে না। সাবেরকে আর দয়া করে

কাউকে একটা সিগারেট বা এককাপ চায়ের করুণা ভিক্ষা দিতে হবে না। সাবের সবাইকে রেহাই দিয়ে গিয়েছে, আত্মীয় পরিজন, বন্ধু-বান্ধব সকলকে আর নিজেও রেহাই পেয়েছে এই নিষ্ঠুর পৃথিবী থেকে।

হানাদার কবলিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

পঁচিশে মার্চ মধ্য রাত্রে সশস্ত্র পাকিস্তান বাহিনী বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে একযোগে সামরিক ও পুলিশ অবস্থান সমূহে হানা দিয়ে সমস্ত বাঙালী সৈনিক, ই.পি.আর. ও পুলিশদের হত্যা করতে চেয়েছিল, যাতে বাঙালীরা গণহত্যার মুখে কোন প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারে। ফলে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোর, রংপুর, সিলেট খুলনা, রাজশাহী প্রভৃতি শহরে পঁচিশে মার্চ রাত্রেই পাক-বাহিনীর সঙ্গে বাঙালী যোদ্ধাদের সংঘর্ষ বেধে যায়। এ ছাড়া পাক-বাহিনী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেও হানা দিয়েছিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাক বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ সর্বজন বিদিত। তুলনামূলকভাবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভীষিকাময় দিনগুলোর কাহিনীর প্রচার হয়েছে কম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পাক-বাহিনী হত্যাযজ্ঞ চালায় পঁচিশে মার্চ রাত্রি থেকে সাতাইশে মার্চ পর্যন্ত, তার পরেও অবশ্য তারা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আরও বহুদিন অবস্থান করেছিল কিন্তু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় তারা স্থায়ী আসন গেড়ে বসেনি। বর্বর পাক-বাহিনী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে ক্যানটনমেন্টএ পরিণত করেছিল আর নয় মাস ধরে সেখানে চলেছিল চরম বিভীষিকার রাজত্ব।

পঁচিশে মার্চ রাত্রিতেই পাক বাহিনী একযোগে শহরে, পুলিশ

লাইনে এবং মতিহারে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে হানা দেয় এবং তাদের হত্যাযজ্ঞ শুরু করে কিন্তু মুক্তি বাহিনীর বীর যোদ্ধারা বীর বিক্রমে লড়াই করে রাজশাহী শহরকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়, পাক-বাহিনী শহর ছেড়ে চলে যায়। রাজশাহী শহর ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত মুক্ত ছিল কিন্তু ইতিমধ্যে ঢাকা থেকে বিরাট পাকিস্তানী বাহিনী ঢাকা-আরিচা রোড ধরে অগ্রসর হতে থাকে, এই বাহিনী যমুনা অতিক্রম করে পাবনা জেলার নগরবাড়ী অবতরণের চেষ্টা করলে তাদের বাধা দেওয়া হয় কিন্তু বিমান বাহিনীর সহায়তাপুষ্ট অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত পাক-বাহিনীর মোকাবেলায় মুক্তি বাহিনী অসমর্থ হয় ফলে নগরবাড়ী থেকে একটি পাকিস্তান বাহিনী তাদের ধ্বংস ও হত্যাযজ্ঞ চালাতে চালাতে পাবনা, ঈশ্বরদি, পাকশী, নাটোরের পথ ধরে রাজশাহীর দিকে অগ্রসর হতে থাকে, আর একটি পাকিস্তান বাহিনী সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুরের দিকে এগিয়ে যায়। এইসব পাকিস্তান বাহিনী সমগ্র উত্তর বঙ্গ জুড়ে লক্ষ লক্ষ নিরীহ নর-নারী শিশুকে হত্যা করে, হাজার হাজার জনপদ ও শস্যক্ষেত্র জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে লুণ্ঠন আর নারী নির্যাতনের অবাধ বন্যা।

একটি পাকিস্তানী ব্রিগেড কর্নেল তাজের নেতৃত্বে ১৩ই এপ্রিল রাজশাহীতে প্রবেশ করেই মতিহারে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ক্যানটনমেন্ট গড়ে তোলে, ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। পাক-বাহিনী ক্যাম্পাসের আশে পাশের সমস্ত গ্রাম পুড়িয়ে দিলেও এবং অধ্যাপক হাবিবুর রহমান, অধ্যাপক সুখরঞ্জন সমাদ্দার ও অধ্যাপফ মীর আবদুল কাইয়ুম সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের হত্যা করলেও ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন প্রমুখ বাঙালী এবং ডক্টর মতিয়ুর রহমান প্রমুখ অবাঙালী শিক্ষকদের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেছিল। ডক্টর সাজ্জাদ হোসায়েনকে

কয়েকদিন পরে পাকিস্তান বাহিনী তাদের গাড়ীতে করে নিরাপদে ঢাকা নিয়ে আসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বানানোর জন্যে। আর ডক্টর মতিয়ুর রহমান প্রমুখ অবাঙালী শিক্ষকেরাতো নয় মাস ধরে মতিহারে পাক-বাহিনীর 'ফ্রেণ্ড-ফিলসফার-গাইড' ছিল তাদের হত্যা লুণ্ঠন আর নির্যাতনের কাজে।

বর্বরেরা রাজশাহী ক্যাম্পাসে উনসত্তরের গণ-আন্দোলনের মহান শহীদ শামসুজ্জোহার স্মৃতি বিজড়িত শহীদ শামসুজ্জোহার হলটিকেই মনোনীত করেছিল তাদের কেন্দ্র হিসেবে। জোহা হলে স্থাপিত হয়েছিল তথাকথিত 'ইন্টারোগেশান সেণ্টার' বা 'টর্চার চেম্বার' আর জোহা হলের পাশের বিরাট মাঠ আর জলাভূমিটি পরিণত হয়েছিল বধ্যভূমিতে, বাঙালীদের ধরে নিয়ে গিয়ে জোহা হলে আটক করা হত তারপর বিভিন্ন স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্যে তাদের ওপর চলত অমানুষিক অত্যাচার তারপর রাতের অন্ধকারে তাদের বের করে নিয়ে যাওয়া হত জোহা হল সংলগ্ন বধ্যভূমিতে সেখানে নিয়ে তাদের বিভিন্ন উপায়ে হত্যা করা হত। কখনো গুলী করে কখনো বা পশুর মতো জবাই করে। ঐ বধ্যভূমিতে গ্রামবাসীদের ধরে নিয়ে এসে শত শত গণ কবর খোঁড়ানো হত আর রাতের অন্ধকারে হতভাগ্য বাঙালীদের হত্যা করে বিশ ত্রিশ জন করে এক একটা গর্তে মাটি চাপা দেওয়া হত। নয় মাস ধরে চলেছে এই হত্যা যজ্ঞ আর হাজার হাজার বাঙালী ছাত্র, শিক্ষক, পুলিশ, সৈনিক, চাকুরিজীবী, নিরীহ নারী, শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে, চাপা দেওয়া হয়েছে ঐসব গণ কবরে জোহা হল সংলগ্ন বধ্যভূমিতে। এই পৈশাচিক বর্বরতা একাত্তরের তেরই এপ্রিল থেকে সতেরোই ডিসেম্বর পর্যন্ত অবাধে চলতে থাকে কর্নেল তাজ, মেজর ইকবাল, মেজর শেরওয়ান, মেজর ইমতিয়াজ, ক্যাপ্টেন ইলিয়াসের নেতৃত্বে আর বাঙালী-অবাঙালী দালালদের সহযোগিতায়।

অধ্যাপক হাবিবুর রহমান

উনসত্তরে আমাদের স্বাধীকার আন্দোলনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় উৎসর্গ করেছিল ডক্টর শামসুজ্জোহাকে। সে রক্তরাঙা পথ বেয়ে নিবেদিত হল আরও তিনটি মূল্যবান প্রাণ একাত্তরের স্বাধীনতার সংগ্রামে। তাঁরা হলেন, অংকের প্রধান অধ্যাপক হাবিবুর রহমান, সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রী সুখরঞ্জন সমাদ্দার এবং মনস্তত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক কাইয়ুম। রাজশাহীতে পাকিস্তানী বর্বরেরা মার্চ মাসের শুরু থেকেই ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিল, শপুরাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের ক্যাম্প বসিয়েছিল আর শহরে যত্র-তত্র হানা দিচ্ছিল। ৩রা মার্চ টেলিফোন অফিসের সামনে এবং ৪ঠা মার্চ তারিখে বাজার অঞ্চলে পাকিস্তানীরা অকারণে বহু বাঙালীকে হত্যা করে। পঁচিশে মার্চ মধ্য রাত্রে পাকিস্তানী সৈন্য রাজশাহী পুলিশ লাইন এবং পদস্থ বাঙালীদের বাসভবনগুলো ঘিরে ফেলে। ২৬শে মার্চ সন্ধ্যা ৭টায় পাকিস্তানী পশুরা রাজশাহী রেঞ্জের ডি. আই. জি. মামুন মাহমুদকে নিয়ে যায়। তিনি আর ফিরে আসেননি। রাজশাহীর এস. পি. মজিদ সাহেবও পাকিস্তানী হায়নাদের শিকার হন। কিন্তু এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে মুক্তি-বাহিনীর আক্রমণে পাকিস্তান বাহিনী রাজশাহী শহর থেকে সাময়িকভাবে পশ্চাদপসারণ করতে বাধ্য হয়।

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে মুক্ত রাজশাহীর মতিহার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মুক্তিবাহিনীর স্বেচ্ছাসেবকেরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন জন অবাঙালী শিক্ষক মনস্তত্ত্ব বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মতিয়ুর রহমান, উর্দুর প্রধান ডক্টর মোঃ কলিম এবং ভূগোলের প্রধান অধ্যাপক প্যাটেলকে গ্রেফতার করতে আসে কিন্তু তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন প্রভাবশালী বাঙালী শিক্ষক অধ্যাপক হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে তাঁদের রক্ষা করেন। সে সময় পঁচিশে মার্চ রাতে ঢাকায় বাঙালী অধ্যাপক হত্যার খবর রাজশাহীতে পৌঁছে গিয়েছিল এবং মুক্তিবাহিনীর তরুণ যোদ্ধারা ঐ তিনজন অবাঙালী শিক্ষককে ধরে নিয়ে তার প্রতিশোধ নিতে পারতেন কিন্তু ডক্টর হাবিবুর রহমান, ডক্টর ফজলুল হালিম চৌধুরী প্রমুখ অধ্যাপকদের চেষ্টায় ঐ সময় তাঁদের প্রাণ রক্ষা হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালী অধ্যাপকদের এই উপকারের প্রতিদান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ অবাঙালী অধ্যাপকেরা যেভাবে দিয়েছিলেন তার নজীর ছুনিয়ার ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে শক্তিশালী পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঢাকা থেকে পাবনা হয়ে রাজশাহীতে পুনঃপ্রবেশ করে, রাজশাহী দখল করে পাকিস্তান সেনাবাহিনী রাজশাহী মতিহারে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তাদের সদর দফতর স্থাপন করে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন তখন ক্যাম্পাসে তার বাসভবনেই অবস্থান করছেন। ডক্টর হোসায়েন ছাড়া অধিকাংশ বাঙালী শিক্ষকই ইতিমধ্যে ক্যাম্পাস ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন, ক্যাম্পাসে রয়েছেন শুধু ডক্টর সাজ্জাদ হোসায়েন আর অবাঙালী শিক্ষকেরা। কিন্তু দু'জন বাঙালী শিক্ষক ক্যাম্পাস ছেড়ে যাননি। অংকের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর হাবিবুর রহমান এবং সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রী সুখরঞ্জন সমাদ্দার।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী ১৬ই এপ্রিল থেকে ক্যাম্পাসে তাদের সদর দফতর স্থাপন করা সত্ত্বেও ডক্টর রহমান বা শ্রী সমাদ্দার ক্যাম্পাস ছেড়ে না গিয়ে যে ভীষণ সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। ডক্টর সাজ্জাদ হোসায়েনের অবশ্য ক্যাম্পাস ছেড়ে যাবার কোন প্রয়োজন ছিলনা কারণ তিনি পাক সামরিক চক্রের বিশ্বাসভাজন ছিলেন। কিন্তু স্পষ্ট বক্তা প্রখর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এবং বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী অধ্যাপক ডক্টর হাবিবুর রহমান বা সংস্কৃত ভাষার হিন্দু ধর্মাবলম্বী অধ্যাপক শ্রী সুখরঞ্জন সমাদ্দার ক্যাম্পাসে থেকে গিয়ে নিশ্চিত বিপদের ঝুঁকি নিয়েছিলেন। যখন তাঁদের সহকর্মীরা ক্যাম্পাস ছেড়ে যাচ্ছিলেন এবং তাদেরও অনুরোধ করে ছিলেন, অন্যত্র চলে যেতে, তখন অধ্যাপক রহমান উত্তর দিয়েছিলেন, 'জেনারেল কখনও রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করে না, আমি আপনাদের ঘড়বাড়ী সম্পত্তির প্রহরী রইলাম'। আর শ্রী সমাদ্দার ভেবে ছিলেন তার মতো নিরীহ রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কশূন্য মানুষের আবার ভয় কি?

অধ্যাপক হাবিবুর রহমান ছিলেন অসম সাহসী পুরুষ, এম. এন, রয়ের প্রগতিশীল মানবিক রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী। এই মানুষটি জীবনে কখনও কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে ভয় পাননি। এবারেও তার ব্যতিক্রম হল না, তিনি যে তাঁর সহকর্মীদের বলে দিয়েছিলেন তিনি তাদের সম্পত্তির প্রহরায় রত থাকবেন সে কথা তিনি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করলেন। পাকিস্তানীরা ক্যাম্পাসে আসন গেড়ে বসেই লুণ্ঠনে মনোনিবেশ করল। তারা যখন ডক্টর রহমানের প্রতিবেশীর বাড়ী লুট করছিল তখন তিনি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। বেরিয়ে গিয়ে তার প্রতিবাদ করলেন, সামরিক ইউনিফর্ম পরিহিত কোন বাহিনীর পক্ষে লুণ্ঠন যে কত বড় কলঙ্ক, সে কথা তাদের জানিয়ে দিলেন। এর মাশুলও তাঁকে দিতে হল। অধ্যাপক হাবিবুর রহমান সাহেবকে

নিয়ে যাওয়া হল সামরিক দফতর জুবেরী হাউসে। জুবেরী হাউস রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথিশালা। সেখান থেকে অধ্যাপক রহমানের বাসভবন দেখা যায়। যেদিন অধ্যাপক হাবিবুর রহমানকে জুবেরী হাউসে নিয়ে যাওয়া হয় সেদিন বিকেলেও তাঁর পরিবারের সবাই বাড়ী থেকে দেখেছেন অধ্যাপক রহমান জুবেরী হাউস থেকে করুণ কাতর নেত্রে বাড়ীর দিকে চেয়ে আছেন, মনে হচ্ছিল তিনি বাড়ী ফিরে আসতে চাইছেন কিন্তু তাঁকে আসতে দেয়া হচ্ছে না। তারপর আর কোনদিন অধ্যাপক হাবিবুর রহমানকে ফিরে আসতে দেয়া হয়নি। এমনি করেই পাকিস্তানী বর্বরতার সামনে দাঁড়িয়ে তার নিন্দা করতে গিয়ে এই দুঃসাহসী মানুষটি চিরদিনের জন্যে হারিয়ে গেলেন।

অধ্যাপক হাবিবুর রহমানকে কি করা হয়েছিল তা রহস্যজনক, অনেকের ধারণা তাঁকে জনৈক অবাঙালী অধ্যাপকের প্রত্যক্ষ প্ররোচনাতেই ধরে নিয়ে যাওয়া হয়, আবার কেউ এমন কথাও বলেন যে, তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু ঐ অধ্যাপকটিই তাঁকে পুনরায় ধরিয়ে দেয়। ঐ অবাঙালী শিক্ষকের সঙ্গে অধ্যাপক রহমানের ভাল সম্পর্ক ছিল না, যদিও তিনি একবার তাঁর প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। উক্ত অধ্যাপক তার প্রাণ রক্ষাকারীর উপকারের প্রতিদান দিলেন এভাবেই। অধ্যাপক হাবিবুর রহমানকে যখন ধরে নিয়ে যাওয়া হয় তখন ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন কি করেছিলেন তা জানা যায় না, উপাচার্য হিসাবে তাঁর কি দায়িত্ব ছিল না অধ্যাপক রহমানকে রক্ষা করার চেষ্টা করা ? তা করলে অবশ্য হয়তো তিনি তাঁদের বিশ্বাসভাজন থাকতে সমর্থ হতেন না।

উক্ত অবাঙালী অধ্যাপক ডক্টর মতিয়ুর রহমান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগের তদানীন্তন প্রধান, মনুষ্যরূপী পশু। স্বাধীনতা সংগ্রামের নয় মাসকাল রাজশাহী ক্যাম্পাসে তার পরামর্শেই

পরিচালিত হয়েছে হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ আর ধ্বংসলীলা, তিনি নিজে থেকেছেন পাকিস্তানী জানোয়ারদের সঙ্গে ঐসব মানবতা বিরোধী কর্মে। নিজের সুন্দরী স্ত্রীকে তিনি উপঢৌকন দিয়েছিলেন পাকিস্তান বাহিনীর কর্নেল তাজকে, বিনিময়ে প্রতি রাত্রে পাকিস্তান বাহিনী তাকে উপহার দিত একটি করে বাঙালী মেয়ে এবং ঐ পশু তাদের চরম সর্বনাশ করত। ডক্টর মতিয়ুর রহমানের বাড়ী থেকে প্রতিদিন ভোরে দেখা যেত ধর্ষিতা হতভাগিনীদের বেরিয়ে যেতে। ডক্টর মতিয়ুর রহমান তাঁর বাড়ীর কাছেই একটি 'টরচার চেম্বার' বা উৎপীড়ন কেন্দ্রও স্থাপন করেছিলেন। সে জন্যে তিনি তার প্রতিবেশী ডক্টর গোলাম সাকলায়েনের বাড়ীটি নির্বাচন করেন। ডক্টর গোলাম সাকলায়েনকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ডক্টর হাবিবুর রহমানের বাড়ীতে। ঐ উৎপীড়ন কেন্দ্রে ডক্টর মতিয়ুর রহমানের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে হতভাগ্য বাঙালীদের ওপর চলে দিনের পর দিন অকথ্য অত্যাচার। কত বাঙালী যে ঐ উৎপীড়নের শিকার হয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই, পুরস্কারস্বরূপ পাকিস্তানী লুটেরারা ডক্টর মতিয়ুর রহমানকে দিয়েছিল প্রচুর উপঢৌকন। এই জানোয়ার যখন স্বাধীনতার ঠিক আগের মুহূর্তে পশ্চিম পাকিস্তানে পালিয়ে যায় তখন সঙ্গে নিয়ে যায় কয়েক লক্ষ টাকা, চারটি গাড়ী, চৌদ্দটি রেফ্রিজারেটার এবং আরও অনেক লুণ্ঠিত দ্রব্য আর মতিয়ুর রহমানের মতো পশুদের প্রাণ রক্ষা করার পুরস্কারস্বরূপ অধ্যাপক হাবিবুর রহমানকে দিতে হল নিজের অমূল্য প্রাণটি।

অধ্যাপক সুখরঞ্জন সমাদ্দার

একাত্তর সালের মার্চ মাসের ছাব্বিশ তারিখে, পাকিস্তান বাহিনী মতিহারে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে। তারা প্রথমেই বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর মযহারুল ইসলামের বাসভবনটি ঘেরাও করে ফেলে, সৌভাগ্যক্রমে ডক্টর ইসলাম তখন ঢাকায় ছিলেন। পাকিস্তানী বর্বরেরা জনৈক মেজরের নেতৃত্বে ডক্টর ইসলামের সন্ধানে তাঁর বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লে বেগম ইসলাম ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাথরুমে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু পাকিস্তানী সৈন্যরা বাথরুমের দরজা ভেঙে ফেলার উপক্রম করলে তিনি সন্তানদের নিয়ে বেরিয়ে আসেন ফলে পাক সৈন্যরা নিশ্চিন্ত হয় যে, ডক্টর মযহারুল ইসলাম বাড়ীতে নেই। তারপর পাকিস্তানীরা অংকের প্রধান, অধ্যাপক হাবিবুর রহমানের বাড়ীতে হানা দেয় কারণ তখন পর্যন্ত ক্যাম্পাসে একমাত্র তাঁর বাড়ীতেই কালো পতাকা উড়ছিল। অধ্যাপক রহমানকে কালো পতাকা নামিয়ে ফেলতে আদেশ দিলে, অধ্যাপক রহমান দৃপ্ত কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন, এ পতাকা আমি নামিয়ে ফেলার জন্যে উঠাইনি আমি এ পতাকা নামাতেও পারব না, আপনাদের দরকার হলে আপনারা নামাতে পারেন। পাক বর্বরেরা তখন অধ্যাপক হাবিবুর রহমানের বাড়ীর কালো পতাকাটি নামিয়ে ফেলে। বস্তুতঃ অধ্যাপক হাবিবুর রহমান সেদিনই চিহ্নিত হয়ে যান। তা'ছাড়া ক্যাম্পাসেই

পাক বাহিনীর বিশ্বস্ত অনুচরেরা ছিল যেমন, মনস্তত্ত্বের প্রধান ডক্টর সৈয়দ মতিয়ুর রহমান। এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে পাকিস্তানীরা মতিহার ক্যাম্পাসে তাদের ঘাঁটি গেড়ে বসলে তারাই চিনিয়ে দিয়েছিল অধ্যাপক হাবিবুর রহমান আর সংস্কৃতের অধ্যাপক সুখরঞ্জন সমাদ্দারকে। অধ্যাপক সুখরঞ্জন সমাদ্দার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর একটি উৎসর্গ স্বাধীনতার বেদিমূলে।

অধ্যাপক সুখরঞ্জন সমাদ্দার কিন্তু অধ্যাপক হাবিবুর রহমানের মত সাহসী ছিলেন না, অধ্যাপক হাবিবুর রহমানের মত তিনি পাক বর্বরদের লুটতরাজ ও ধ্বংসলীলার প্রতিবাদ করতে যাননি। তিনি ছিলেন অধ্যাপক হাবিবুর রহমানের বিপরীত প্রকৃতির মানুষ। অধ্যাপক হাবিবুর রহমান দীর্ঘদেহী, অধ্যাপক সমাদ্দার খর্বাকৃতি, অধ্যাপক রহমান স্বাস্থ্যবান, অধ্যাপক সমাদ্দার জীর্ণ, অধ্যাপক রহমান গৌরবর্ণ, অধ্যাপক সমাদ্দার কৃষ্ণকায়। অধ্যাপক রহমানের নেশা অর্থনীতি আর রাজনীতির দর্শনে, অধ্যাপক সমাদ্দারে নেশা ভাগ্য গণনায় হস্ত দর্শনে। এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে যখন পাক বাহিনী ক্যাম্পাসে প্রবেশ করল তখন ঐ দু'জন অধ্যাপকই মাত্র ক্যাম্পাসে থেকে গেলেন, আর সবাই চলে গেলেন অথচ ওঁরা গেলেন না। অবশ্য ক্যাম্পাসে আরো কয়েকজন ছিলেন, ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, ডক্টর মতিয়ুর রহমান, ডক্টর কলিম, অধ্যাপক প্যাটেল। প্রকাশ যে, পাকিস্তানী পশুরা যখন ক্যাম্পাসে 'হিন্দু' খুঁজছিল তখন ডক্টর মতিয়ুর রহমান নাকি অধ্যাপক সমাদ্দারের বাড়ী দেখিয়েছিলেন আরও শোনা যায় যে, অধ্যাপক সুখরঞ্জন সমাদ্দারকে যে গাড়ীতে করে পাকিস্তানী ঘাতকেরা নিয়ে যায় সে গাড়ীতে নাকি ডক্‌টর মতিয়ুর রহমান উপবিষ্ট ছিলেন।

অধ্যাপক হাবিবুর রহমান এবং অধ্যাপক সমাদ্দারকে প্রায় একই সময়ে পাক সৈন্যরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল। অধ্যাপক হাবিবুর রহমানকে

প্রথমে জুবেরী হাউসে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তারপরে আর তাঁর কোন খবর পাওয়া যায়নি। ভাইস-চ্যান্সেলার ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন অধ্যাপক হাবিবুর রহমানের পরিবারকে চৌদ্দ দিনের মাইনে দিয়ে ক্যাম্পাস থেকে বিদায় দিয়েছিলেন কারণ অধ্যাপক রহমান চৌদ্দ দিন কাজ করার পর পাক-বাহিনী কবলিত হন। অধ্যাপক সুখরঞ্জন সমাদ্দারকে উঠিয়ে নিয়ে পাকিস্তানী জল্লাদেরা কাজলার কাছে নিয়ে যায় এবং সেখানে রাস্তার ধারে তাঁকে গুলী করে নির্মমভাবে হত্যা করে এবং পথের ধারে ফেলে রেখে যায়। স্থানীয় গ্রামবাসীরা অধ্যাপক সমাদ্দারের কোন পরিচয় না জেনেও তাঁর মৃতদেহটি সমাহিত করে রাখে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে অধ্যাপক সমাদ্দারের লাশ কাজলার ঐ কবর থেকে তুলে এনে যথারীতি সনাক্তের পর যথাবিহিত সৎকার করা হয়েছিল।

অধ্যাপক সুখরঞ্জন সমাদ্দারকে এপ্রিলের ষোল-সতের তারিখের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। প্রথমে অধ্যাপক সমাদ্দারেরও কোন খোঁজ-খবর পাওয়া যায়নি পরে মিঃ শরীফ আহম্মদ নামক জনৈক আইনজীবী শ্রীমতী সমাদ্দারকে তাঁর স্বামীর স্মৃতি চিহ্ন চশমা এবং জুতো ফিরিয়ে দিয়ে যান। পাকিস্তানী পশুরা শ্রী সমাদ্দারকে নিয়ে যাবার পর যখন শ্রীমতী সমাদ্দারের দিকেও নজর দিতে শুরু করে তখন মিঃ শরীফ আহাম্মদ তাঁকে নিজের বাড়ীতে একটি ঘর ছেড়ে দেন। বস্তুতঃ শরীফ সাহেব তাঁকে আশ্রয় দেন ঐ সময়ে। অধ্যাপক সুখরঞ্জন সমাদ্দার অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, কোন রকম রাজনীতি বা কোলাহলের মধ্যে তিনি কখনও থাকতেন না। মার্চের গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে তাঁর বন্ধুরা যখন তাঁকে বার বার ক্যাম্পাস ছেড়ে যাবার কথা বলেছেন তখন তিনি উত্তর করেছেন, 'আমি একজন সাধারণ গোবেচারা মানুষ আমাকে কে কি করবে?' অধ্যাপক সমাদ্দারের নেশা ছিল হাত দেখা, ভাগ্য গণনা কিন্তু তিনি

কি কখনও নিজের হাত দেখেননি, নিজের ভাগ্য গণনা করেননি? বুঝতে পারেননি কি অপেক্ষা করছে তাঁর ভাগ্যে অতি নিকট ভবিষ্যতে? পাকিস্তানীদের তিনি চিনতে ভুল করেছিলেন যেমন ভুল করেছিলেন ডক্টর মতিয়ুর রহমানকে চিনতে। তাই জীবন দিয়ে সে ভুলের মাশুল দিতে হল তাঁকে। ভুলের মাশুল অধ্যাপক হাবিবুর রহমানকেও দিতে হয়েছে। মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের সময় এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে রাজশাহী মুক্তিবাহিনীর দখলে থাকার সময় যে অধ্যাপক হাবিবুর রহমান অবাঙালী অধ্যাপকদের বিশেষ করে ডক্টর মতিয়ুর রহমান, ডক্টর কলিম এবং অধ্যাপক প্যাটেলের জীবন রক্ষা করেছিলেন তারই প্রতিদান দিতে হল অধ্যাপক হাবিবুর রহমানকে জীবন দিয়ে। কিন্তু সেদিন যদি পাক পশুরা, মতিয়ুর রহমানেরা অধ্যাপক রহমানকে, অধ্যাপক সমাদ্দারকে রেহাই দিত তবুও জামাতে ইসলামী, ইসলামী ছাত্র সংঘ আর আল-বদরের হাত থেকে কি তাঁরা রেহাই পেতেন? অধ্যাপক কাইয়ুম তো রেহাই পাননি কশাইদের হাত থেকে।

এ· কে· এম· শামসুদ্দীন

বাংলাদেশের স্বাধীনতার বেদীমূলে প্রাণ দিয়েছেন সৈনিক, পুলিশ, ই.পি.আর., উৎসর্গীকৃত হয়েছেন শিক্ষক, ছাত্র, দেশ মাতৃকার শৃংখল মোচনে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছেন শ্রমিক, কৃষক। জাতি, ধর্ম, শ্রেণী, পেশা, অঞ্চল নির্বিশেষে বাংলার মানুষকে নিবেদন করতে হয়েছে আপন প্রাণ, সবার সমবেত আত্মত্যাগে উদিত হয়েছে স্বাধীনতার সূর্য। বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের প্রকৌশলীদের অবদানও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় যেমন স্মরণীয় চিকিৎসকদের ভূমিকা। ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার এসব পেশার মানুষেরা সাধারণতঃ রাজনীতি থেকে দূরে অবস্থান করেন কিন্তু দেশ ও জাতির জীবনে এমন সন্ধিক্ষণ আসতে পারে যখন তাদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হয়। আজ আমরা বাংলার স্বাধীনতার বেদীমূলে নিবেদিত এক মহৎপ্রাণ প্রকৌশলী জনাব এ. কে. এম. শামসুদ্দীনের আত্মত্যাগের কাহিনী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব। যিনি কাপ্তাইতে অনেক অবাঙালীর প্রাণ রক্ষা করেছিলেন আর সে অপরাধে পাক-বাহিনী তাঁকে হত্যা করেছিল।

ঊনসত্তরের মার্চ, এপ্রিল মাসের চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, বিক্ষুব্ধ চট্টগ্রাম শহর, যে বিক্ষোভ চট্টগ্রামের বন্দর, পুলিশ লাইন, ক্যান্টনমেন্ট ছাড়িয়ে পার্বত্য অঞ্চলের দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। চট্টগ্রামে সংঘর্ষ শুরু হয় ২রা মার্চ থেকে। আমবাগানে বিহারীদের হাতে বহু

বাঙালী নিহত হয়। আর শুরু হয় পাক-বাহিনীর ত্রাসের রাজত্ব, ৪ঠা মার্চ পর্যন্ত বিহারীরা পাকিস্তানী বর্বরদের সহায়তায় চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে হত্যা লুটতরাজ আর অগ্নি-সংযোগের উন্মত্ততায় মেতে ওঠে। ৫ই মার্চ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে এসে তাঁবু গাড়ে স্টেডিয়ামে। ২৪শে মার্চ রাত্রি থেকে বন্দর এলাকায় 'সোয়াত' জাহাজের অস্ত্র খালাসকে কেন্দ্র করে প্রচণ্ড গোলযোগ শুরু হয়। চট্টগ্রামের বাঙালী সামরিক শাসক ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে হেলিকপ্টার করে ঢাকা নিয়ে যাওয়া হয় এবং অস্ত্র খালাসে বাধাদানকারী বাঙালীদের অকাতরে হত্যা করা হয়। চট্টগ্রাম বন্দর, কর্ণফুলী আর বঙ্গোপসাগর বাঙালীর রক্তে লাল হয়ে যায়। তারপর ২৫শে মার্চ রাত থেকে শুরু হয় বাংলার স্বাধীনতার পবিত্র সংগ্রাম, একদিকে পুলিশ, ই. পি. আর. আর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মিলিত মুক্তিবাহিনী অন্যদিকে পাকিস্তান স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন সীমান্ত চৌকি থেকে ই. পি. আর. জওয়ানরা ওয়ারলেসে খবর পেয়ে দ্রুত এসে সমবেত হন কাপ্তাই আর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। ২৬শে মার্চ রাত্রে ডেস্ট্রয়ার বাবর থেকে চট্টগ্রাম শহরে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ শুরু হয়, পাকিস্তান বিমান বাহিনীও তীব্র আক্রমণ চালিয়ে যায়। ২৮শে মার্চ পুলিশ লাইনে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়, পুলিশ লাইনে ৫০ জন যোদ্ধার মধ্যে ৩৪ জন শাহাদাত বরণ করেন। ২৯শে মার্চ পুলিশ লাইনের পতন ঘটে। ই. পি. আর., ই. বি. আর. বাহিনীর সম্মিলিত প্রতিরোধও ১লা এপ্রিলে চট্টগ্রাম শহর অঞ্চল থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। তাঁদের এ প্রতিরোধ কালুরঘাট এবং কাপ্তাই অঞ্চলে ১০ই এপ্রিল পর্যন্ত বহাল ছিল।

কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ শহরটি মার্চের শেষ দিক থেকে এপ্রিলের ১০ তারিখ পর্যন্ত ই. পি. আর. যোদ্ধাদের পুর্ণ কর্তৃত্বে ছিল। পার্বত্য

চট্টগ্রামের দূর দুরান্তের বিভিন্ন ঘাঁটি, বিভিন্ন সীমান্ত চৌকি, বিভিন্ন ফাঁড়ি থেকে জওয়ানরা পূর্ব থেকেই কাপ্তাই-এ সমবেত হচ্ছিলেন, কাপ্তাই থেকে তারা আবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চলে জমায়েত হয়ে মার্চের শেষ এবং এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে চট্টগ্রাম শহর অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। এ সময়ে কাপ্তাই যুদ্ধে চন্দ্রঘোনা রাঙ্গামাটি অঞ্চলের অবাঙালীদের জানমাল তাঁদের করুণার উপরই নির্ভর করছিল। পাকিস্তান বাহিনী তাদের হত্যা, ধ্বংস, ধর্ষণলীলা চালিয়ে যখন চন্দ্রঘোনা, কাপ্তাইর দিকে অগ্রসর হতে থাকে তখন চট্টগ্রাম শহরে বাঙালীদের ওপরে বিহারী আর পাকিস্তানীদের বর্বরতার খবরও প্রচারিত হতে থাকে ফলে স্থানীয় বাঙালী অধিবাসীরা চন্দ্রঘোনা, কাপ্তাই অঞ্চলে অবাঙালীদের ওপর প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হয়। কিন্তু স্থানীয় বাঙালী অফিসারদের প্রচেষ্টায় তা কার্যে রূপান্তরিত হয়নি। পরে অবশ্য সেজন্য তাদের অনেককে প্রচুর মূল্য দিতে হয়েছে। যে-বিহারীদের তাঁরা রক্ষা করেছেন মৃত্যুর হাত থেকে তারাই তাদের ধরিয়ে দিয়েছে ঘাতক বলে।

কাপ্তাই শহরে যে মানুষটির জন্য অবাঙালীরা রক্ষা পেয়ে যায় তিনি হলেন কর্ণফুলী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ম্যানেজার জনাব এ. কে. এম. শামসুদ্দীন এবং তাঁর সহকারী প্ল্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার জনাব এ. সালেহ। এপ্রিল মাসের ১১ থেকে ১৩ তারিখের মধ্যে জনাব শামসুদ্দীনই বিহারীদের বাঁচান। তিনি হস্তক্ষেপ না করলে ই.পি.আর.-এর হাত থেকে একজন অবাঙালীও রক্ষা পেত না। কর্ণফুলী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের এই সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রধানের ব্যক্তিগত প্রয়াসের ফলে রক্ষা পায় অধিকাংশ বিহারী এবং আরও রক্ষা পায় জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি। সরে যাবার আগে ইচ্ছে করলেই ই.পি.আর. বাহিনী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি উড়িয়ে দিয়ে সমগ্র চট্টগ্রাম অঞ্চল প্রবাহিত করে দিয়ে অগ্রসরমান পাকিস্তানী বাহিনীকে ভাসিয়ে দিতে পারতো। কিন্তু জনাব শামসুদ্দীনের

ঐকান্তিক চেষ্টায় কাপ্তাই-এ সব কিছু ঠিক থাকে। ১৩ই এপ্রিল ই.পি.আর. সরে যায় আরও গভীর পার্বত্য অঞ্চলে। জনাব এ. কে. এম. শামসুদ্দীনও তখন চলে যেতে পারতেন যেমন রাঙ্গামাটি থেকে চলে গিয়েছিলেন অধিকাংশ উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। জনাব শামসুদ্দীনও জলযান করে দ্রুত নিরাপদ এলাকায় সরে যেতে পারতেন কিন্তু তিনি তা করলেন না। নিজের এবং পরিবারের নিরাপত্তা উপেক্ষা করে এই কর্ণফুলী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের মত একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সম্পত্তির কথা বিবেচনা করে তিনি থেকে গেলেন। সঙ্গে রইলেন জনাব এ. সালেহ কারণ তাঁদের উপস্থিতি ছাড়া জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। কাপ্তাই সুইডিস কারিগরি বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষক তাঁদের অধ্যক্ষ ডক্টর ফররুখ আজীজ খানের নেতৃত্বে চলে গেলেন কিন্তু জনাব শামসুদ্দীন এবং সালেহ গেলেন না। এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে পাকিস্তান বাহিনী কাপ্তাই প্রবেশ করল, কাপ্তাই ঢুকেই তারা স্থানীয় বিহারীদের কাছ থেকে জানতে চাইল বাঙালী অফিসারদের আচরণ। কাপ্তাইতে যে কয়জন বিহারী নিহত হয়েছিল তাদের মধ্যে একজন ছিল ড্রাইভার, তার স্ত্রী জনাব এ. কে. এম. শামসুদ্দীনকে তার স্বামীর মৃত্যুর জন্য দায়ী করল। পাক-বাহিনীর মেজর আনওয়ার ডেকে পাঠাল জনাব শামসুদ্দীনকে। তিনি আসা মাত্র কোন কথা জিজ্ঞেস না করে ঐ মেজর শামসুদ্দীন সাহেবকে রিভলবারের গুলীতে হত্যা করল। এভাবেই কাপ্তাই কর্ণফুলী প্রকল্পের ম্যানেজার জনাব এ. কে. এম. শামসুদ্দীনকে বিহারীদের বাঁচানোর মাসুল দিতে হল।

ডাক্তার শামসুদ্দীন

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময় ডাঃ শামসুদ্দীন রাজশাহীতে ছিলেন, রাজশাহী মেডিকেল কলেজে তখন তিনি সার্জারীর অধ্যাপক। আগরতলা মামলাকে কেন্দ্র করে সারাদেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসও বিক্ষুব্ধ, প্রতিদিনই ছাত্রদের সভা, শোভাযাত্রা চলছে। উনসত্তরের ২০শে জানুয়ারী এই আন্দোলনেই ঢাকাতে শহীদ হন আসাদুজ্জামান আরও শহীদ হন ১৫ই ফেব্রুয়ারীতে ঢাকা ক্যান্টনমেনেটে সার্জেন্ট জহুরুল হক। জহুরুল হকের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের খবরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্রদের মধ্য নেমে আসে শোক আর ক্ষোভ, ১৮ই ফেব্রুয়ারীতে ছাত্ররা বেরিয়ে যায় শোভাযাত্রা করে ১৪৪ ধারা অমান্য করে, তাদের সঙ্গে ছিলেন ডক্টর শামসুজ্জোহা। ক্যাম্পাস অঞ্চলে মোতায়েন সামরিক বাহিনীর একটি দল ঐ শোভাযাত্রার ওপরে হামলা করে তারা ডক্টর শামসুজ্জোহাকে গুলী আর বেয়োনেটের আঘাতে জর্জরিত করে ফেলে। ডক্টর শামসুজ্জোহাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু বিলম্ব হয়ে যাওয়ায় তাঁর জীবন রক্ষা হয়নি। সেদিন রাজশাহী মেডিকেল কলেজে ডক্টর শামসুজ্জোহার হত্যাকারীরা সার্জারীর অধ্যাপক ডাঃ শামসুদ্দীনকে দিয়ে বানোয়াট পোস্টমর্টেম রিপোর্ট লেখাবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু ডাঃ শামসুদ্দীন তাদের সেই আদেশ মান্য

করেননি। তিনি তাঁর রিপোর্টে ডক্টর শামসুজ্জোহার মৃত্যুর প্রকৃত অবস্থা ও কারণ অর্থাৎ তাঁকে যে গুলী ও বেয়োনেটের আঘাতে হত্যা করা হয়েছিল তা বর্ণনা করেছিলেন। সেইদিন থেকেই বুঝি ডাঃ শামসুদ্দীন চিহ্নিত হয়ে গেলেন বর্বরদের কাছে।

উনসত্তর থেকে একাত্তর মাত্র দুই বৎসর এবারে ডাঃ শামসুদ্দীন সীমান্ত শহর সিলেটে। সিলেট মেডিকেল কলেজের সার্জারীর অধ্যাপক ডাঃ শামসুদ্দীন ২৫শে মার্চ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার পরে নিরাপদে সপরিবারে সীমান্তের ওপারে চলে যেতে পারতেন কিন্তু তিনি তা করলেন না। একাত্তরের পঁচিশে মার্চ থেকেই সিলেটে পাক-বাহিনীর সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়, পাক-বাহিনী নাস্তানাবুদ হয়ে গেলে তাদের সহায়তায় পাক-বিমান বাহিনী সিলেট শহর ও আশে-পাশের অঞ্চলে পুনঃ পুনঃ হামলা চালাতে থাকে। ফলে দলে দলে মানুষ সিলেট ছেড়ে গ্রামাঞ্চলে বা সীমান্তের ওপারে চলে যেতে থাকে। সিলেটের প্রশাসনিক কর্তারা অর্থাৎ ডি. সি., এ. ডি. সি., এস. পি. সকলেই সিলেট ছেড়ে চলে যান। যুদ্ধে ও বিমান আক্রমণে সিলেটে বহু হতাহত হয়, তাদের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা ছিল না, সিলেট মেডিকেল কলেজেও চরম বিশৃংখলা কারণ ইতিমধ্যে মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ লেঃ কর্নেল্ জিয়াউর রহমানকেও গ্রেফতার করে নিয়ে যায় পাক-বাহিনী। এই পরিস্থিতিতে ডাঃ শামসুদ্দীন এগিয়ে এলেন দায়িত্ব নিলেন সিলেট মেডিকেল কলেজে যুদ্ধে আহতদের চিকিৎসার। ৯ই এপ্রিল পর্যন্ত ডাঃ শামসুদ্দীন দিবারাত্র মেডিকেল কলেজে আহতদের সেবা ও চিকিৎসা করেন, বুলেটবিদ্ধ বহু মানুষের অপারেশন করেন তিনি।

একাত্তরের ৯ই এপ্রিল তারিখে বিমান বাহিনীর সহায়তায় শক্তিশালী পাকিস্তানী বাহিনী পুনরায় সিলেট আক্রমণ করে এবং সিলেট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিকটে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে

প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। উন্নততর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, বিমান বাহিনীর সহায়তাপুষ্ট সংখ্যাধিক পাকিস্তানী বাহিনীর মোকাবেলায় অপারগ হয়ে মুক্তিবাহিনী সিলেট ছেড়ে চলে যায়। তারপর শুরু হয় পাক-বাহিনীর চরম বর্বরতা। এই বর্বরতার হাত থেকে হাসপাতালও রেহাই পায় না। মেজর রিয়াজ একদল পাকিস্তানী সৈন্য নিয়ে হাসপাতালে ঢুকে পড়ে এবং হাসপাতালে সাদা পোশাক পরিহিত চিকিৎসারত ডাঃ শামসুদ্দীন ও তাঁর সাতজন সহকর্মীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। ডাঃ শামসুদ্দীনকে যখন হত্যা করা হয় তখনও তাঁর বাহুতে ছিল রেডক্রসের ব্যাজ আর হাতে অপারেশনের যন্ত্রপাতি। এভাবেই মানবতার সেবায় রত ডাঃ শামসুদ্দীনকে মানবতার সেবা থেকে চিরকালের জন্য বঞ্চিত করল মানবতার শত্রু পাকিস্তানীরা।

সায়ীদুল হাসান

ঢাকার রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং শিল্পপতি মহলে অতি পরিচিত সায়ীদুল হাসান এক জঘন্য ষড়যন্ত্রের ভয়াবহ চক্রান্তের চরম বিশ্বাসঘাতকাতার মর্মান্তিক শিকার। যে ষড়যন্ত্র চক্রান্ত আর বিশ্বাসঘাতকতার হোতা হানাদার কবলিত কয়েকজন উচ্চপদস্থ পাকিস্তানী সামরিক অফিসার আর তাদের কিছু এজেন্ট। সায়ীদুল হাসান চীনপন্থী রাজনীতিক ছিলেন। জানি না সে ভরসাতেই তিনি একাত্তুরের এপ্রিল মাসেও ঢাকায় বসেছিলেন কি না? মওলানা ভাসানীর সন্তোষস্থিত বাসভবনের উপর পাকিস্তান বাহিনীর আক্রমণের পরেও কেন তিনি ঢাকা ত্যাগ করেননি তা' কে জানে? হয়তো গুরুতর মোটর দুর্ঘটনাজনিত অসুস্থতার কারণে দেশত্যাগের মত দৈহিক বা মানসিক শক্তি তাঁর ছিল না। হয়তো নিয়তি তাঁকে ধরে রেখেছিল ঢাকায়। কিন্তু এমনভাবে জড়িয়ে গেলেন তিনি এমন এক জালে যার থেকে তিনি আর বেরিয়ে আসতে পারলেন না। অথচ এতে তাঁর কোন হাতও ছিল না। নইলে এপ্রিলের শুরুতে সিলেটের জমিদার ও চা-বাগান মালিক নির্মল চৌধুরী নিজের দুটি এবং অপর এক আত্মীয়ের একটি মেয়ে নিয়ে তাকে আশ্রয় দিতে বলবেন কেন? আর তিনিই বা তাতে রাজি হবেন কেন? সায়ীদুল হাসান সেদিন তাদের শুধু আশ্রয়ই-দেননি, নির্মল চৌধুরীকে একথাও বলে দিয়েছিলেন,

আমরা বেঁচে থাকতে আপনার সন্তানদের কোন ক্ষতি হবে না। সায়ীদুল হাসান নিজের সর্বস্ব দিয়ে নিজের জীবন দিয়ে সে কথা রেখেছিলেন। সায়ীদুল হাসানের মতো প্রাণ, এ সমাজের দুর্লভ।

নির্মল চৌধুরী ঐ সময়ে ঢাকায় আটকে যান। বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিতেন তিনি, আর সুযোগ পেলেই এসে সন্তানদের দেখে যেতেন। এপ্রিলের ভয়াবহ দিনে নির্মল চৌধুরীর মত অতি পরিচিত বিশিষ্ট হিন্দু শিল্পপতির পক্ষে যে এ কত বড় বিপদের কারণ ছিল তা অচিরেই বোঝা গেল। একদিন হঠাৎ তাঁর মেয়ে দুটি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ল। নির্মল চৌধুরী তখন সিদ্ধেশ্বরীতে এস.ও কর্মচারী গোবিন্দ বাবুর বাড়িতে, সায়ীদুল হাসান তাঁকে তাঁর মেয়েদের অসুখের খবর দিয়ে বলে এলেন পারলে এসে দেখে যেতে, পরের দিন দুপুরে নির্মল বাবু একটা খোলা রিকশায় সায়ীদুল হাসানের ইস্কাটন গার্ডেন রোডের বাড়ী এসে উপস্থিত হলেন। মেয়েদের দেখলেন, নিজেও আশ্রয় চাইলেন এখানে ; কিন্তু তাঁর পেছন পেছন এসে উপস্থিত হল দু'টি পাকিস্তানী জানোয়ার। ইস্পাহানী চা বাগান-সমূহের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জালাল এবং ফ্লাইট লেঃ আনসারী। জালাল চা ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যাপারে নির্মল বাবুকে আগে থেকেই জানতেন এবং তাঁর বন্ধু স্থানীয়দের মধ্যে একজন। জালাল কিছু আলাপ করতে চাইল নির্মল বাবুর সঙ্গে, তিনিও রাজী হলেন।

জালাল নিয়ে গিয়েছিল নির্মল চৌধুরীকে কথা দিয়ে গিয়েছিল সেদিনই সন্ধ্যায় কারফিউর আগে ফিরিয়ে দিয়ে যাবে। সেদিনও না, পরের দিনও না, নির্মল বাবুকে তারা ফিরিয়ে দিয়ে যায়নি। সায়ীদুল হাসান তাঁর খবরের জন্য নিরাপত্তার জন্য সাদরী ইস্পাহানীকে টেলিফোন করেন। জালাল যে তারই কর্মচারী, কিন্তু কোন ফল হয় না। শুরু হয় সায়ীদুল হাসানের অনুশোচনা, নিজেকে দায়ী মনে হয়, তিনি কেন তাঁকে খবর দিয়ে এলেন ? কেন অসুস্থ মেয়েদের

দেখতে আসতে বললেন, তাঁর বাড়ী থেকেই যে পিশাচেরা নির্মল বাবুকে নিয়ে গেল। এখন তাঁর কিছু হলে তিনিই তো তার জন্য দায়ী থাকবেন। দু'দিন পরে একটি 'ভোকসওয়াগন' গাড়ীতে করে সাদা পোশাক পরিহিত তিনজন স্মার্ট তরুণ এল, তাদের মধ্যে একজন 'বাঙালী' চোখ দু'টি তার 'নীল'। সায়ীদুল হাসান সেদিন বাড়ী ছিলেন না, তিন্‌চার দিন পরে এল ফ্লাইট লেঃ আনসারী, জালাল। জানালেন নির্মল চৌধুরী ভাল আছেন, বাড়ী ফিরবেন। সায়ীদুল হাসান খুশীতে ফেটে পড়লেন, নির্মল বাবুর মেয়েদের আদর করলেন বুকে নিয়ে, জানালেন খুশীর খবর, বাচ্চাদের দেখালেন আনসারীকে। আনসারী জানাল, নির্মল বাবুর মুক্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে আই. এস. এস. বি'র কর্নেল সায়ীদুল হাসানের সঙ্গে কথা বলতে চান। আরও বললেন, শুধু নির্মল চৌধুরী নয়, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রনদা প্রসাদ সাহা এবং তাঁর পুত্রকেও মুক্তি দেয়া হবে এবং তাদের বিনিময়ে ওপার থেকে কয়েকজন বিশিষ্ট অবাঙালীকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে তারা সায়ীদুল হাসানের সাহায্য চায়। সায়ীদুল হাসান রাজী হয়ে গেলেন ক্যান্টনমেন্টে যেতে, তাদের সাহায্য করতে।

সায়ীদুল হাসান নির্বোধের মত পাকিস্তানী পিশাচদের ফাঁদে পা দিলেন, জড়িয়ে পড়লেন এক ভয়াবহ চক্রান্তের জালে, শিকার হলেন এমন এক ভ্রান্তির যা কেবল সায়ীদুল হাসানের মত ভালো মানুষের পক্ষেই সম্ভব। নির্মল চৌধুরীকে নিয়ে যাবার পর নবম দিন সন্ধ্যায় সেই ভোকসওয়াগনে করে আনসারী এল, নিয়ে গেল সায়ীদুল হাসানকে ক্যান্টনমেন্টে কর্নেলের কাছে, ফিরিয়ে দিয়ে গেল রাত সাড়ে ন'টায়, তারপর প্রতিদিন চলল এই খেলা। কর্নেলের সঙ্গে সায়ীদুল হাসানের কি কথা হত তা' জানা যায়নি, স্ত্রী ফরিদা হাসানকে তিনি শুধু এইটুকু জানিয়েছিলেন যে, নির্মল চৌধুরীদের

মুক্তি এবং তাদের বিনিময়ে কয়েকজন অবাঙালীকে ওপার থেকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কথা হচ্ছে।

১৪ই মে টেলিফোনে সায়ীদুল হাসানকে আবার ডেকে পাঠান হল, সন্ধ্যায় গোবিন্দ বাবুর বাড়ী থেকে নির্মল চৌধুরীর একটি স্যুটকেস নিয়ে নিজের গাড়ীতেই নির্দেশ মতো মোহাম্মদপুরে ফিজিক্যাল ট্রেনিং কলেজের মিলিটারী ক্যাম্পে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে গাড়ীটা খালি ফিরে এল, সবাই ভাবল এই বুঝি সব শেষ, কিন্তু না পরে সেদিনও তিনি আবার ফিরে এলেন বাড়ীতে, বললেন নির্মল বাবুকে দেখে এসেছেন ক্যান্টনমেন্টে। নির্মল বাবু নাকি তাঁকে শুধু এই কথাটা বলে দিয়েছিলেন, 'জালাল চাইলে আমাকে ছাড়াতে পারে। তারপর থেকে নির্মল বাবুকে ছাড়াবার ব্যবস্থা করার জন্য পাগলের মত ছুটোছুটি করতে লাগলেন সায়ীদুল হাসান। তিনি নূরুল আমীন, হামিদুল হক চৌধুরী সবার কাছে বার বার গেলেন কিন্তু কোন ব্যবস্থা হল না। কয়েকদিন পরে বিকেলবেলা আবার তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল, দেখান হল নির্মল বাবুকে, বাড়ী ফিরে এসে তিনি একেবারে ভেঙে পড়লেন, কিন্তু কারও কাছে প্রকাশ করেন না কি চলছে নির্মল বাবুকে নিয়ে। ১৭ই মে রাত্রিতে কারফিউর মধ্যে সামরিক জীপ এসে পুনরায় সায়ীদুল হাসানকে নিয়ে গেল, মনে হল তিনিও যাবার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। একটা পাঞ্জাবী পরে বেরিয়ে গেলেন তিনি, সেদিন আধ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে যাওয়া হল। সারারাত তিনি একটু ঘুমুলেন না, শুধু পায়চারী করলেন আর পাগলের মত কি যেন ভাবলেন। পরদিন ১৮ই মে সকাল হতেই তিনি গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে গেলেন, দুপুর ১২টা পর্যন্ত সম্ভব সমস্ত জায়গায় ঘুরে টাকা সংগ্রহ করতে লাগলেন। দুপুর ১টার পরে তিনি আর কোথায়ও গেলেন না, বাড়ীতেই রইলেন। বিকেলে তাঁর কাছে শহীদুল্লাহ কায়সার এলেন, বলে গেলেন শুধু একটা কথা 'কোন ব্যবস্থা

করতে পারলাম না'। বিকেলে সায়ীদুল হাসানের অফিসের এক বিশ্বস্ত কেরানী আরেফিন এলেন। ১৮ই মে সন্ধ্যা ৭টায় বেগম ফরিদা হাসান নামাজ পড়ছিলেন, সায়ীদুল হাসান নিজের গাড়ীতে বেরিয়ে গেলেন আরেফিনকে নিয়ে। বলে গেলেন রাত ন'টার মধ্যে না ফিরলে নূরুল আমীনকে ফোন করতে। মনে হয় নূরুল আমীন সমস্ত ব্যাপারটাই জানতেন। রাত ন'টা তো দূরের কথা, সারা রাতের মধ্যেও গাড়ী ফিরে এল না, শূন্য গাড়ী ফিরে এল সকালে। বিশ্বস্ত ড্রাইভারের জবানীতে জানা গেল, সায়ীদুল হাসান হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে নেমে যান, গাড়ী কমার্স ব্যাঙ্কের সামনে পার্ক করা থাকে, কিছুক্ষণ পরে কয়েকজন সামরিক কর্মচারী এসে গাড়ীর ভেতর থেকে একটা বড় খাম এবং আরেফিনকে নামিয়ে নিয়ে যায়। ড্রাইভার জানায় সেদিন সারা সকাল সায়ীদুল হাসান ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে ঘুরে অনেক টাকা তোলেন আর সব টাকা ঐ খামের মধ্যে ছিল। রাতে কারফিউর জন্য ড্রাইভার ফিরতে পারেনি, সকাল হতেই সে ফিরে এল, সায়ীদুল হাসানের শেষ খবর তাঁর স্ত্রী ফরিদা হাসান এবং কন্যা শর্মিন হাসানকে জানাল। সঙ্গে সঙ্গে নূরুল আমিন, হামিদুল হক চৌধুরীকে টেলিফোন করা হল। শহীদুল্লাহ কায়সার ছুটল সফররত পশ্চিম পাকিস্তানী নেতা মাহমুদ আলী কাসুরীর কাছে। কিন্তু কোন খবর পাওয়া গেল না। কশাই টিক্কা খান আর খুনী ফরমান আলী শুধু জানাল যে 'ভাগ্ গিয়া'।

সায়ীদুল হাসানের রহস্যজনক অন্তর্ধানের পরে একদিন মিলিটারী ইনটেলিজেন্সের কম্যাণ্ডিং অফিসার লেঃ কর্নেল মাকসুদ বেগম ফরিদা হাসানের সঙ্গে দেখা করে তাঁর স্বামীর ব্যাপারে মুখ না খুলতে সতর্ক করে দিয়ে যায়, বলে যায় মুখ খুললে তাঁর স্বামীকে আর পাওয়া যাবে না। বস্তুতঃ এই চক্রান্তের নায়ক ছিল লেঃ কর্নেল মাকসুদ আর তার এজেন্ট ছিল জালাল, আনসারী আর ঐ নীল চক্ষু

বাঙালীটি। তারা নির্মল চৌধুরীর মুক্তিপণ বাবদ আট লক্ষ টাকা দাবী করেছিল সায়ীদুল হাসানের কাছ থেকে। তিনি বহু চেষ্টা করে লক্ষাধিক টাকা সংগ্রহ করে ইন্টারকন্টিনেন্টালে নিয়ে গিয়েছিলেন তাদের কাছে। পাকিস্তানী পিশাচেরা ঐ টাকাটা আত্মসাৎ করে এই অপকর্মের সাক্ষী সায়ীদুল হাসান, নির্মল চৌধুরী আর আরেফিনকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়। তাদের অসতর্কতায় ড্রাইভারটি রেহাই পায় আর প্রকাশ হয়ে পড়ে সায়ীদুল হাসানের শেষ গন্তব্যস্থলের কাহিনী। সায়ীদুল হাসানের মতোই আর এক চক্রান্তের শিকার হয় বিশিষ্ট বাঙালী শিল্পপতি আবদুল আহাদ। শুধু কি আহাদ, সায়ীদুল হাসান আরও কত হতভাগ্য বাঙালী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এই পিশাচদের থাবায় তা কে জানে?

আলতাফ মাহমুদ

মহান একুশের অমর শহীদদের স্মরণে রচিত 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী' গানটির অবিস্মরণীয় সুরকার আলতাফ মাহমুদ হারিয়ে গেলেন আমাদের মধ্য থেকে হয়ে গেলেন অমর শহীদদের একজন একথা আজও অবিশ্বাস্য মনে হয় আমার কাছে। পঁচিশে মার্চের রক্তাক্ত রাতে মৃত্যুকে এড়িয়ে অনেক ঠিকানা পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত মে মাসে আশ্রয় নিলাম কনিষ্ঠ ভ্রাতা আতিকুল ইসলামের বাড়ীতে। সায়েন্স ল্যাবরেটরী রোডের এ বাড়ীতে মে, জুন এ দু'টি মাস প্রায় প্রতিদিন আসতেন আলতাফ মাহমুদ, বিকেল না হতেই তিনি চলে আসতেন, কারফিউ হবার আগেই চলে যেতেন। সেই বিষণ্ন বিপর্যস্ত দিনগুলোর প্রতিদিন বিকেলে একটা অন্ধকার ঘরের কোণে ফিসফিস করে আলাপ করতাম আমরা ক'জন। আলতাফ মাহমুদ আনতেন বাইরের খবর, সীমান্তের ওপারের খবর, আমি দিতাম বিশ্বের বিভিন্ন বেতার থেকে চব্বিশ ঘণ্টা ধরে সংগ্রহ করা সব খবরের সারমর্ম। কত পরামর্শ করেছি ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে কিন্তু কিছুই স্থির করতে পারতাম না। আতিক, আলতাফ ওরা চিন্তিত ছিলেন রবীন্দ্র সঙ্গীতশিল্পী অজিত রায়কে নিয়ে, কি করে পার করা যায় তাকে সেই চিন্তা। মাঝে মাঝে ওপার থেকে যোগাযোগ আসত। জুলাই মাসের দিকে আলতাফ চঞ্চল হয়ে উঠল, গান

পাঠাতে হবে। লতিফ ভাইর সঙ্গে যোগাযোগ হল, আবদুল লতিফ গান লিখে দিলেন, আলতাফ মাহমুদ তাতে সুরারোপ করলেন। আমি যতদূর জানি, আলতাফ ঢাকাতেই এক বাড়ীতে কয়েকটি গান টেপ করে ওপারে পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরিকল্পনাও করেছিলেন সেপ্টেম্বরের শুরুতেই চলে যাবেন ওপারে, যোগ দেবেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে। স্বপ্ন দেখতেন আলতাফ মাহমুদ, উজ্জ্বল হয়ে উঠত তার চোখ দু'টি, কল্পনায় শুনতে পেতাম আলতাফ মাহমুদের গান স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে। আলতাফ মাহমুদের সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয় জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে সেদিন তিনি স্ত্রী-কন্যা নিয়ে এসেছিলেন, কারফিউ হত তখন রাত দশটায়, রাতে অনেকক্ষণ থাকলেন, এক সঙ্গে সবাই খেলাম আমরা। সেদিন কি জানতাম এটাই আমাদের শেষ খাওয়া এক সঙ্গে ?

জুলাই মাসের পরে আর দেখা হয়নি আলতাফ মাহমুদের সঙ্গে আর কোনদিন দেখা হবেও না। তারপরই আমি গ্রেফতার হয়ে যাই, বন্দী শিবিরে বসে বসে ভাবতাম আলতাফ মাহমুদ নিশ্চয়ই ওপারে চলে গেছে, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে নিশ্চয়ই ওর দৃপ্ত কণ্ঠ অনুরণিত হচ্ছে, উল্লসিত হতাম। কিন্তু হায়! তখন কি জানতাম আলতাফ মাহমুদ আমাদের বন্দী শিবিরের কাছেই কোথাও উৎপীড়িত হচ্ছে অমানুষিক পীড়নে, বিদায় নিচ্ছে মাতৃভূমির কাছ থেকে ? আগস্ট মাসের ১১ তারিখে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে দুঃসাহসিক বিস্ফোরণ ঘটে, সেদিনই ক্র্যাক প্লাটুন থেকে দুইজন পরিচিত যুবক এসে বিস্ফোরক বোঝাই একটি ট্রাঙ্ক রেখে যায় আলতাফ মাহমুদের কাছে, আলতাফ মাহমুদ ট্রাঙ্কটা বাড়ীর আঙিনায় মাটির নীচে পুঁতে রাখেন। ৩০শে আগস্ট রাত ৩টায় মিলিটারী আসে আলতাফ মাহমুদের বাড়ীতে, সঙ্গে পথ প্রদর্শক চাদর ঢাকা একটা লোক। জিজ্ঞেস করে 'আলতাফ মাহমুদ কৌন

হ্যায়,' আলতাফের পেছনে রাইফেল ধরে নিয়ে যায় বাড়ীর আঙিনায় যেখানে মাটির নীচে পোঁতা ছিল ঐ বিস্ফোরক বোঝাই ট্রাঙ্ক। আলতাফকে দিয়ে মাটি খুঁড়িয়ে ট্রাঙ্কটা বের করায়, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় প্রচণ্ড মারপিট, রাইফেলের বাটের প্রচণ্ড আঘাত আর পশুদের বুটের লাথি। রক্তাক্ত আলতাফ মাহমুদকে টেনে ট্রাকে তুলে নিয়ে যায় পশুরা, সঙ্গে নিয়ে যায় পাঁচটি তরুণ আত্মীয়কে। নুহেল, খায়রুল, নওফেল, মঞ্জুরুল, বারেক এবং আরও পাঁচজন প্রতিবেশী যুবককে। প্রথমে ওদের এম. পি. এ. হোস্টেলে নিয়ে যাওয়া হয়, ঐ হোস্টেলে ছিল ঢাকা সাব-সেক্টরের এরিয়া কম্যাণ্ডার খুনী ব্রিগেডিয়ার বশিরের অফিস আর ছিল একটি উৎপীড়ন কেন্দ্র। কত সোনার ছেলে যে ঐ উৎপীড়ন কেন্দ্রে শেষ হয়ে গিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। আলতাফ মাহমুদদের দিনে ঐ কেন্দ্রে নিয়ে উৎপীড়ন চালান হত আর রাত্রে নিয়ে আসা হত রমনা থানার হাজতে। আড়াই দিন পরে সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হয় আলতাফ মাহমুদকে ছাড়া। সবাই ফিরে আসেন কেবল ফেরেন না আলতাফ মাহমুদ। সুর শিল্পী, সঙ্গীত পরিচালক আলতাফ মাহমুদের ওপরে চলে পাশবিক অত্যাচার, তাঁর নখ তুলে ফেলা হয়, হাত পা সব ভেঙে দেওয়া হয়, বৈদ্যুতিক পাখার সঙ্গে মাথা নীচের দিকে ঝুলিয়ে পাখা ছেড়ে দেওয়া হয়, সম্ভবতঃ তাঁর চোখ দু'টিও রেহাই পায়নি এই পৈশাচিক পীড়ন থেকে। পশুরা তাঁর কাছ থেকে কিছু কথা বের করতে চেয়েছিল, জোর করে আদায় করতে চেয়েছিল কিছু স্বীকারোক্তি কিন্তু একটি বারের জন্যও আলতাফ মাহমুদের মুখ তারা খোলাতে পারেনি। আলতাফ মাহমুদ ১লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। সেদিনও তাঁকে এম. পি. এ. হোস্টেলে পীড়ন কেন্দ্রে দেখা গেছে, তারপর থেকে আর কোন খবর পাওয়া যায়নি।

কি আশ্চর্য, আলতাফ মাহমুদ পরিকল্পনা করেছিলেন ২রা সেপ্টেম্বর দেশ ছাড়বেন চলে যাবেন মুক্তাঞ্চলে আর সেদিন থেকেই

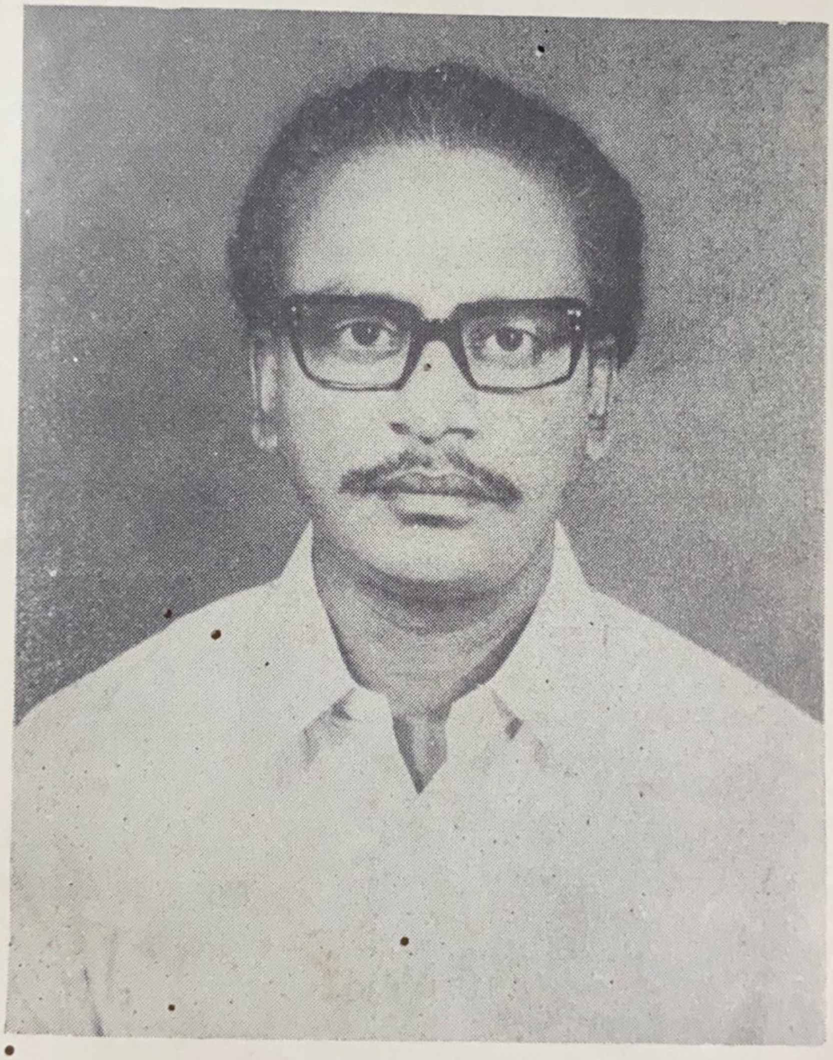

তিনি হয়ে গেলেন চিরদিনের জন্য নিরুদ্দেশ! চিরতরে মুক্তি নিলেন তিনি! আলতাফ মাহমুদ প্রকৃত বীরের মতো নিষ্ঠুর পরিণতিকে বরণ করেছেন, চরম পরীক্ষার মুহূর্তে যে স্থৈর্য, যে আত্মশক্তির পরিচয় দিয়েছেন আমাদের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে তার নজীর খুব বেশী নেই। এমন বীরের তো মৃত্যু নেই, এমন নিঃশেষে নিজেকে যে দান করতে পারে তার ক্ষয় নেই। কোন পশু শক্তি, কোন বিশ্বাসঘাতক কোন দিন পারবে না আলতাফ মাহমুদের নামকে মুছে দিতে। ধন্য আলতাফ মাহমুদ, ধন্য বাংলাদেশ যে, এমন বীর শিল্পীকে জন্ম দিতে পেরেছে। চিরঞ্জীব আলতাফ মাহমুদ জিন্দাবাদ।

সৈয়দ হাফিজুর রহমান

ঢাকা বেতার ও টেলিভিশনের কুশলী যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পী হাফিজুর রহমান। সুরকার, সঙ্গীত পরিচালক, সেতার গীটার, ভাইব্রোফোন, ম্যাণ্ডেলিন ইত্যাদি যন্ত্রে সার্থক সুরস্রষ্টা। কিন্তু হানাদার কবলিত ঢাকা শহরে শিল্পী হাফিজের আসল পরিচয় যোদ্ধা হাফিজ। একাত্তরের এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে যশোরে হাফিজের বাবা প্রাণ হারিয়েছিলেন পাক সেনাদের গুলীতে, তিনি তখন মাগরেবের নামাজ পড়ছিলেন, সে অবস্থাতেই পর পর আটটি গুলী খেয়ে তিনি ঢলে পড়েছিলেন জায়নামাজের ওপরেই। সেদিন থেকে হাফিজ যোদ্ধা, প্রতিশোধের নেশায় আগুন। মুক্তিযোদ্ধা হাফিজ ঢাকায় যে দায়িত্ব পালন করছিলেন তা যেমন বিপজ্জনক তেমনি অসীম সাহসিকতাপূর্ণ। ঢাকায় তাঁর মগবাজারের বাড়ীটি হয়ে উঠছিল একটি অস্ত্রভাণ্ডার। সে সময়ে ঢাকা শহরে বিভিন্ন তৎপরতায় ব্যবহারযোগ্য এমন কোন অস্ত্র-শস্ত্র ছিল না যা তাঁর বাড়ীতে মওজুদ ছিল না। এ সব অস্ত্রশস্ত্র বহনের জন্য হাফিজ নিজের গাড়ীটি ব্যবহার করতেন। মে মাস থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত ঢাকা শহরের বুকে মুক্তি বাহিনীর ব্র্যাক কমাণ্ডোদের যতগুলি দুঃসাহসী অপারেশন হয়েছে তার অধিকাংশের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন হাফিজ, এ ব্যাপারে আর একজন শিল্পীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তিনি আলতাফ মাহমুদ।

হাফিজকে দেখে কিন্তু বোঝার উপায় ছিল না যে, কি দুঃসাহসী কাজে তিনি রত, ঢাকা শহরে পাক-বাহিনীর ত্রিশ হাজার সৈনিকের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে হাফিজ অবলীলাক্রমে তাঁর দায়িত্ব পালন করে গেছেন। অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ সংগ্রহ করেছেন, নিজের বাড়ীতে মওজুদ করেছেন, মুক্তিযোদ্ধাদের তা সরবরাহ করেছেন নিজেও যোগ দিয়েছেন বিভিন্ন অভিযানে। পাক সেনারা তাঁকে ধরতে পারেনি। কিন্তু পাক-বাহিনীকে ফাঁকি দিতে পারলেও হাফিজ বিশ্বাসঘাতকতার হাত এড়াতে পারলেন না, যে বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়েছিলেন শিল্পী আলতাফ মাহমুদও।

আলতাফ মাহমুদ ধরা পড়েছিলেন ৩০শে আগস্ট রাতে আর হাফিজ ধরা পড়ল তার তিনদিন পরে। সেদিন ভোর রাতে তাঁর মগবাজারের বাড়ীতে হানা দিল সামরিক বাহিনীর লোকেরা ; সঙ্গে পথ প্রদর্শক চাদর ঢাকা একটি লোক। সে হাফিজকে সনাক্ত করল যেমন করে সনাক্ত করেছিল আলতাফ মাহমুদকে এবং ক্র্যাক কমাণ্ডোদের আরও কয়েকজনকে। হাফিজের ওপর সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছিল প্রচণ্ড দৈহিক নির্যাতন, অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল হাফিজ সঙ্গে সঙ্গে। অচৈতন্য হাফিজকে তারা রেহাই দেয়নি, নিয়ে গিয়েছিল সঙ্গে করে। শোনা যায় আলতাফ মাহমুদের মতো হাফিজের ওপরেও প্রচণ্ড অত্যাচার চালানো হয় স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য, সংবাদ সংগ্রহের জন্য। দিনের পর দিন তাঁর ওপরে চলতে থাকে এই পৈশাচিক অত্যাচার, কিন্তু তারা একটি কথাও বের করতে পারেনি হাফিজের মুখ থেকে। সম্ভবতঃ অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত হাফিজ বেঁচেছিলেন, আলতাফ মামুহদ বেঁচেছিলেন ১লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, তারপরে আলতাফ মাহমুদের মতো হাফিজেরও আর কোন খবর পাওয়া যায়নি। আমাদের দেশের দুইজন মহৎ শিল্পী ও বীর মুক্তিযোদ্ধা এমন ভাবেই হারিয়ে গেল বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে।

অধ্যাপক মীর আবদুল কাইয়ুম

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ঘাঁটি গেড়ে পাকিস্তানী হানাদার দস্যুরা যে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিল মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস কাল তার শিকার হয়েছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন বিশিষ্ট অধ্যাপক—ডক্টর হাবিবুর রহমান, শ্রী সুখরঞ্জন সমাদ্দার এবং মীর আবদুল কাইয়ুম। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক মীর আবদুল কাইয়ুমের দুর্ভাগ্য যে তিনি মনস্তত্ত্ব বিভাগের শিক্ষক ছিলেন, কারণ ঐ বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর মতিয়ুর রহমানই ছিল রাজশাহীতে পাকিস্তানী বর্বরদের প্রধান দোসর। রাজশাহী শহর, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এবং আশেপাশের এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসকাল পাক-বাহিনী যে সব 'অপারেশন' করেছে তার পরিকল্পনাকারী, উপদেষ্টা এবং ঐ সব অপারেশনে পাক-বাহিনীর নিত্য সহচর ছিল ডক্টর মতিয়ুর রহমান। হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, উৎপীড়ন সর্বপ্রকার অমানবিক এবং পাশবিক কার্য ডক্টর মতিয়ুর রহমানের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে সংঘটিত হত। অঙ্কের অধ্যাপক ডক্টর হাবিবুর রহমান হয়তো ছাড়া পেতে পারতেন, হয়তো বেঁচে যেতে পারতেন যদি ডক্টর মতিয়ুর রহমান না থাকত। আর অধ্যাপক সুখরঞ্জন সমাদ্দারের বাড়ী তো সে নিজেই দেখিয়ে দিয়েছিল ঘাতকদের। প্রকাশ যে, জল্লাদেরা যখন গাড়ীতে করে শ্রী সমাদ্দারকে নিয়ে যায় তখন নাকি মতিয়ুর

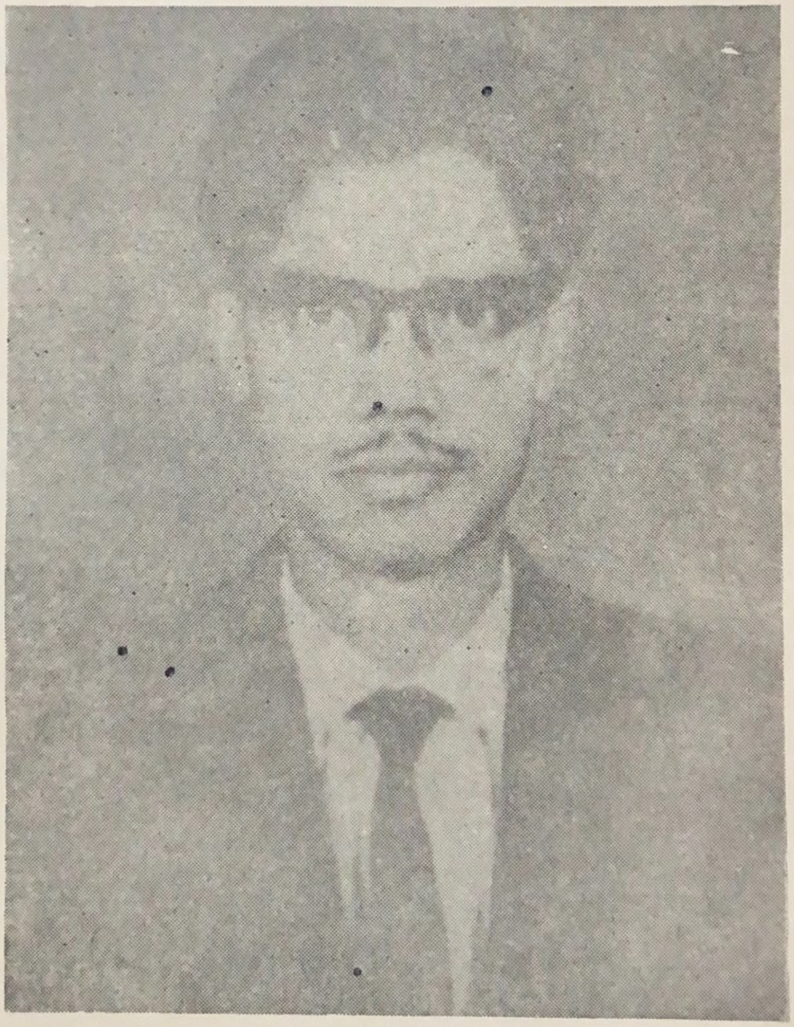

রহমান সে গাড়ীতে ছিল। মতিয়ুর রহমান প্রতি রাতে বহু হতভাগ্য বাঙালী মেয়ের সর্বনাশ করেছে ক্যাম্পাসে নিজের বাড়ীতে। তার বাড়ীটা হয়ে উঠেছিল লুন্ঠিত দ্রব্যসামগ্রীর একটা গুদাম বিশেষ। অধ্যাপক মীর আবদুল কাইয়ুমের দুর্ভাগ্য যে তিনি ঐ পিশাচের অধীনে চাকুরি করতেন, তাই নবেম্বরের শেষ সপ্তাহের আগেই মতিয়ুর রহমান রাজশাহী ছেড়ে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গেলেও তার অনুচরেরা রাজশাহী ক্যাম্পাসে বেশ সক্রিয় ছিল আর সে কারণেই স্বাধীনতার পবিত্র লগ্নের মাত্র ২২ দিন আগে জীবন দিতে হল অধ্যাপক মীর আবদুল কাইয়ুমকে।

অধ্যাপক কাইয়ুম একটা জিজ্ঞাসা নাকি বার বার উচ্চারণ করতেন, 'দেশ একদিন স্বাধীন হবেই কিন্তু দেখে যেতে পারব কি? এই জিজ্ঞাসা, এই আকুলতা হানাদার কবলিত বাংলাদেশের কোন স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের ছিল না? যাঁরা তাঁর আগে চলে গেলেন বিশেষতঃ স্বাধীনতার পূর্ব লগ্নে তাঁদের সে দুঃখ আজ আমাদের বিশেষভাবে স্পর্শ করছে, বিশেষতঃ আমাদের, যাঁরা দৈবাৎ বেঁচে গেছি, স্বাধীনতার মুক্ত বায়ুতে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিতে পারছি। যাঁরা হানাদার কবলিত দেশে বন্দীদশায় জীবন কাটাননি তাঁরা পারবেন না এ অনুভূতির মূল্য অনুধাবন করতে।

অধ্যাপক মীর আবদুল কাইয়ুম দেশ ছাড়েননি, যেমন দেশ ছাড়েননি আরও সাড়ে ছয় কোটি বাঙালী। আবদুল কাইয়ুম যে বলেছিলেন 'দেশ ছেড়ে যাব কেন', এ প্রত্যয় শুধু তাঁর একার নয়, এ প্রত্যয় ঐ সাড়ে ছয় কোটি মানুষের যাঁরা নিজ দেশে পরবাসী ছিলেন। কিন্তু এটা অধ্যাপক কাইয়ুমের জন্য বিশেষভাবে মর্মান্তিক এ কারণে যে, জল্লাদেরা তাঁকে নিজ দেশে পরবাসী হয়েও বাঁচতে দিল না, যেমন দেয়নি আরো অনেক বুদ্ধিজীবীকে।

একাত্তরের পঁচিশে নবেম্বর রাত, স্ত্রী এবং সন্তান অপু, কেয়া,

পিয়াকে নিয়ে অধ্যাপক কাইয়ুম আপন ঘরে দিন গুণছিলেন স্বাধীনতার দিন-ক্ষণ। ঠিক ঐ সময়ে ঘাতকের দুত হানা দিল ঐ ঘরে। নাম তৈয়ব আলী, জাতিতে অবাঙালী, পেশা বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্টারের স্টেনো। ডেকে নিয়ে গেলো অধ্যাপক কাইয়ুমকে, বলল একজন সামরিক অফিসার দেখা করতে চায় রাস্তার মোড়ে। তিনি সরল বিশ্বাসে রাতের অন্ধকারে ঐ ঘাতকের দুত তৈয়ব আলীর হাত ধরে চির অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন। শুধু একটা জীপ গাড়ী অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। স্ত্রী মাস্তুরা কাইয়ুম তিনটি সন্তান নিয়ে সারা রাত অপেক্ষা করলেন, কিন্তু তিনি আর কোনদিন ফিরলেন না, দেখলেন না চতুর্থ সন্তানের মুখ, নবজাত ছেলেটি জন্মেই পিতৃহারা হল। এসন্তান কোনদিন জানবে না। পিতৃস্নেহ কি জিনিস? এমন নিষ্ঠুর পিশাচ ঐ পাকিস্তানী ঘাতকেরা। অধ্যাপক কাইয়ুমের অপরাধ ছিল তিনি বাঙালী আরও বড় অপরাধ ছিল তিনি ডক্টর মতিয়ুর রহমানের সুনজরে ছিলেন না। তাই রাতের অন্ধকারে তাঁকে বধ করে পুতে ফেলা হল পদ্মার বালুচরে এক গর্তে আরও ১৩ জনের সঙ্গে। কাইয়ুমের লাশের উপরে স্তূপীকৃত আরও তেরটি হতভাগ্য বাঙালী, যার একজন ছিলেন মহিলা। স্বাধীনতার পরে ৩০শে ডিসেম্বর স্বাধীনতার আলো-বাতাসে বেরিয়ে এল হাত বাঁধা গুলীবিদ্ধ ঐ বিকৃত লাশগুলি, পাকিস্তানীদের অগণিত বর্বরতার অন্যতম নিদর্শনরূপে। লুঙ্গি আর সার্ট থেকে সনাক্ত করার পর অধ্যাপক মীর আবদুল কাইয়ুমের লাশ যথাবিহিত সমাহিত করা হল স্বাধীন বাংলার মাটিতে।

সিরাজুদ্দীন হোসেন

'ইত্তেফাক' পুড়িয়ে দিল পাক-সামরিক চক্র, কিন্তু সিরাজুদ্দীন হোসেন ঢাকা ছাড়লেন না। ইত্তেফাকের ওপর পশ্চিমা শাসকদের আক্রোশ সনাতন, তাই বার বার আঘাত এসেছে কিন্তু 'ইত্তেফাক' মরেনি। 'ইত্তেফাক' এবারেও স্তব্ধ হল না, আবার প্রকাশিত হল; কিন্তু পাক-দস্যুরা চাইল, 'ইত্তেফাক'কে তাদের মুখপত্র করতে, কিন্তু তা' হল না। হানাদার কবলিত বাংলাদেশে সামরিক চক্রের আদেশে প্রকাশিত, ইত্তেফাকে 'রাজনৈতিক সমীক্ষা' প্রকাশিত হল একটি নয় পর পর কয়েকটি। কে এই মানুষটি যিনি হানাদার কবলিত দেশে স্পষ্ট বলিষ্ঠ রাজনৈতিক সমীক্ষা প্রকাশের দুঃসাহস রাখেন? সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রবীণ সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেন ছাড়া এমন সাহস আর কার হতে পারত? কিন্তু সেইদিনই বুঝি ঘাতকদের তালিকায় তাঁর নাম উঠল পয়লা নাম। টিক্কা, ফরমান, নিয়াজী, বশির, হেজাজী ঘুরে আল-বদর পর্যন্ত। আল-বদরের এক নম্বরের দুশমন সিরাজুদ্দীন হোসেন।

সিরাজুদ্দীন হোসেন কিন্তু অভাবিত রকম শান্ত আর স্থির ছিলেন পুরো নয়টি মাস। ৫নং চামেলীবাগের বাড়ীতে বড় ছেলে ছাড়া আর সব ছেলে-মেয়ে স্ত্রী নিয়ে সন্তান বৎসল সিরাজুদ্দীন হোসেন নয়টি মাসের প্রতিটি দিন প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগালেন। বড়

ছেলেটিকে তিনি যেতে দিলেন মুক্তিবাহিনীতে আর সব ছেলে-মেয়ে রইল প্রতিদিন ঐ বাড়ীতে সমাগত অতিথিদের যথারীতি আপ্যায়নের জন্য। বস্তুতঃ সিরাজুদ্দীন হোসেনের বাড়ীটি হয়ে উঠেছিল ঐ পাড়ার সংবাদ কেন্দ্র, পাড়ার মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রতীক। সিরাজুদ্দীন হোসেন সন্ধ্যার পর আর বেরুতেন না, প্রয়োজন হলে টেলিফোনে ডিকটেট করে দিতেন ইত্তেফাকের সম্পাদকীয়। প্রতি বিকেলে আসর জমত, তাতে আসতেন পাড়ার এক ডি. এস. পি., আসতেন জনাব মুস্তাফা আলী আর আসতেন সাংবাদিক হেদায়েত হোসেন মোর্শেদ, মেসবাহউজ্জামান, সৈয়দ মাহমুদ এবং আরো কেউ কেউ। দিনের উল্লেখযোগ্য সংবাদ (অবশ্যই মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত) আলোচিত হত, সিরাজুদ্দীন সাহেব তাঁর ডায়রিতে দৈনিক খবরের, সব কাগজের সব সম্পাদকীয় মন্তব্যের সারাংশ প্রতিদিন টুকে রাখতেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে যুদ্ধের, হানাদারদের অত্যাচারের যত খবর পাওয়া যেত সব লিখে রাখতেন তিনি। বিভিন্ন সূত্র থেকে গোপনীয় রিপোর্টও সংগ্রহ করা হত, বিশেষতঃ সহানুভূতিশীল বৈদেশিক দূতাবাসের কূটনৈতিক মহল থেকে এবং তা' ওপারে পাঠাবার চেষ্টা করা হত। বাংলাদেশের অবস্থা সম্পর্কে আর্থার ব্লাড-এর একটা গোপন রিপোর্ট তিনি তাজউদ্দীন সাহেবকে পাঠিয়েছিলেন, অবশ্য সেটা তাঁর হাতে গিয়ে পৌঁছেছিল কিনা জানা যায়নি। এ সব প্রায়ই মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের হাতে দিয়ে দেওয়া হত। তিনি বলতেন, এ সব রেকর্ডের একদিন খুব প্রয়োজন হবে।

সিরাজুদ্দীন হোসেনের আর একটি কাজ ছিল মানচিত্র পর্যালোচনা। বাংলাদেশের মানচিত্র দেখে দেখে যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি অনুধাবন করার চেষ্টা করতেন তিনি। যখনই আকাশবাণী বা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতার কথা বলা হত তখনই তিনি স্থানটি খুঁজে বের করতেন মানচিত্র। এমনকি

রেডিও পাকিস্তানে যখন কোন স্থানে পাক-বাহিনীর হামলার কথা প্রচারিত হত তখনই তিনি জায়গাটা সনাক্ত করতেন, কারণ তিনি জানতেন মুক্তিবাহিনীর গন্ধ পেলেই পাক-বাহিনী তৎপর হয় বেশী। এভাবে হানাদার কবলিত বাংলাদেশে ঘরে বসে প্রবীণ সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সাংবাদিকতার কাজ করলেন নয়টি মাস। সাংবাদিকতায় এমন আনন্দ তিনি বুঝি আর কখনও পাননি, যে আনন্দের ভাগ দিতেন তিনি প্রতি বিকেলে তাঁর বারান্দায় সমবেত বন্ধুদের, যাদের তিনি সাহস দিতেন, প্রেরণা দিতেন, উদ্বুদ্ধ করতেন, অভয় দিতেন, প্রচণ্ড শক্তি তিনি অনুভব করতেন নিজের ভিতরে আর তা ছড়িয়ে দিতেন সবার মধ্যে। এমনিভাবে দিনের পর দিন জমে উঠত আড্ডা প্রতি বিকেলে, ছেদ পড়ত, শুধু নামাজের সময়, নামাজ কাযা করতেন না তিনি। যদি কেউ জিজ্ঞেস করত, 'ভয় করে না আপনার, নিরাপদ অনুভব করেন?' প্রশ্নকর্তা সাংবাদিক হলে উত্তর করতেন সিরাজুদ্দীন, 'তোমরা কত বৎসর সাংবাদিকতা কর?' এখনওতো তোমাদের রক্ত গরম, তোমরা এত ডরাও কেন?' এক একটা উৎসাহব্যঞ্জক সংবাদ এসে পৌঁছুলে তিনি তা' উল্লাস ভরে উদযাপন করতেন। একদিন টেলিভিশনের ক্যামেরাম্যান মুনি রহমানের সূত্রে খবর পাওয়া গেল যে, টিক্কা খান দিনাজপুরে গিয়ে খুব জব্দ হয়েছে, কথা ছিল টিক্কা ঠাকুরগাঁ না বীরগঞ্জ কোথায় সফরে যাবে, হেলিকপ্টারে করে দিনাজপুর পৌঁছে জানা গেল সেখানে যাওয়া যাবে না, নিরাপদ নয়। তখন হুকুম হল বিহারীদের বাস বোঝাই করে নিয়ে আসার, কিন্তু তিন বাস বিহারী আসবার পথে গ্রেনেড ফেটে হাসপাতালে চলে গেল। টিক্কা খান হাসপাতালে তাদের দেখতে গেল, আর কাগজে ছবি বের হল টিক্কা ভারতীয় গোলাবর্ষণে আহতদের হাসপাতালে দেখতে গেছে। ঢাকা ফেরার পথে আবার মধুপুর জঙ্গলের ওপরে তার হেলিকপ্টারে হামলা হল

এ খবর খুব উপভোগ করেন সিরাজুদ্দীন হোসেন, হৈ-চৈ করে উদযাপন করেন। পাকিস্তানীদের কাগজে যে সব পরস্পর বিরোধী বা স্ববিরোধী খবর থাকত তিনি সযত্নে তারও পর্যালোচনা করতেন। এভাবে কাটিয়ে ছিলেন ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি।

৩রা ডিসেম্বর থেকে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল, ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে বাচ্চাদের নিয়ে মহা আনন্দে বাড়ীর আঙ্গিনায় ট্রেঞ্চ কাটেন, বিমান হামলা হলে খুব উপভোগ করতেন, বাচ্চাদের বারান্দায় তুলে দিয়ে নিজে মাঠে দাঁড়িয়ে তা' পর্যবেক্ষণ করতেন আর প্রতিটি হামলার রানিং কমেন্ট্রি দিতেন। বিমান আক্রমণের সময় সিরাজুদ্দীন হোসেনকে যেমন উল্লসিত দেখা যেত তেমনটি আর কখনও দেখা যায়নি। কিন্তু এ আনন্দ পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারলো না। সিরাজুদ্দীন হোসেনের পরম আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার দিনটির মাত্র ছয়দিন আগে ১০ই ডিসেম্বর রাতে নর-পিশাচ আল-বদরের তিন-চারটি লোক এসে তাঁর দরজায় ধাক্কা দেয়, ছেলে দরজা খুলে দিলে তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে ধরে নিয়ে যায় সিরাজুদ্দীন হোসেনকে লুঙ্গি, গেঞ্জি পরা অবস্থাতেই, জামাও পরতে দেয়নি। বাড়ী থেকেই একটি গামছা নিয়ে চোখ বেঁধে চিরদিনের জন্য তারা তাদের এক নম্বর দুশমনকে নিয়ে যায়। আর কোন হদিস মেলেনি তাঁর এমনকি লাশও না।

সৈয়দ নজমুল হক

বর্বর পাকিস্তানীরা যখন বুঝতে পারল পরাজয় নিশ্চিত, আত্মসমার্পণ ছাড়া আর কোন উপায় নেই, তখন পশুরা তাদের শেষ আঘাত হানল বাঙালী জাতির উপর। শোচনীয় পরাজয়ের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য নিয়াজী, ফরমান আলী, বশির, হিজাজি তাদের পদলেহী বাঙালী বদরদের আদেশ দিল বাঙালী বুদ্ধিজীবী নিধন-পর্ব সমাপন করতে। তালিকা পূর্বেই প্রস্তুত হয়েছিল, যে তালিকা অতি সতর্কতার সঙ্গে বাঙালী বিশ্বস্ত দালালদের সাহায্যেই প্রণীত হয়েছিল। এই তালিকায় নাম সুরবরাহের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, বি. এন. আর. রেডিও পাকিস্তান, মেডিক্যাল কলেজ, প্রেস ক্লাব এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রে কার্যরত জামাতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্যরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে, বস্তুতঃ এরাই আল-বদর। বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক-ছাত্র, বি. এন. আরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, রেডিও পাকিস্তানের কর্মকর্তা, কবি ও স্ক্রীপ্ট লেখক বিভিন্ন সংবাদপত্রের সাংবাদিকরা আল-বদর হয়ে তাদেরই সহকর্মীদের নাম ও লুকিয়ে থাকার ঠিকানা না জানালে পশ্চিম পাকিস্তানীদের পক্ষে ঐ সময়ে বাঙালী বুদ্ধিজীবী খুঁজে বের করা কিছুতেই সম্ভব হত না। এ প্রসঙ্গে ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বেতার ও টেলিভিশনে প্রকাশ্যভাবে হাসান জামানের 'পাকিস্তান বিরোধী

বুদ্ধিজীবীদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলার' হুমকির কথা এবং সাজ্জাদ হোসেনের 'চীন ও আমেরিকাকে হস্তক্ষেপের' আহ্বান করার কথা স্মরণীয়।

আল-বদর সাংবাদিকেরা সম্ভবতঃ তাদের কালো তালিকায় সাংবাদিকদের মধ্যেও সিরাজুদ্দীন হোসেনের পরেই তদানীন্তন পি. পি. আই-এর চীফ রিপোর্টার সৈয়দ নজরুল হকের নাম রেখেছিল, আর তাই দশই ডিসেম্বর রাত্রি শেষ হয়ে যাবার আগে এবং সিরাজুদ্দীন হোসেনকে নিয়ে যাবার পরে সৈয়দ নজমুল হককেও তারা নিয়ে যায়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, সৈয়দ নজমুল হক কেন পাকিস্তানী নরপশুদের চক্ষুশূল হল? সে প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে ইতিহাসের পেছনে দৃষ্টি দিতে হবে, যে ইতিহাসের শুরু ষাট দশকের গোড়া থেকে। সৈয়দ নজমুল হক ষাট দশকের শুরুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, রাষ্ট্র বিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে পড়েছিলেন তিনি। তবে তাঁর বাংলায় সাবসিডিয়ারী ছিল, সেই সূত্রেই দশ বৎসর আগে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। সৈয়দ নজমুল হক আমার ছাত্র ছিলেন বাংলা সাবসিডিয়ারী ক্লাসে। সে ক্লাস দু'বছরে শেষ হয়ে গেলেও সৈয়দ নজমুল হকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়নি, সাবসিডিয়ারীর পরেও ঐ চঞ্চল অস্থির অথচ উজ্জ্বল ছাত্রটি বার বার এসেছেন আমার কাছে, এসেছেন ১৯৬৩ সালে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে এম.-এ পাস করে যাবার পরেও, নজমুল এসেছেন ১৯৭০ সালে সাংবাদিকতায় এম. এ. পড়ার সময়েও। পি. পি. আই.'র রিপোর্টার হিসেবে নজমুল যখনই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতেন তখনও একটি বারের জন্য আমার সঙ্গে দেখা করে যেতে ভুলতেন না। আমার আজও মনে পড়ে '৬২ সালের সেই আইয়ুব বিরোধী বিক্ষুব্ধ দিনগুলির কথা, যখন উত্তেজিত নজমুল ঘুরে ঘুরে আসত, ছটফট করত। আরও বিশেষ করে মনে পড়ে ১৯৬৪ সালে মোনায়েম খানের সেই

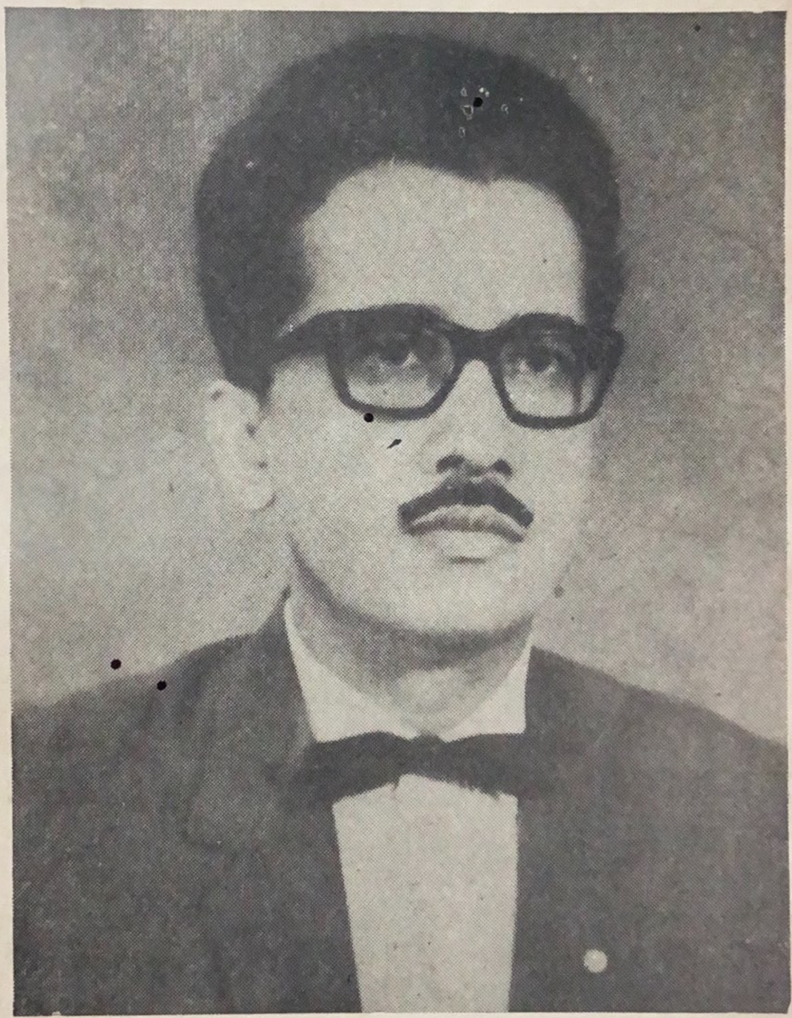

কনভোকেশনের কথা যে কনভোকেশন ছাত্ররা ভেঙে দিয়েছিল। নজমুল হককে কনভোকেশন প্যাণ্ডেলে সেদিন যেভাবে বিক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখেছিলাম তা আজও ভুলতে পারব না। ফল হয়েছিল এই সৈয়দ নজমুল হক এবং আরও উনিশজন ছাত্রকে মোনায়েম খান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাস্টিকেট করেছিল। সেদিন থেকেই পাকিস্তানী ঘাতকদের আর তার দালালদের কালো খাতায় নাম উঠেছিল সৈয়দ নজমুল হকের। সৈয়দ নজমুল হকের নাম সেদিনই পাকিস্তানী জল্লাদদের খাতায় বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল যেদিন আগরতলা মামলা উঠে যাওয়ার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান লণ্ডন সফরে যাবার সময়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন কেবলমাত্র সাংবাদিক হিসেবেই নয় বিশ্বস্ত সহচর হিসেবেও। নজমুল বিদেশে সে সময় ছায়ায় মত বঙ্গবন্ধুর সাথী ছিলেন, হোটেলে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে এক ঘরে থাকতেন নজমুল, খাবার এলে নিজে খেয়ে পরীক্ষা করে বঙ্গবন্ধুকে খেতে দিতেন। বঙ্গবন্ধু স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ নজমুলকে একটি পাইপ উপহার দিয়েছিলেন। '৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু ঢাকা রেসকোর্স মাঠে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ দেবার আগে তা যথাযথ রিপোর্ট করার জন্য নজমুলকে ডেকে নেন। ৫ই মার্চ দুপুরে বঙ্গবন্ধুর টেলিফোন পেয়ে নজমুল তাঁর কাছে চলে গিয়েছিলেন, আর ফিরলেন ৭ই মার্চ রাতে বক্তৃতার যথাযথ রিপোর্ট শেষ করে। তাই পিণ্ডির খাতায়ও নাম উঠল সাংবাদিক সৈয়দ নজমুল হকের।

বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষি দেওয়াতে বাধ্য করার জন্য সৈয়দ নজমুল হককে '৬১ সালের নয় মাসের মধ্যে দুবার পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়, সাড়ে তিনমাস পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানী কারাগারে অকথ্য নির্যাতন সত্ত্বেও পিণ্ডির সামরিকচক্র সৈয়দ নজমুল হককে দিয়ে শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষি দেওয়াতে সক্ষম

হয়নি। বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে মিলিটারী কোর্টে মামলা উঠলে নজমুলকে সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয়বার পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু পিণ্ডিচক্র ব্যর্থ হয় তাকে দিয়ে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে বানানো সাক্ষি দেওয়াতে। ফলে এক সপ্তাহের মধ্যেই তাকে ঢাকা ফেরত পাঠান হয় কিন্তু তার শাস্তিস্বরূপ স্থির করে রাখা হয় এক ভয়াবহ পরিণতি। নজমুল এই সময়ে যে সাহসের, যে মনোবলের পরিচয় দিয়েছিলেন আমাদের অনেক বাঙালীই তা করতে পারেননি, অনেকে প্রাণভয়ে শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষি দিয়ে এসেছিলেন কিন্তু নজমুল তা করেননি। তিনি তাঁর স্ত্রী সুলতানা নজমুলকে বলতেন, 'দেশ স্বাধীন হবেই, আমাকে মেরে ফেললেও আমি শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে পারব না, স্বাধীন বাংলার আমি আমার ছেলে-মেয়ের কাছে দালাল, বিশ্বাসঘাতক পিতা বলে পরিচিতি হতে পারব না।' নজমুল তাঁর সংকল্পে অটল ছিলেন তাই স্বাধীন বাংলায় অমর শহীদদের তালিকায় তাঁর নামটি উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে প্রতিদিন। শহীদ নজমুলের সন্তানেরা তাদের এই সাহসী পিতার জন্য গর্ব অনুভব করতে পারে।

শত উৎপীড়ন, শত ভীতি, শত প্রলোভনে পারেনি সাংবাদিক নজমুল হককে টলাতে। তাই ১০ই ডিসেম্বর রাত ৩-৩০ মিঃ-এ তাঁর ৯০ নং পুরানা পল্টনের বাসভন থেকে তাঁকে তাঁর স্ত্রী সন্তানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল পাক-বাহিনীর এক কর্নেলের নেতৃত্বে বাঙালী আর বিহারী নিয়ে গঠিত আল-বদরের একটি দল। যাদের পথ প্রদর্শক ছিল একটা বেঁটে বাঙালী আল-বদর, মাফলার দিয়ে যার মুখটা ঢাকা ছিল, হাতের টর্চটা ফোকাস করে যে পরিষ্কার বাংলায় নজমুলকে সনাক্ত করে দিয়েছিল কর্নেল সাহেবের কাছে। কর্নেল যে নজমুলকে বলেছিল, 'শালে আভি তুযে কোন বাচায় গা ?' এ প্রশ্ন তো শুধু কর্নেলের নয়, প্রশ্ন ছিল পিণ্ডির সামরিক চক্রের

যারা তাকে শেখের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়াতে পারেনি। তাই সৈয়দ নজমুল হককে ঐ জল্লাদরা বাঁচতে দিল না, দেখতে দিল না স্বাধীনতার সূর্য, স্বাধীন বাংলার পতাকার জন্য যে কাপড় কিনে রেখেছিলেন সে পতাকা তিনি মুক্ত দেশে উত্তোলন করতে পারলেন না। কিন্তু নিশ্ছদ্র অন্ধকারে নিয়ে গেল তাকে অন্ধকারের জীবেরা যাবার সময় যে সুলতানা নজমুল তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'দীপ্তির আব্বা' তুমি কোথায় যাচ্ছ, সে প্রশ্নের উত্তর আজও মেলেনি। সে প্রশ্ন, শত, সহস্র, লক্ষ শহীদের পিতা, পুত্র, মাতা, কন্যা, স্ত্রী, ভ্রাতা, ভগ্নীর এ প্রশ্নের উত্তর কে দেবে? ঐ অন্ধকারের জীবদের কে ক্ষমা করবে। কেন ক্ষমা করবে? এ প্রশ্নই আজ সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে।

নিজামুদ্দীন আহমেদ

হানাদার কবলিত বাংলাদেশে সাড়ে ছয় কোটি অবরুদ্ধ মানুষ নয়টি মাস রুদ্ধশ্বাসে কয়েকটি বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনত। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, আকাশবাণী আর বি. বি. সি'র অনুষ্ঠান মালা তাদের প্রাণে আশার সঞ্চার করত, উদ্দীপিত করত, তাদের বাঁচিয়ে রাখত। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সংবাদ সংগৃহীত হত মুক্তিবাহিনী সূত্র থেকে, আকাশবাণীর সংবাদ সূত্র ছিল সীমান্ত অঞ্চল কিন্তু বি. বি. সি'র অনুষ্ঠানে এমন কিছু সংবাদ পরিবেশিত হত যা হানাদার কবলিত বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকে প্রেরিত। হানাদার কবলিত বাংলাদেশের ভেতর থেকে কড়া সামরিক সেন্সরের মধ্য দিয়ে এসব সংবাদ প্রেরণ বস্তুতঃপক্ষে অসম্ভব ছিল। অথচ নিয়মিত ঐ সব সংবাদ প্রেরিত হত যে সংবাদ আর অন্য কোন সূত্রে প্রেরণ সম্ভবপর ছিল না। আর এই সব সংবাদের অভিনবত্ব ছিল এই যে এই সংবাদগুলো সাধারণতঃ দেশের অভ্যন্তরে অনুষ্ঠিত হানাদার বাহিনীর বিভিন্ন অপারেশান সম্পর্কিত ঘটনার বিবৃতিমূলক হত। ফলে সহজেই বোঝা যেত দেশের ভেতরে কোন কোন স্থানে মুক্তিবাহিনী সক্রিয় ও তৎপর বা কোনখানে হানাদার বাহিনীর সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর সংঘর্ষ হচ্ছে, তাতে আরও বোঝা যেত যে, দেশের মধ্যে কোথায় কোথায় মুক্তাঞ্চল আছে। হানাদার কবলিত বাংলাদেশে বসে

পাক-বাহিনীর কড়া সেন্সরশীপের মধ্য দিয়ে কৌশলে এই তথ্যগুলো যিনি বহির্বিশ্বে সরবরাহ করতেন তিনি বি. বি. সি. এ্যাসোসিয়েট প্রেস অব আমেরিকা এবং ইউ. পি. আই-র ঢাকাস্থ সংবাদদাতা, পি. পি. আই. সম্পাদক নিজামুদ্দীন আহমেদ।

নিজামুদ্দীন আহমেদ প্রমাণ করেছেন বুদ্ধি ও সাহস থাকলে একজন সৎ সাংবাদিক অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও কি করে যথার্থ সংবাদ পরিবেশন করতে পারেন। হানাদার কবলিত ঢাকা শহরে সমস্ত সংবাদপত্রগুলো যখন সামরিক বুলেটিনে পরিণত হয়েছিল বহু সাংবাদিক যখন ভয়ে নামে-বেনামে বেতার ও টেলিভিশনে সামরিক বাহিনীর মুখপত্ররূপে কাজ করছিলেন, কেউ কেউ যখন আবার পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে আসছিলেন ঠিক সেই সময়ে নিজামুদ্দীন আহমেদ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়মিত বি. বি. সি. এবং অন্যান্য বিদেশী মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যে সব ঘটনা ঘটছিল সে সব সংবাদ পরিবেশন করে যাচ্ছিলেন। ফলে, ফরমান আলীর দফতরে তাকে দুবার ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়, ভয় দেখান হয়, কিন্তু নিজামুদ্দীন আহমেদ তার কাজে অবিচল ছিলেন। ঐ সব ভয়-ভীতির পরেও নিজামুদ্দীন যথারীতি মুক্তিবাহিনীর মুন্সিগঞ্জ দখলের সংবাদ বি. বি. সি-তে পাঠিয়েছিলেন। বি. বি. সি. থেকে এই সংবাদ প্রচারিত হওয়া মাত্র জেনারেল ফরমান আলী টেলিফোন যোগে নিজামুদ্দীনকে শাসন করে। সঙ্গে সঙ্গে ফরমান আলীর টেবিলে বিশেষভাবে অংকিত হয়ে যায় নামটি পাশে লেখা থাকে 'উদ্দেশ্যমূলক সংবাদ' এবং একটি বিশেষ চিহ্ন। বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশ সম্পর্কে সঠিক সংবাদ পরিবেশনের অপরাধে ফরমান আলী ঐ বিশেষ চিহ্নটি দ্বারা নিজামুদ্দীনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির নির্দেশ দিয়েছিল আর তাই একাত্তরের বারই ডিসেম্বর দুপুর বেলা ফরমান আলীর প্রভুভক্ত কুকুর বাঙালী

আল-বদরেরা নিজামুদ্দীনকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল তার স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্য থেকে, তাকে মধ্যাহ্ন ভোজ সমাপন করতেও দিল না। তারপরে আর ঐ অসম সাহসী সাংবাদিকের কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

আ· ন· ম· গোলাম মোস্তফা

গোলাম মোস্তফা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র। এ বিভাগ থেকেই কয়েক বছর আগে তিনি বাংলায় এম-এ ডিগ্রী লাভ করেন। বিভাগে ছাত্র থাকতেই তিনি তাঁর সাংবাদিকতা জীবন শুরু করেন আর ছাত্র জীবনের শেষে তিনি সাংবাদিকতাকেই গ্রহণ করেন সার্বক্ষণিক পেশা রূপে। গোলাম মোস্তফা আমার ছাত্র ছিলেন, আমার আজও মনে পড়ে দিনাজপুর থেকে আগত নম্র, বিনয়ী, সপ্রতিভ, সদাহাস্যময় গোলাম মোস্তফার কথা। বিভাগে চার বছর গোলাম মোস্তফা তাঁর মধুর স্বভাবের জন্যে বিভাগের ছাত্র-শিক্ষক সবার মন জয় করে রেখেছিলেন। যখনই গোলাম মোস্তফার কথা মনে পড়ে তখনই তাঁর সেই হাসিমুখটির কথা মনে পড়ে। আমার কাছে সে মুখটি চিরঅম্লান, চির ভাস্বর। বিভাগ ছেড়ে যাবার পরেও গোলাম মোস্তফার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়নি, যখনই দেখা হয়েছে হাসিমুখে আপ্যায়ন করেছেন গোলাম মোস্তফা, মনটা ভরে উঠেছে। সাংবাদিক জীবনের পাশাপাশি সাহিত্যিক জীবনও গোলাম মোস্তফা যাপন করেছেন, যখনই তাঁর কোন লেখা চোখে পড়ত মন দিয়ে পড়তে চেষ্টা করতাম বিশেষতঃ নাটক। দেখা হলে ওর নাটকের কথা স্মিতহাস্যে জিজ্ঞেস করতে ভুলতেন না। তিনি জানতেন নাটকের সঙ্গে আমার

বিশেষ যোগাযোগের কথা তাই হয়তো। তাঁর নাটকের অভিনয় দেখতে যাওয়ার জন্যেও এসে বলে যেতেন। পরে এসে আবার জিজ্ঞেস করতেন গিয়েছিলাম কি-না। সেই সতেজ, তরুণ, প্রাণবন্ত গোলাম মোস্তফাকে যে কেউ ধরে নিয়ে পৈশাচিকভাবে হত্যা করতে পারে ভাবতে পারি না। সেদিন যখন গোলাম মোস্তফার বিধবা স্ত্রী আমাদের বিভাগে ভর্তি হতে এসেছিলেন (বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির নিয়ম-কানুনের অজুহাতে তাঁকে ভর্তি করেনি, তদুপরি তাকে তার স্বামীর ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে বলে দিয়েছিল)। তখন আমার বার বার মনে হচ্ছিল সঙ্গে বুঝি আমি গোলাম মোস্তফাকে দেখতে পাচ্ছি, ওর স্ত্রীকে বাংলা বিভাগে ভর্তি করতে পারলে বুঝি ও কত খুশী হত, ওর হাসিমাখা মুখটি বারবার ওর স্ত্রীর পাশে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম।

সাংবাদিক, সাহিত্যিক গোলাম মোস্তফা, দুর্ভাগ্য যে তিনি 'পূর্বদেশ' পত্রিকায় আল-বদর অধিনায়ক চৌধুরী মঈনউদ্দীনের পাশের টেবিলেই বসতেন। মঈনউদ্দীনও বাংলা বিভাগের ছাত্র ছিল, এমন ছাত্ররাই না মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, আনোয়ার পাশাকে 'স্যার' সম্বোধন করে বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়েছিল। যে ছাত্ররা নিজ হাতে আপন শিক্ষকদের খুন করতে পারে, সহযোগী সহকর্মীকে তারা কেন পারবে না বধ করতে, নিশ্চিহ্ন করে দিতে পৃথিবী থেকে? জামাতে ইসলামী, ইসলামী ছাত্র সংঘ, রাজাকার, আল-শামস, আর আল-বদর সাংবাদিকদের মধ্যেও ছিল আর তারা শুধু দৈনিক 'সংগ্রাম' পত্রিকাতেই ভিড় করে ছিল না, তারা ছড়িয়ে গিয়েছিল সব কাগজে। সব সাংবাদিকদের চিন্তা, মতাদর্শ তারা ভাল করেই জানত, তাই তালিকাও প্রস্তুত হয়েছিল নির্ভুল এবং নিখুঁত আর সেই তালিকা যথারীতি তাদের পশ্চিম পাকিস্তানী প্রভুদের অনুমোদনও লাভ করেছিল। সাংবাদিক নিধন শুরু হয়েছিল

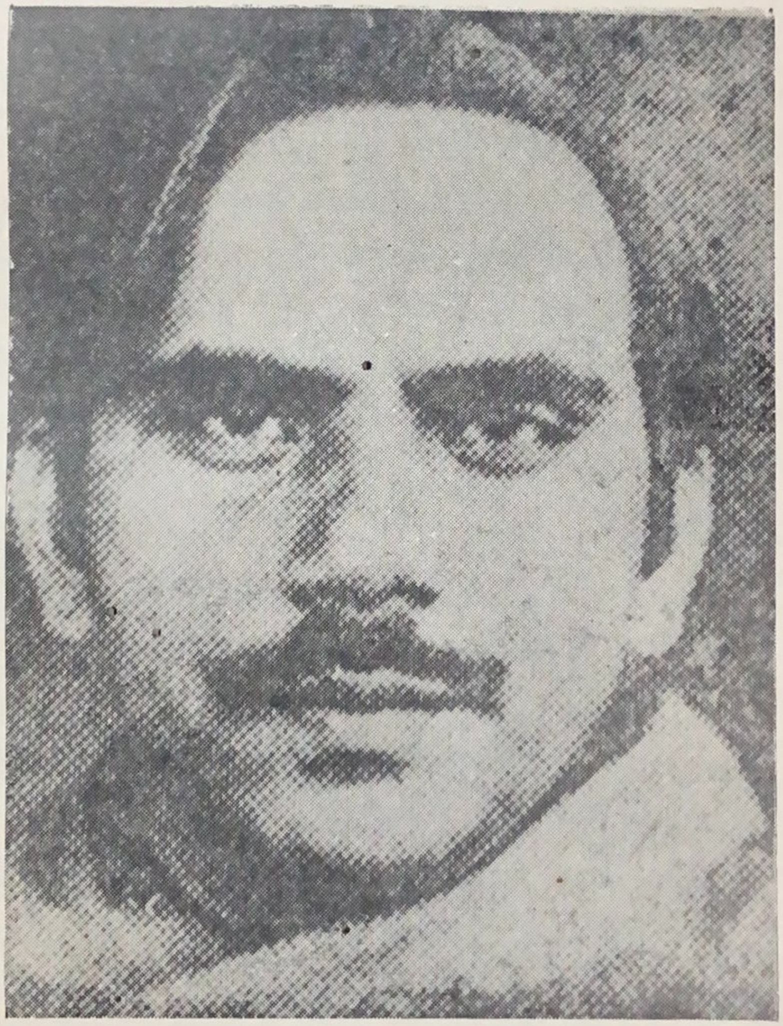

১০ই ডিসেম্বর থেকে, কিন্তু গোলাম মোস্তফার পরিবর্তিত ঠিকানা ঘটনাচক্রে রাজাকার আল-বদরেরা পূর্বাহ্নেই জেনে ফেলেছিল। গোলাম মোস্তফা ৮ই ডিসেম্বরে ছিলেন রায়েরবাজারে তাঁর শ্বশুর বাড়ীতে, কিন্তু তিনি জানতেন না উল্টো দিকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত দালাল অধ্যাপিকা ডক্টর ফাতেমা সাদেকের বাড়ী আর সেই বাড়ী তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন আল-বদর বাহিনীকে ক্যাম্প করার জন্য। কুখ্যাত আল-বদর কমাণ্ডার আসাদুজ্জামান ৮ই ডিসেম্বর তারিখে তিনজন রাজাকারসহ গোলাম মোস্তফার শ্বশুর বাড়ীতে হানা দেয়। সেইদিনই সে গোলাম মোস্তফাকে তার আইডেনটিটি কার্ড থেকে চিনে নেয়, কর্তব্যও বোধহয় স্থির করে ফেলে। ৯ তারিখে একজন বৃদ্ধ রাজাকার এসে সতর্ক করে দিলে গোলাম মোস্তফা রায়েরবাজার ছেড়ে গোপীবাগের বাসায় ফিরে যায়। ১১ তারিখ খুব ভোরে আল-বদরেরা আবার ফিরে আসে রায়েরবাজারের বাড়ীতে, এবারে তারা এসেছিল ছয়জন, তাদের মধ্যে আগের তিনজনও ছিল। সেখানে গোলাম মোস্তফাকে না পেয়ে তার এক আত্মীয়কে বন্দুক ধরে বাধ্য করে গোলাম মোস্তফার গোপীবাগের বাড়ীতে নিয়ে যেতে।

১০ই ডিসেম্বর সমস্ত রাত্রি গোলাম মোস্তফার শিশু সন্তান অভি ঘুমোয়নি, কেবল কেঁদেছে তাই ১১ তারিখ খুব সকালে উঠে মোস্তফা অভিকে কোলে করে বাড়ীর কাছে রাস্তায় পায়চারী করছিলেন। সেই সময় যমদূতেরা তাঁকে গিয়ে ধরে ফেলে, বন্দুক ধরে বাচ্চাটিকে বাড়ীতে নামিয়ে দিতে বাধ্য করে তারপর লুঙ্গি-কাপড় পরা অবস্থাতেই তুলে নিয়ে যায়। এ ভাবেই ১১ই ডিসেম্বর সকালে গোলাম মোস্তফাকে আল-বদরের পিশাচেরা তাঁর শিশুপুত্র থেকে চিরদিনের জন্যে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, অভিকে গোলাম মোস্তফা আর কোন দিন শান্ত করতে পারবেন না, আদর করতে পারবেন না, কোলে

নিতে পারবেন না। যেমন পারবেন না, সিরাজুদ্দীন হোসেন, নিজামুদ্দীন আমহদ, সৈয়দ নজমুল হক যাঁদের আগের রাতেই জল্লাদেরা নিয়ে গিয়েছিল যাঁদের কোন চিহ্ন আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

উল্লেখযোগ্য যে, ১০ই ডিসেম্বর 'পূর্বদেশ' অফিসে চৌধুরী মঈনুদ্দীনের সঙ্গে গোলাম মোস্তফার কথা কাটাকাটি হয়। বিষয় ছিল যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কথা বলেছিলেন গোলাম মোস্তফা। ১১ই ডিসেম্বর সকালে গোলাম মোস্তফাকে নিয়ে যাবার পর তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুলু ছুটে গিয়েছিল চৌধুরী মঈনুদ্দীনের কাছেই, অনুনয় করেছিল গোলাম মোস্তফার খোঁজ নিতে। খোঁজ নাকি সে নিয়েছিল আর বলেছিল ৩ টার সময় ফিরে আসবে, সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেছিল 'আসাদুজ্জামান নামে কোন কমাণ্ডার নেই।' বলাবাহুল্য যে ৩ টার সময় গোলাম মোস্তফা ফিরে আসেনি, ৩টা থেকে আবার কারফিউ শুরু হয়ে যায়, যে কারফিউর আড়ালে নিরবছিন্নভাবে চলল বুদ্ধিজীবী হরণ আর হননের পৈশাচিক অভিযান।

গোলাম মোস্তফা ফিরে আসেননি ফিরে আসেননি সৈয়দ নজমুল হক, নিজামুদ্দীন আহমদ, ফিরে আসেননি সিরাজুদ্দীন হোসেন এমনকি তাঁদের মৃতদেহও নয়। কিন্তু চৌধুরী মঈনুদ্দীন আসাদুজ্জামান এই নরকের কীটরা কোথায় গেল? মঈনুদ্দীন নাকি পশ্চিম পাকিস্তানে। প্রশ্ন হল, এরা কি করে পালাতে পারল? কাদের সাহায্যে? স্বাধীন বাংলাদেশে যে বাঙালীরা সামান্য লাভের জন্যে, সামান্য অর্থের বিনিময়ে আল-বদরের খুনীদের আশ্রয় দিয়েছে, লুকিয়ে রেখেছে, পালিয়ে যেতে সহায়তা করেছে, বন্ধুত্ব বা আত্মীয়তার সুবাদে খুনীদের নিরাপত্তা বিধান করেছে তারাও আল-বদর খুনীদের অপরাধে সমান অপরাধী তাদের হাতও রক্তমাখা। অনেক খুনী এখনও আমাদের সমাজে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, প্রভাব

প্রতিপত্তিশালীদের ছত্র ছায়ায় নিরাপদে জীবন-যাপন করছে। আমাদের সমাজ এই খুনীদের শাস্তি বিধানের ব্যাপারে যে চরম ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেছে তার মূল্য একদিন এই সমাজকে দিতেই হবে। আল-বদরকে ক্ষমা করার পরিণতিতে সমস্ত সমাজ, সমগ্র দেশ আল-বদরের শিকারে পরিণত হবে একদিন।

সেলিনা পারভিন

নোয়াখালীর মেয়ে সেলিনা পারভিন আজন্ম স্বাধীনচেতা। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর চরিত্রে এমন একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট ছিল যা সচরাচর আমাদের এই রক্ষণশীল সমাজে দেখা যায় না। ফলে, আজন্ম প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছে সেলিনা পারভিনকে। ইচ্ছে ছিল উচ্চশিক্ষা লাভ করবেন, কিন্তু সে সাধ পূর্ণ হয়নি—বিয়ে হয়ে গিয়েছিল অল্প বয়সে, কিন্তু ইচ্ছের বিরুদ্ধে এই বন্ধন মেনে নেননি তিনি, নিজেকে বন্ধনমুক্ত করে নিয়েছিলেন অচিরেই। ঘরে বসেই লেখা-পড়া শুরু করেছিলেন„ তার প্রবণতা ছিল সাহিত্যে, তাই ছেলেবেলা থেকেই সাহিত্য পাঠ এবং সাহিত্য চর্চাই তাঁর জীবনের প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠেছিল। কবিতা লিখতেন কিশোর বয়স থেকেই তা ছাড়া আবৃত্তি, ছবি আঁকা, নাচ-গান অর্থাৎ সুকুমার শিল্প সাধনায় ঐ বয়স থেকেই যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখান তিনি। কিন্তু ফেনীর মতো শহরে আমাদের গোঁড়া সমাজে এ আনন্দময় জীবন-যাপন সম্ভব নয় তাই তাঁকে আবার বিয়ে দেওয়া হয়; কিন্তু এবারেও তা স্থায়ী ও সুখের হয়নি। বাকী জীবন পুত্র সুমনকে নিয়ে একাকী পথ চলেছেন তিনি, স্বাধীন জীবন-যাপন করেছেন সাহিত্য আর সাংবাদিকতা পেশা হিসেবে গ্রহণ করে।

আমাদের দেশে শুধু মফঃস্বলেই নয়— ঢাকা শহরেও সেলিনা

পারভিনের মতো স্বাধীনচেতা মহিলার পক্ষে শান্তিময় জীবন-যাপন অসম্ভব, একদিকে সমাজের গোঁড়ামি, রক্ষণশীলতা ও ধর্মান্ধতা অপরদিকে সামাজিক নিরাপত্তার অভাব প্রতি মুহূর্তে জীবনের স্বাভাবিকতাকে ক্ষুণ্ণ করে, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধকে সংকুচিত করে। সমাজের এ মানসিকতা থেকেই আল-বদরের সৃষ্টি, বস্তুতঃ 'আল-বদর' বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয় একটি উগ্র বিকৃত মানসিকতার পরিণতি, যে মানসিকতা আমাদের সমাজে দীর্ঘ দিন ধরে লালিত-পালিত ও বর্ধিত। সেলিনা পারভিনের মতো স্বাধীনচেতা মহিলার নাম আল-বদরের তালিকায় উঠবে তাতে আর আশ্চর্য কি? অথচ সেলিনা পারভিন রাজনীতি করতেন না, করতেন সাংবাদিকতা তাও মেয়েদের কাগজে 'ললনা'য়, যার কোন রকম রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী নেই, অথবা 'শিলালিপি' যার প্রকাশ ছিল অনিয়মিত, যে 'শিলালিপি' নিয়মিত প্রকাশের জন্যে সেলিনা পারভিনের চেষ্টার অন্ত ছিল না।

কিন্তু সেলিনা পারভিন যে জীবন-যাপন করতেন ধর্মান্ধ গোঁড়াদের কাছে সেইটেও মস্তবড় অপরাধ। অন্তরীণাবদ্ধ সতীন কন্টকাকীর্ণ লম্পট স্বামীর দাসী জীবন যে সমাজে নারীর স্বাভাবিক ধর্ম বলে বিবেচিত সেই সমাজে সেলিনা পারভিনের মতো কবি ও শিল্পীর স্থান কোথায়? সেলিনা পারভিনের সবচেয়ে বড় অপরাধ ছিল তিনি সুন্দরের সাধক ছিলেন, সৌন্দর্য সাধনায় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাই একাত্তরের চৌদ্দই ডিসেম্বর দুপুর বেলায় তার মগবাজারের বাসভবনে আল বদরের ঘৃণ্য মূর্তিগুলির আগমন ঘটেছিল। সেলিনা পারভিন তখন একটি উপন্যাস রচনায় মেতে ছিলেন, সাত আটজন জল্লাদ এসেছিল তার মধ্যে তিন চারজন কসাই এসে ঘরে ঢুকল। বলল, 'আপনাকে গভর্ণর হাউসে যেতে হবে', সঙ্গে যে ভাইটা থাকত সেও সঙ্গে যেতে চাইল, কিন্তু ওরা যেতে দিল না। যাবার সময় তিনি বলে গেলেন 'সুমনকে দেখিস'।

সেলিনা পারভিনকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল জানা যায়নি, গভর্ণর হাউসে না মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল ট্রেনিং কলেজ মিলিটারি ক্যাম্পে। তবে ১৬ই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হবার পর তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায় রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে। সেলিনা পারভিনের প্রিয় রং ছিল সাদা রং, শুভ্রতার প্রতীক, সৌন্দর্যের প্রতীক। মৃত্যুর সময়েও তাঁর পরনে ছিল বুটিদার সাদা জামদানী, সাদা জামা, সাদা মোজা, সাদা জুতো। শীতকালে মোজা পরতেন তিনি। শ্বেত শুভ্রতার প্রতীক সেলিনা পারভিন তাই সুন্দরের শত্রুরা তাকে বাঁচতে দিল না।

ডক্টর আমিনউদ্দীন

ধর্মান্ধতা আমাদের সমাজে এমন ভাবে ছড়িয়ে রয়েছে যে কোন প্রতিষ্ঠানই তার হাত থেকে রেহাই পায়নি, কেবল মাত্র জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা বা মাদ্রাসাগুলোতেই নয়— প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই ছিল জামাতে ইসলামী, ইসলামী ছাত্র সংঘের চর। মুক্তি সংগ্রামের সময় পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সবচেয়ে বড় দোসর ছিল ঐ সব লোক আর সে কারণেই এদেশে রাতারাতি সশস্ত্র ফ্যাসিস্ট প্রতিষ্ঠান আল-বদর বা রাজাকার গড়ে উঠতে পেরেছিল। বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রও বাদ পড়েনি ওদের ছোবল থেকে। পাকিস্তান কাউন্সিল অব সায়েন্টিফি অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল রিসার্চ, ঢাকা কেন্দ্র যা আমাদের কাছে 'সায়েন্স লেবরেটরী' নামে পরিচিত, ছিল জামাতে ইসলামীর এক আখড়া। ওখানে এমনও বিশ্বস্ত বাঙালী জামাত কর্মী ছিলেন যিনি ঐ সময়ে বদলী হয়ে করাচী যাবার আগে তালিকা প্রস্তুত করে দিয়ে যান যে, কোন্ কোন্ বিজ্ঞানী মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল আর সে কারণেই সায়েন্স লেবরেটরীর একাধিক বিজ্ঞানী আল-বদরের শিকার হন।

সায়েন্স লেবরেটরীর অন্যতম শহীদ বিজ্ঞানী ডক্টর আমিনউদ্দীন বীরভূমের ছেলে। তিনি যখন ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র তখন এ দেশে আসেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাসায়ন শাস্ত্রে এম. এস-সি এবং লণ্ডন

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি. লাভ করেন। সায়েন্স লেবরেটরীতে কাজ করেছিলেন ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দ থেকে। ডক্টর আমিনউদ্দীন সায়েন্স লেবরেটরীর সহ-বিজ্ঞানীদের সংঘবদ্ধ জীবন-যাত্রায় উৎসাহী ছিলেন, সহকর্মীদের কেউ কেউ যখন জামাত আর তবলীগ করতে তখন তিনি করতেন ক্লাব, সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তিনি ক্লাবের। মুক্তি সংগ্রামের সময় সহকর্মী জামাতীরা যখন পাক-বাহিনীর দালালি করত তখন তিনি চাঁদা সংগ্রহ করে মুক্তিবাহিনীকে দিতেন। ডক্টর আমিনউদ্দীন যে সহকর্মী জামাতীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে পাক-বাহিনীর দালালি করেননি আবার তিনি যে মুক্তি যোদ্ধাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন সে কারণেই ১৪ই ডিসেম্বর সকালে কার্ফুর মধ্যে আল-বদরেরা তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল তার স্ত্রী সুরাইয়া আর চারমাসের ছেলে আয়ানের কাছ থেকে। একটি খোলা জীপগাড়ী করে ওরা এসেছিল ছয়জন আল্-বদর, তারা সবাই বাঙালী। তাদের মধ্যে একজন ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র, মোহসিন হলে থাকত সে। জীপ চালকটিকেও চেনা গিয়েছিল, ডক্টর আমিনউদ্দীনের জনৈক আত্মীয় ঐ জীপ চালককে ঢাকা জেলে গিয়ে সনাক্ত করেছিলেন তবে এখনও তার বিরুদ্ধে কোন মামলা আদালতে ওঠেনি। ডক্টর আমিনউদ্দীনকে নিয়ে যাওয়ার সময় আল-বদরেরা সায়েন্স লেবরেটরীর একজন কর্মচারী মোহসিনুল হককেও নিয়ে গিয়েছিল, তার স্ত্রী কান্নাকাটি করলে তিনি নাকি বলেছিলেন যে, ওরা ভূল করে নিয়ে যাচ্ছে পরদিন সকালে ছেড়ে দেবে। সত্যি সত্যি মোহসিনুল হককে পরদিন সকালে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, তিনি ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু ফিরে আসেননি ডক্টর আমিনউদ্দীন বা ডক্টর সিদ্দিক আহমদ বা জনাব শামসুল আলম।

ডক্টর আমিনউদ্দীন বা তার মতো আরও যে সব বাঙালী বুদ্ধিজীবী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাদেরই সহকর্মীদের জন্যে আল-বদরের শিকার

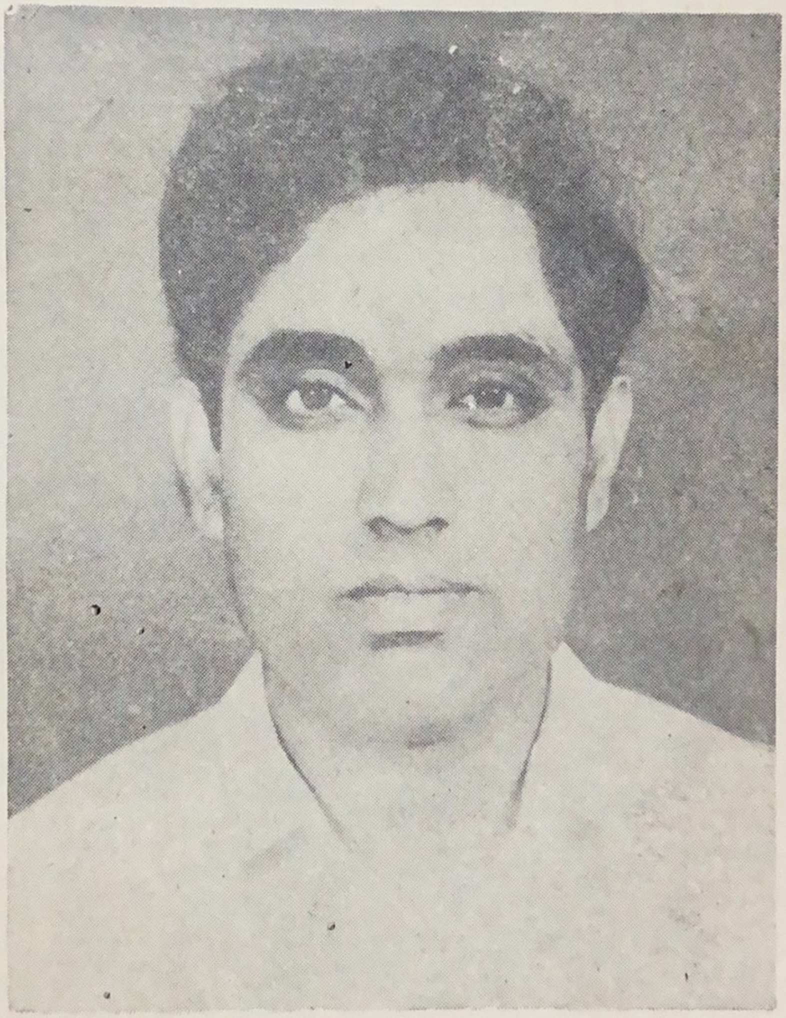

হয়েছিলেন সেই সব প্রতিষ্ঠানে ঐ সব জামাতপন্থীরা এখনও বহাল-তবিয়তে বিচরণ করছে। যে সব খুনীরা পশ্চিম পাকিস্তানে পালিয়ে গিয়েছিল তারা এখন আবার পাকিস্তান প্রত্যাগত বাঙালী হয়ে ফিরে আসছে বাংলাদেশে, তাদের পুনর্বাসনও হয়ে যাচ্ছে যথারীতি। তারা বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের তালিকা করে দিয়েছিল ফরমান আলীকে, আল-বদরদের, কিন্তু তাদের তালিকা আজ পর্যন্ত প্রণীত হল না বাংলাদেশে!

ডক্টর সিদ্দিক আহমদ

ঢাকা সায়েন্স লেবরেটরীর অন্যতম বিজ্ঞানী ডক্টর সিদ্দিক আহমদ। মার্চ মাসে অসহযোগ আন্দোলনের সময় সায়েন্স লেবরেটরী থেকে তিনিই প্রতিবাদ মিছিল সংগঠন করেছিলেন আর সেদিনই তাঁর সহকর্মী জামাতপন্থীরা ডক্টর সিদ্দিক আহমদকে চিনে নিয়েছিল। ডক্টর সিদ্দিক আহমদ কিন্তু ইচ্ছে করলেই ২৫শে মার্চের পরে ঢাকা ছেড়ে বিদেশে চলে যেতে পারতেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন সুইডেনের মেয়ে সুতরাং ২৫শে মার্চের পরে যখন সমস্ত বিদেশী এবং তাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের পাক সামরিক কর্তৃপক্ষ বিদেশে চলে যেতে দিয়েছিল তখন তিনি স্ত্রী ফাতেমা এবং ছেলে ওমরকে নিয়ে স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারতেন, টিকেটও প্রেরিত হয়েছিল সুইডেন থেকে কিন্তু ডক্টর সিদ্দিক আহমদ দেশ ছাড়েননি, সুযোগ পেয়েও না, স্ত্রী পুত্র নিয়ে জামাতী সহকর্মী পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি থেকে গেলেন সায়েন্স লেবরেটরী কলোনীতে। তিনি দেশ ছাড়তে চাননি, তিনি দেশে থেকে মুক্তি সংগ্রামের পরিণতি প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন, স্বাধীনতা সূর্যের উদয় তিনি দেখতে চেয়েছিলেন স্বদেশের মাটিতে আর সে জন্যে চরম মূল্য দিতে হল তাঁকে।

ডক্টর সিদ্দিক আহমদ নোয়াখালীর মানুষ, তিনি এক বিদেশিনীকে বিবাহ করেছিলেন, তাঁর স্ত্রী স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্মও গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু কোন ধর্মীয় গোঁড়ামী কোনদিন ডক্টর আহমদকে স্পর্শ করতে

পারেনি তাই সহকর্মী তবলীগ জামাতীরা তাকে তাদের দলে যোগ দিতে পীড়াপীড়ি করলে তিনি বলেছিলেন, 'দেখুন আমিতো একজনকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছি কিন্তু আপনাদের কাণ্ড-কারখানা দেখে তিনি এখন এ ধর্ম পরিত্যাগ করার কথা ভাবছেন।' ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস, ডক্টর সিদ্দিক আহমদকে আল-বদরেরা বেঁচে থাকতে দিল না ফলে তাঁর স্ত্রীকেও ফিরে যেতে হল সুইডেনে, তিনি এখন কোন ধর্মাবলম্বী তা আমরা জানি না, কিন্তু এই নব দীক্ষিতা এদেশে, এ সমাজে ধর্মের নামে যে উগ্র অসহনশীলতা ও ক্রুর নিষ্ঠুরতা দেখে গেলেন, তার তুলনা কোথায়? তিনি স্বামীকে ভালবেসে এ দেশকেও ভালবেসেছিলেন, তিনি এ দেশে চিরদিন থাকতে চেয়েছিলেন অথচ তার প্রিয় স্বামীকে ১৪ই ডিসেম্বর দুপুর বেলা আল-বদরেরা ছিনিয়ে নিয়ে গেল তার কাছ থেকে, তার পুত্র ওমরের কাছ থেকে তারপরেও এদেশে তিনি কি করে থাকতে পারেন? তাই তিনি ফিরে গেছেন সুইডেনে সঙ্গে নিয়ে গেছেন ওমরকে আর এক মর্মান্তিক রক্তাক্ত স্মৃতি।

আমরা মনে করে থাকি যারা বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী তাদের চিন্তাধারা, ধ্যান ধারণা, ক্রিয়া কর্ম সবই বুঝি বিজ্ঞান সম্মত, আধুনিক আর যুক্তিবাদী কিন্তু এ দেশের দুর্ভাগ্য এই যে, তুলনামূলক-ভাবে আমাদের বিজ্ঞানী আর প্রকৌশলীদের মধ্যে রক্ষণশীলতা আর প্রথাবদ্ধতা বেশী, আর সে কারণেই বোধহয় বিজ্ঞান গবেষণার প্রধান কেন্দ্রে জামাতপন্থীদেরও ভীড় ছিল বেশী, সে জন্যেই আল-বদরের তালিকায় নাম উঠেছিল ডক্টর সিদ্দিক আহমদ, ডক্টর আমিনউদ্দীন আর জনাব শামসুল আলমের। রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্করহিত বিজ্ঞান গবেষকরাও তাই রেহাই পায়নি চরম দক্ষিণপন্থী ফ্যাসিস্টদের মরণ ছোবল থেকে। দেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু বিজ্ঞান কেন্দ্রগুলো কি ঐ ফ্যাসিস্টদের হাত থেকে মুক্ত হয়েছে?

ডক্টর আবুল কালাম আজাদ

ডক্টর আজাদের ডাক নাম ছিল অটো। অটো আমার বাল্যবন্ধু। ১৯৩৮—৩৯ সালের দিকে আমরা ফরিদপুর জেলার রাজবাড়ী-কালুখালী লাইনে নলিয়াগ্রাম নামে ছোট্ট একটা রেলওয়ে ষ্টেশনে আমাদের শৈশব অতিক্রম করি। নলিয়াগ্রাম রেলওয়ে ডিসপেনসারিতে আমার এবং অটোর উভয়ের আব্বা কাজ করতেন। আজাদ আমার চেয়ে বয়সে সামান্য কিছু বড় ছিল কিন্তু আমাদের লেখাপড়া শুরু হয় একই সঙ্গে, আমাদের দু'জনের একই সঙ্গে হাতে খড়ি হয়েছিল। আজাদ বরাবরই লেখা পড়ায় খুব ভাল ছিল, পড়াশুনায় সে ছিল খুব দ্রুত। আজাদ এবং আমার আব্বার রেলওয়ের চাকুরী, ঘন ঘন বদলী হতেন ওরা, ফলে ১৯৪০ সালের দিকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই তারপরে বহুবছর আর আজাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। আবার দেখা হল ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, আজাদ তখন অংকের ছাত্র আর আমি বাংলার। আজাদের ক্লাস কার্জন হলে আর আমার মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন পুরাতন কলা ভবনে। আজাদের সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ স্থাপিত হবার পর থেকে সে সম্পর্ক বজায় ছিল বরাবর। ছাত্র জীবন শেষে আজাদ যেখানেই থাকুক না কেন সে বিমান বাহিনীতেই হোক বা সরকারী কলেজেই হোক অথবা উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশেই হোক আজাদ ঢাকায় এলে আমার সঙ্গে একবার দেখা করতই।

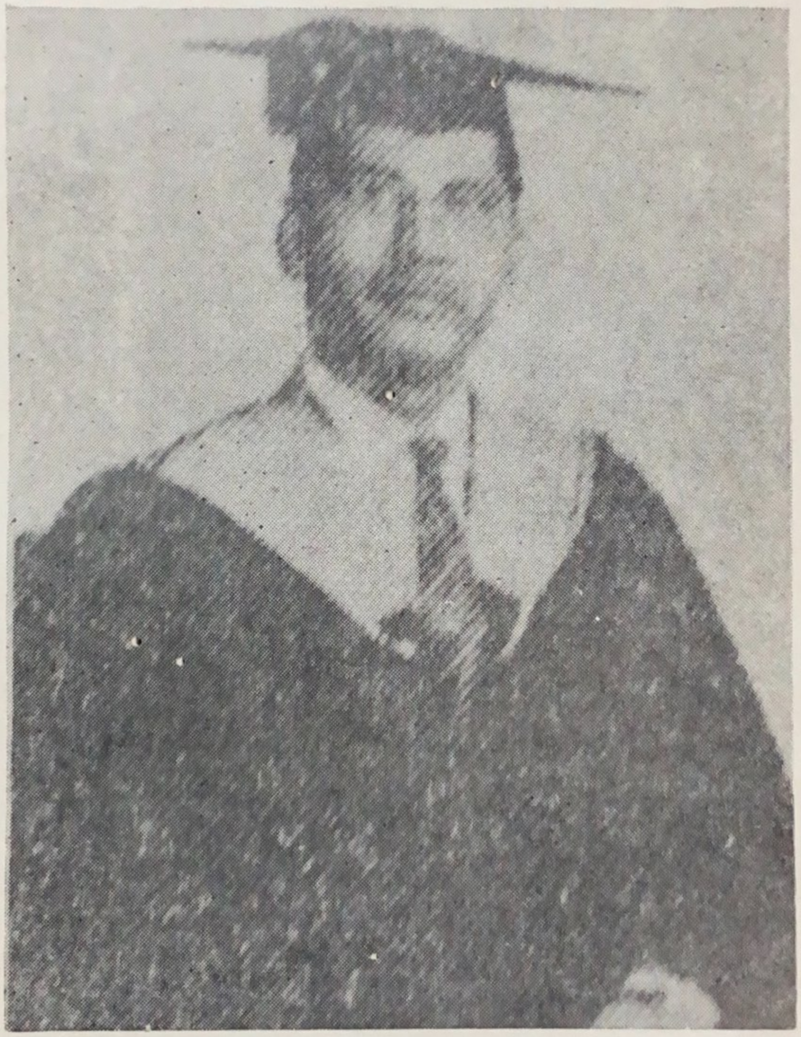

আজাদ ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা প্রসার ইনষ্টিটিউটে যোগদানের পর থেকে। তখন থেকে আজাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের একজন সদস্য। আজাদ প্রতিদিন ক্লাবে আসত, সন্ধ্যা হবার আগেই ক্লাব প্রাঙ্গণে শিরীষ গাছের নীচে একটা চেয়ার পেতে আড্ডা জমিয়ে বসত আজাদ। আজাদ বিজ্ঞানী ছিল কিন্তু দেশের ও আন্তর্জাতিক বিশ্বের রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি নিয়ে আজাদের কৌতূহলের এবং জ্ঞানের কোন সীমা ছিল না। নীলক্ষেত বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের শান বাঁধানো প্রাঙ্গণে শিরীষ গাছের তলায় বসে কত বিকেল, কত সন্ধ্যা যে আমরা আজাদের সঙ্গে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমস্যাদির চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছি তার ইয়ত্তা নেই। আজাদ খুব রসিক ছিল তার মুখ ছিল অত্যন্ত চালু। আলোচনায় বা কথাবার্তায় রেখে-ঢেকে বলতে পারত না আজাদ। বিভিন্ন বিষয় বা বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পর্কে তার ধারণা আজাদ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করত।

ধর্মান্ধতা আর গোঁড়ামির বিরুদ্ধে আজাদ ছিল সোচ্চার, আজাদ তার প্রগতিশীল মতামত প্রকাশে ছিল উচ্চকণ্ঠ, তার বাচন ভঙ্গীও ছিল তীক্ষ্ণ এবং ক্ষুরধার। কোন ভয়-ভীতি বা প্রলোভনে আজাদ নিজের বক্তব্যকে কখনো লুকোতে চেষ্টা করেনি। আমাদের বিজ্ঞানীদের মধ্যে আজাদের মতো প্রগতিশীল ও সমাজসচেতন মানুষ খুব কম চোখে পড়ে। আমাদের বিজ্ঞানীরা সাধারণতঃ চিন্তাধারায় ও জীবন-যাপন প্রণালীতে রক্ষণশীল ও প্রথাবদ্ধ, আজাদ ছিল তার ব্যতিক্রম। আজাদ যে তার মতামত ও চিন্তাকে সব সময় স্পষ্টভাবে প্রকাশ করত এবং সুযোগ পেলেই প্রতিক্রিয়াশীলদের সমালোচনা করতে ভীত হত না সে কারণেই বোধ করি সে তার জামাতপন্থী সহকর্মী এবং পাড়ার ইসলামী ছাত্রসংঘের সদস্যদের বিষদৃষ্টিতে পড়ে যায় এবং তাদের দৌলতে আল-বদরের তালিকায় তার নাম উঠে যায়।

একাত্তরের পনেরোই ডিসেম্বর কার্ফুর মধ্যে আজিমপুর দরগা এলাকার বাসস্থান থেকে আজাদকে নিয়ে যাওয়া হয়। পাঁচজন আল-বদর এসেছিল, ইসলামী ছাত্র সংঘের একজন স্থানীয় সদস্য তাদের আজাদের বাড়ী ও শোবার ঘর দেখিয়ে দেয়। পাড়া থেকে মতি ও মন্টু নামে আরও দুই ভাইকেই ওরা নিয়ে গিয়েছিল। আজাদ এবং মতি ও মন্টুকে রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। আজাদের মৃতদেহ ওখানেই পাওয়া গিয়েছিল, শরীরে ছিল অসংখ্য মারাত্মক জখম। ডক্টর আবুল কালাম আজাদ এখন আজিমপুরের গোরস্থানে চির নিদ্রায় শায়িত।

ডক্টর ফয়জুল মহী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্রের অন্যতম অধ্যাপক ডক্টর ফয়জুল মহী। তিনিও ঐ কেন্দ্রের ডক্টর সিরাজুল হক খানের মতো স্বাধীনতার পূর্ব লগ্নে আল-বদরের শিকার হন। ডক্টর মহী থাকতেন বিশ্ববিদ্যালয় আবাসে ৩৫ নং দালানে। একই দালানে থাকতেন ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর আবুল খয়ের, তিনিও আল-বদরের অন্যতম শিকার। ডক্টর ফয়জুল মহী ডক্টর সিরাজুল হক খানের মতো রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনায় উচ্চকণ্ঠ ছিলেন না। তুলনামূলকভাবে ডক্টর খয়ের অনেক বেশী তৎপর এবং সক্রিয় ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা যে সব সভা করেছেন বা সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রচার করেছেন ডক্টর খয়ের সে সব সভায় ছিলেন, বক্তৃতাও করেছিলেন আর যে কোন বিবৃতিতেও ডক্টর খয়েরের নাম পাওয়া যেত। তুলনামূলকভাবে ডক্টর মহী বা ডক্টর সিরাজুল হক খান অনেক কম সক্রিয় ছিলেন তাই তাদের আল-বদরের শিকার হতে দেখে অনেকেই বিস্মিত হন। তবে শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্রে অবাঙালী ও জামাতপন্থী বাঙালী শিক্ষকদের দাপটের কথা যারা জানেন তাতে তারা বিস্মিত হননি। হানাদার কবলিত বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এই শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্রে কার প্ররোচণায় মিলিটারীরা শিক্ষকদের দফতর সার্চ করেছিল সে কথা তো সবাই

জানেন। শুধু কি দফতর ব্যক্তিগত শত্রুতার জন্যে কোন কোন শিক্ষকের বাড়ীও তো সার্চ হয়েছিল। তা ছাড়া ঐ ইনষ্টিটিউটেরই একজন তো ঐ সময়ে টেলিভিশনে ছোটদের আসরে এমনও শেখাচ্ছিলেন যে, মুক্তি বাহিনীর বা মিত্র বাহিনীর বোমা পড়লে কোন্ কোন্ দোয়াদরুদ পড়তে হবে? হানাদার আমলে স্কুলের পাঠ্য পুস্তকে কি কি পরিবর্তন করতে হবে তারও উপদেষ্টা ছিলেন এই ইনষ্টিটিউটেরই কোন কোন অতি উৎসাহী কর্মচারী। ঐ সময়ে এমনও দেখা গেছে যে, ইনষ্টিটিউটের কোন কোন বাঙালী অধ্যাপকের কাছে ক্যান্টনমেন্ট থেকে সামরিক অফিসারা নিয়মিত আসছেন এবং ক্যান্টিনে নিয়ে গিয়ে তাদের সাদরে আপ্যায়ন করা হচ্ছে। বস্তুতঃ মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র রীতিমতো অবাঙালী জামাতী দালাল আর পাক সামরিক অফিসারদের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। ফলে, শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্রের প্রগতিশীল শিক্ষকেরা গা ঢাকা দিয়ে বা সীমান্ত পেরিয়ে গিয়ে জীবন রক্ষা করেন আর যাঁরা তা করতে পারেননি যেমন ডক্টর ফয়জুল মহী বা ডক্টর সিরাজুল হক খান তাঁরা আল-বদরের শিকার হন। ভুলে গেলে চলবে না যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের জামাতে ইসলামী সংগঠক এই প্রতিষ্ঠানেরই কর্মচারী ছিলেন। তাই ডক্টর মহীকেও আল-বদরের শিকার হতে হল!

১৪ই ডিসেম্বর সকালে আল-বদরের গাড়ী এসেছিল বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ায়, স্যাভেজ রোডে, ফুলার রোডে, নীলক্ষেত আবাসিক এলাকায়। ৩৫ নং দালানে এসে বদরেরা নীচেরতলা থেকে প্রথমে ডক্টর খয়েরকে নিয়ে গাড়ীতে ওঠায় তারপরে চারতলায় এসে ডক্টর মহীকেও নিয়ে যায়। ডক্টর মহীকেও ডক্টর খয়েরের মতোই মীরপুর গোরস্থানের পাশে বধ্যভূমিতে নিয়ে গুলী করে হত্যা করা হয় এবং তারপরে গণসমাধিতে পুঁতে ফেলা হয়। পরবর্তীকালে অন্যান্য

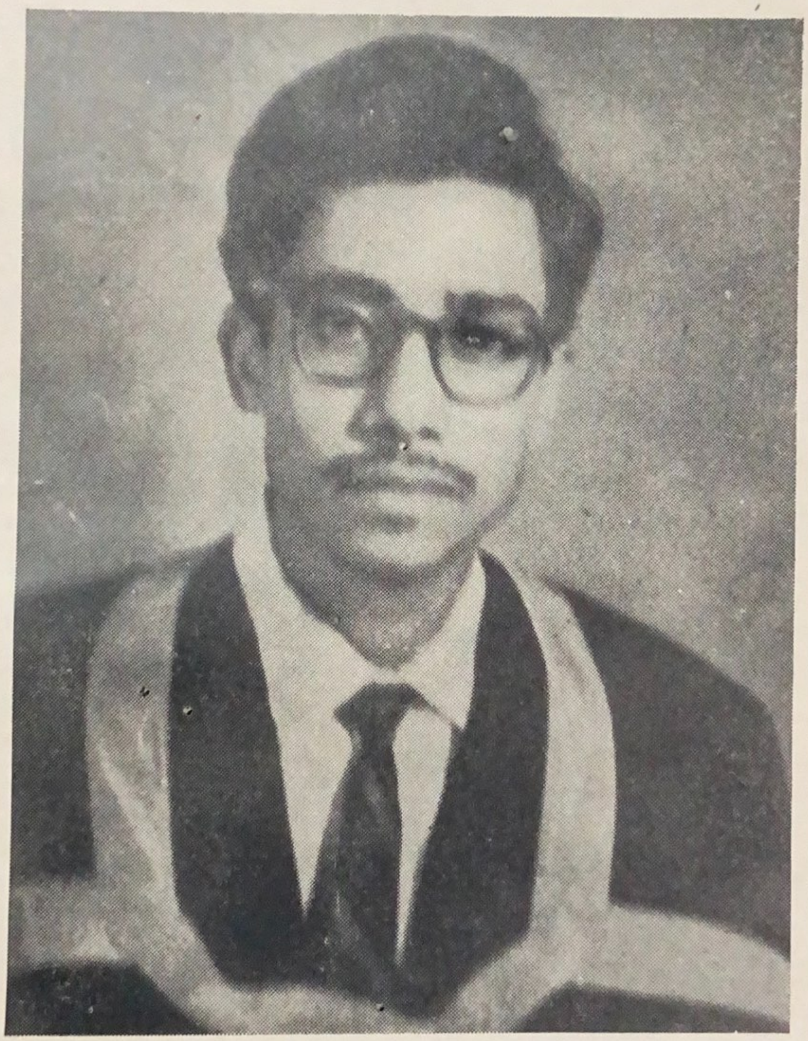

শহীদদের সঙ্গে তার লাশও পাওয়া যায়, তিনিও বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের পাশে সমাহিত। মীরপুর ঠিক যে স্থানে ডক্টর মহী, ডক্টর খয়ের, ডক্টর সিরাজুল হক খান, ডাক্তার মর্তুজা, অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক রশিদুল হাসান ও অধ্যাপক আনোয়ার পাশাকে হত্যা করা হয়েছিল সে স্থানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ‘শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতি স্তম্ভ’ যে স্মৃতিফলক যুগ যুগ ধরে বাঙালীদের স্মরণ করিয়ে দেবে ঘৃণ্য আল-বদরের নৃশংসতা, যে স্মৃতিফলক যুগ যুগ ধরে আমাদের ও আমাদের বংশধরদের স্মরণ করিয়ে দেবে ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িকতার শিকার এই সোনার মানুষগুলোর কথা, যাঁরা বাংলাদেশে বাঙালী জাতি আর বাঙালী সংস্কৃতিকে ভালবাসার অপরাধে বলি হল এক চরম নৃশংসতার।

ডক্টর সিরাজুল হক খান

ডক্টর সিরাজুল হক খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইনষ্টিটিউট অব এডুকেশন এণ্ড রিসার্চ' বা শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্রের অধ্যাপক ছিলেন। এই ইনষ্টিটিউটটি স্থাপিত হবার পর থেকে অবাঙালী ও জামাতপন্থী বাঙালী শিক্ষকদের একটি আখড়ায় পরিণত হয়। যে সব ব্যক্তির কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরীর যোগ্যতা নেই তেমন অনেকে নানা পথে নানাভাবে ঐ ইনষ্টিটিউটে নানা উচ্চপদে আসীন হয়। বিশেষতঃ ঐ একটি প্রতিষ্ঠানে অবাঙালী অধ্যাপকদের যে সংখ্যা ছিল সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অবাঙালী অধ্যাপকদের মোট সংখ্যার চেয়েও তা ছিল বেশী। এই সব প্রভাবশালী অবাঙালী অধ্যাপকেরা বেছে বেছে জামাতপন্থী বাঙালীদের ঐ ইনষ্টিটিউটে চাকুরী দিতেন। ফলে, জামাতপন্থী অধ্যাপকের সংখ্যাও এই প্রতিষ্ঠানে ছিল বেশী। বস্তুতঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে জামাতে ইসলামীর যে 'সেল' ছিল তার প্রধান ছিলেন এই ইনষ্টিটিউটেরই জনৈক বাঙালী অধ্যাপক। স্বাভাবিকভাবেই এই ইনষ্টিটিউটের প্রগতিশীল বাঙালী অধ্যাপকদের জীবন মুক্তি সংগ্রামের সময় বিপদাপন্ন হয়ে পড়ে। শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্রের শিক্ষকেরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মতো রাজনীতি ক্ষেত্রে ততটা সক্রিয় ছিলেন না; কিন্তু তবুও যে তাঁরা আল-বদরের মরণ ছোবল এড়াতে পারেননি তার কারণই হল শিক্ষা ও গবেষণা

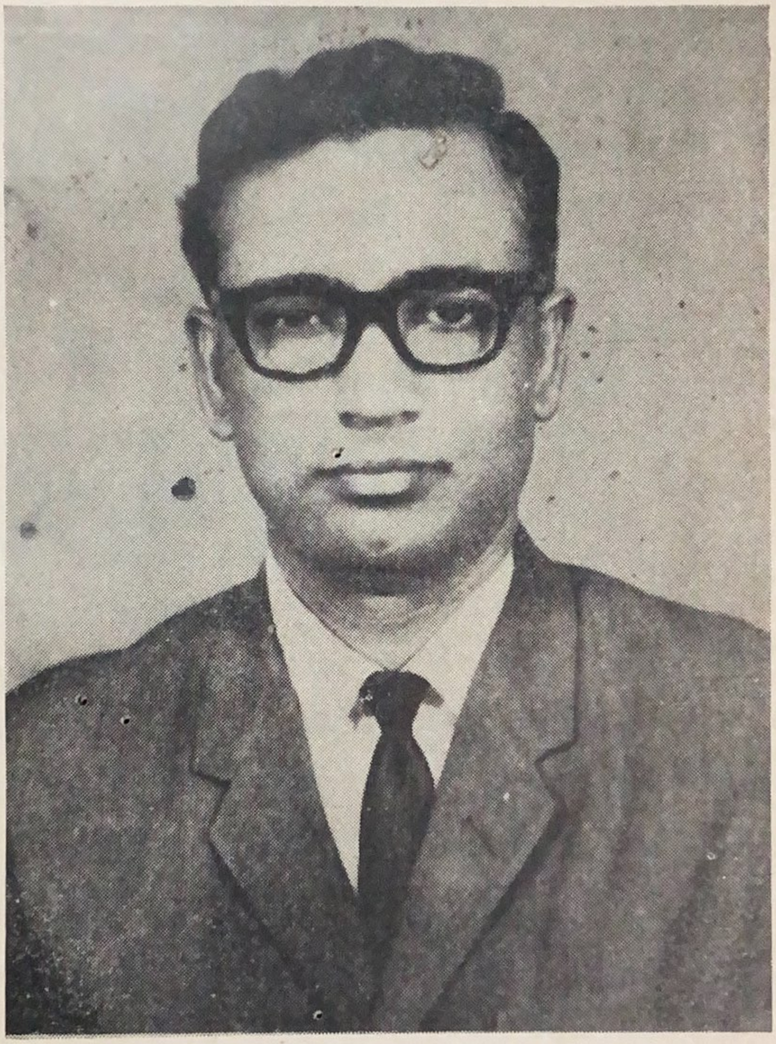

কেন্দ্রের অবাঙালী এবং জামাতপন্থী বাঙালী শিক্ষকেরা। ঐ সব অবাঙালী শিক্ষকের প্রায় সবাই বাংলাদেশ স্বাধীন হবার আগেই পশ্চিম পাকিস্তানে পালিয়ে যায় আর জামাতপন্থী বাঙালী শিক্ষকেরা একাত্তর সালের ষোলই ডিসেম্বর দেশ মুক্ত হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সক্রিয় থেকে এবং সহকর্মীদের আল-বদরের হাতে তুলে দিয়ে গা ঢাকা দেয়। এদের ঘৃণ্য কার্যকলাপের ফলেই ইনষ্টিটিউট অব এডুকেশনের ডক্টর মোঃ সাদাত আলী, জনাব মোহাম্মদ সাদেক, ডক্টর ফয়জুল মহী এবং ডক্টর সিরাজুল হক খানকে প্রাণ দিতে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ ইনষ্টিটিউটের যে সব জামাতপন্থী শিক্ষক এদের মৃত্যুর জন্যে দায়ী তাদের একজনও ধরা পড়েনি।

শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্রের অধ্যাপক ডক্টর সিরাজুল হক খান দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোকে ঘৃণা করতেন সর্বোপরী তিনি মনে করতেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাঙালীদের একটি দাস জাতিতে পরিণত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ডক্টর হক তার এ সব মতামত ইনষ্টিটিউটে প্রকাশ্যভাবে প্রচার করতেন না তিনি যথেষ্ট সাবধান ছিলেন; কিন্তু ইনষ্টিটিউটের জামাতীরা তাদের প্রত্যেক সহকর্মীর মতাদর্শ ও মতামত সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখত, খবর রাখত তাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে। তাছাড়া ব্যক্তিগত শত্রুতা তো ছিলই, মুক্তিযুদ্ধের সময় মুসলিম লীগ, পি, ডি, পি, জামাতে ইসলামী, ইসলামী ছাত্র সংঘ, রাজাকার, আল-বদর আর অবাঙালীরা ব্যক্তিগত কারণে বহু নিরীহ বাঙালীর নামে সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে মিথ্যা অভিযোগ করে তাদের গ্রেফতার এবং প্রাণহনন করিয়েছে। ইনষ্টিটিউট অব এডুকেশনের বাঙালী শিক্ষকেরাও এর হাত থেকে রেহাই পাননি। ঐ সব কারণেই আল-বদরের তালিকায় ডক্টর সিরাজুল হক খানের নাম উঠেছিল।

একাত্তরের চৌদ্দই ডিসেম্বর সকাল বেলা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকায় ১৬ নম্বর দালানের সামনে আল-বদরের গাড়ী এসে থামল।

ডক্টর সিরাজুল হক খানের বাসা ছিল চারতলায়, তিনি কার্ফু'র মধ্যে ঐ রকম একটা গাড়ী আসতে দেখে আতংকিত হলেন এবং নীচেরতলায় এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে চলে গেলেন। সাত আটজন সশস্ত্র আল-বদর চারতলায় উঠে আসে; তারা নাকি প্রথমে 'ডক্টর সিরাজুল ইসলাম খানের খোঁজ করছিল এবং ৩৬ নং দালান থেকে নাকি এই বাড়ীর কথা বলে দেওয়া হয়েছিল। তারা যখন জানতে পারে যে, এ বাড়ীতে ডক্টর সিরাজুল ইসলাম খান নামে কেউ থাকেন না এখানে থাকেন ডক্টর সিরাজুল হক খান তখন তারা জানতে চায় ডক্টর খান ইনষ্টিটিউট অব এডুকেশনের কিনা? সম্মতি-সূচক উত্তর পেয়ে তারা নীচে নেমে যায় এবং নীচেরতলা থেকে ডক্টর সিরাজুল হক খানকে রুমাল দিয়ে চোখ বেঁধে গাড়ীতে নিয়ে যায়। ডক্টর সিরাজুল হক খানকে মীরপুর বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানেই হত্যা করা হয়। তাঁর মৃতদেহ মীরপুর বধ্যভূমির গণ কবর থেকে পরবর্তীকালে উদ্ধার করা হয়। তিনিও বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে শায়িত।

অধ্যাপক রশিদুল হাসান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক ডক্টর জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা পাকিস্তানী সৈন্যদের বর্বরতার শিকার হয়েছিলেন একাত্তরের পঁচিশে মার্চ রাত্রিতে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম রাত্রিতে আর ঐ বিভাগের কনিষ্ঠ অধ্যাপক রশিদুল হাসান পাকিস্তানী সৈন্যদের ডালকুত্তা আল-বদর বাহিনীর নৃশংসতার শিকার হলেন একাত্তরের চৌদ্দই ডিসেম্বর স্বাধীনতার ঊষা লগ্নে। অধ্যাপক রশিদুল হাসান আর তাঁর বন্ধু বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আনোয়ার পাশা পঁচিশে মার্চ রাতে সপরিবারে দৈবাৎ বেঁচে যান নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে। তখন উভয়েই থাকতেন ইকবাল হলের পেছনে তেইশ নম্বর বাড়ীতে। ইকবাল হল এলাকায় ঐ বাড়ীতেই পঁচিশে রাত্রিতে সবচেয়ে বেশী রক্ত আর প্রাণ ঝরে। অধ্যাপক রশিদুল হাসান আর অধ্যাপক আনোয়ার পাশা ঐ বাড়ীর চারতলার বাশিন্দা ছিলেন, ঐ বাড়ীর ছাদে পাকিস্তানী কশাইরা ২৮ জন আশ্রয় গ্রহণকারী নারী, শিশু ও পুরুষকে পৈশাচিকভাবে হত্যা করে, ঐ বাড়ীর তিনতলায় পাকিস্তানী জল্লাদেরা হত্যা করে ডক্টর ফজলুর রহমান এবং তাঁর আরও দুইজন আত্মীয়কে। পঁচিশে রাত্রিতে নরপশুরা চারতলার দুইটি ফ্লাটেও ঢুকেছিল ; কিন্তু অধ্যাপক রশিদুল হাসান এবং অধ্যাপক আনোয়ার পাশা উভয়েই স্ত্রী, সন্তান,

আত্মীয়দের নিয়ে বিভিন্ন ঘরে খাট-চৌকির নীচে আত্মগোপন করে অবিশ্বাস্য রকমভাবে বেঁচে যান। রশিদুল হাসানের ঘরে ঢুকে একটা ট্রাংক তারা গুলী করে ফুটো করে দেয়, ট্রাংকে রক্ষিত রশিদুল হাসানের সবগুলো সার্টিফিকেটও ফুটো হয়ে গিয়েছিল, দস্যুরা তাঁর একটি ঘরে বিছানা এবং চৌকিতে অগ্নিসংযোগও করেছিল। পঁচিশে মার্চ এভাবেই মৃত্যুকে এড়িয়ে দুই বন্ধু সাতাইশে মার্চ সকালে ইকবাল হল এলাকা ছেড়ে গিয়েছিলেন।

অধ্যাপক রশিদুল হাসান আর অধ্যাপক আনোয়ার পাশা উভয়েই পশ্চিম বঙ্গের, প্রথম জন বীরভূমের দ্বিতীয় জন মুর্শিদাবাদ জেলার। দেশ বিভাগের পরে উভয়েই একাধিকবার তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে আসেন আবার পশ্চিম বঙ্গে ফিরে যান উচ্চ শিক্ষা এবং জীবিকার সন্ধানে। শেষ পর্যন্ত উভয়েই এ দেশে থেকে যান চূড়ান্তভাবে। পূর্বে উভয়েই পাবনা কলেজে অধ্যাপনা করতেন একজন ইংরেজীতে একজন বাংলায় উভয়েই লেখক। রশিদুল হাসান কবিতা আর সমালোচনায়, আনোয়ার পাশা কবিতা ছোট গল্প, উপন্যাস, সমালোচনায় খ্যাতি অর্জন করেন। শেষ পর্যন্ত উভয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে মিলিত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পূর্বে রশিদুল হাসান বীরভূমে এক কলেজে অধ্যাপনা করতেন। ডক্টর সাজ্জাদ হোসেনের প্ররোচণায় তিনি বুঝি মৃত্যুর টানেই বীরভূম ছেড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে যোগ দেন। আর পঁচিশে মার্চের মৃত্যুর বিভীষিকা থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিরাপত্তার জন্যে আশ্রয় নেন স্যাভেজ রোডে বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকায় ডক্টর মোহর আলীর প্রতিবেশীরূপে। ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন এবং ডক্টর মোহর আলী উভয়েই ছিলেন অধ্যাপক রশিদুল হাসানের আত্মীয়ের মতো, ডক্টর সাজ্জাদ হোসেনের আহ্বানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করতে এসে অধ্যাপক রশিদুল হাসান ডক্টর মোহর আলীর

বাড়ীতেই উঠেছিলেন। অথচ আশ্চর্য তাঁরা রক্ষা করতে পারল না রশিদুল হাসানকে ?

অধ্যাপক রশিদুল হাসান মুক্তি সংগ্রাম চলাকালে একবার গ্রেফতার হয়েছিলেন, তাঁকে ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু ১২ দিন পরে আবার ছেড়ে দেওয়া হয়। তখন অনেকে ভেবেছিলেন যে, রশিদুল হাসান 'সাজ্জাদ ভাই'র চেষ্টাতেই বুঝি ছাড়া পান। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার ছিল অন্য রকম। রশিদুল হাসানের জনৈক ছাত্র তাঁর নামে মার্শাল ল' কর্তৃপক্ষের কাছে মিথ্যা অভিযোগ করে তাঁকে গ্রেফতার করান। ছাত্রটির পরিচয় অধ্যাপক রশিদুল হাসান জানতে পারেন নি, তবে এইটুকু জানতে পেরেছিলেন যে, সে ইসলামী ছাত্র সংঘ ভুক্ত। রশিদুল হাসানকে মেজর মোশতাক নামে একজন বালুচ অফিসার জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেন, তাঁর মুক্তির পরেও ঐ ছাত্রটি মার্শাল ল' কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে ধর্ণা দেয়, তাদের বোঝাতে চেষ্টা করে যে রশিদুল হাসান পাকিস্তানের অস্তিত্বের পক্ষে কত বিপজ্জনক ; কিন্তু উক্ত বালুচ মেজর ইতিমধ্যেই বিশ্বাস করে ফেলেছিলেন যে, রশিদুল হাসান একজন খাঁটি মুসলমান এবং তাঁর বিরুদ্ধে সব অভিযোগ মিথ্যা, তাই সে যাত্রা তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ রক্ষা তিনি পেলেন না।

রশিদুল হাসান পর পর দু'বার পাকিস্তানী সৈন্যদের হাত থেকে বেঁচে গিয়েও শেষ অবধি আল-বদরের ছোঁবল থেকে রেহাই পেলেন না। ১৩ই ডিসেম্বর রাত্রে রশিদুল হাসান সাহেব সপরিবারে আনোয়ার পাশা সাহেবের বাড়ীতে রাত্রি যাপন করেন, সকালে নাশতা খেয়েই তাদের অন্যত্র চলে যাওয়ার কথা, কিন্তু পিশাচ বদরেরা সে সুযোগ তাঁকে দিল না তাঁর বন্ধুকেও নয়। চৌদ্দই ডিসেম্বর সকাল পৌনে নয়টায় বদরদের সেই মাটি লেপা ছোট ষ্টেট বাসটি সেভেজ রোডে আসে, বদরেরা প্রথমেই হানা দের অধ্যাপক

আনোয়ার পাশার বাড়ীতে, ঘর থেকে সবাইকে বের করে আনে, তাদের মধ্য থেকে অধ্যাপক রশিদুল হাসান এবং অধ্যাপক আনোয়ার পাশা এই দুই বন্ধুকে নীচে নামিয়ে নিয়ে যায়, দু'জনের গায়ে যে চাদর ছিল তা দিয়েই উভয়ের চোখ বেঁধে নেয়। তারা ঐ সময়ে অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্যকেও নিয়ে যায়। তাদের নিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বেগম রশিদুল হাসান সাহায্যের প্রত্যাশায় একই দালানে অবস্থিত ডক্টর মোহর আলীর বাড়ীতে ছুটে যান কিন্তু সেখানে তিনি ঢুকতে পারেন নি। তাঁদের নিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন ঐ পাড়াতেই অবস্থানকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরেক্টর অব একাউন্টেসকে টেলিফোন করে জানতে চান, 'যে লাল গাড়ীটা ঢুকল, কাকে কাকে নিয়ে গেল।', তিনি কি জানতেন লাল গাড়ীটা অধ্যাপকদের কয়েকজনকে চিরতরে নিয়ে যেতে এসেছে? যাঁরা আর ফিরে আসেন নি, মীরপুরের এক গণসমাধি থেকে তাঁদের মৃতদেহ শুধু ফিরে এসেছিল। এখন যারা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে চির নিদ্রায় শায়িত।

অধ্যাপক আনোয়ার পাশা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আনোয়ার পাশা এবং তাঁর বন্ধু ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক রশিদুল হাসান পঁচিশে মার্চ রাত্রে সপরিবারে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান, তখন উভয়েই থাকতেন ইকবাল হলের পেছনে তেইশ নম্বর বাড়ীর চারতলায়। পাকিস্তানীরা অধ্যাপক আনোয়ার পাশার ঠিক নীচে তিনতলায় হত্যা করে ডক্টর ফজলুর রহমান আর তাঁর দুইজন আত্মীয়কে। জল্লাদেরা অধ্যাপক আনোয়ার পাশা এবং অধ্যাপক রশিদুল হাসানের বাড়ীতেও প্রবেশ করে বেপরোয়া গুলী চালায় কিন্তু তাঁরা স্ত্রী, সন্তান, আত্মীয়দরে নিয়ে অন্ধকারে বিভিন্ন ঘরে খাট-চৌকির নীচে আত্মগোপন করে অবিশ্বাস্যরকমভাবে বেঁচে যান। অধ্যাপক আনোয়ার পাশা এবং অধ্যাপক রশিদুল হাসান সাতাইশে মার্চ সকালে ইকবাল হল এলাকার বাড়ী ছেড়ে চলে যান, পরে তাঁরা স্যাভেজ রোডে বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকায় আশ্রয় নেন।

অধ্যাপক আনোয়ার পাশা এবং অধ্যাপক রশিদুল হাসান উভয়েই পশ্চিম বঙ্গের মানুষ, প্রথম জন মুর্শিদাবাদ জেলার দ্বিতীয় জন বীরভূমের। দেশ বিভাগের পরে উভয়েই তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে আসেন উচ্চ শিক্ষার জন্যে, জীবিকার সন্ধানে. এক সময়ে উভয়েই পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের অধ্যাপক ছিলেন— আনোয়ার পাশা

বাংলার, রশিদুল হাসান ইংরেজীর। শেষ পর্যন্ত উভয়ই থেকে যান এ দেশে চূড়ান্তভাবে। অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই সাহেব আনোয়ার পাশাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপক করে নিয়ে আসেন ১৯৬৩ সালে, আর ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন অধ্যাপক রশিদুল হাসানকে ইংরেজী বিভাগে কয়েক বৎসর পূর্বে। অধ্যাপক আনোয়ার পাশা এবং রশিদুল হাসান উভয়েই সাহিত্যিক। আনোয়ার পাশা কবি, সমালোচক, কথা সাহিত্যিক, রশিদুল হাসান কবি ও সমালোচক। আনোয়ার পাশা রবীন্দ্র ছোট গল্পের সমালোচক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন, তাঁর একাধিক কাব্য গ্রন্থ ও উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে উভয় বাংলা থেকে। তাঁর একটি উপন্যাসের নাম 'নীড় সন্ধানী', আত্মজীবনীমূলক এই উপন্যাসে আনোয়ার পাশা প্রকাশ করেছেন কিভাবে সাম্প্রদায়িকতার শিকার হয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সাম্প্রদায়িকতার শিকার হয়ে পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করে নীড় সন্ধানে এসেছিলেন পূর্ব পাকিস্তানে কিন্তু তিনি ছিলেন সব সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে তাই রবীন্দ্র সমালোচক হিসেবেই প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন এ দেশে আর সেই খ্যাতিই বুঝি তাঁর কাল হল, সাম্প্রদায়িকতার চরম শিকার হলেন আনোয়ার পাশা। এ দেশে উগ্র সাম্প্রদায়িকতার চরম পরিণতি আল-বদর। আল-বদরের ছেলেরা এ দেশেরই ছেলে তারা হয়তো আনোয়ার পাশা, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, মুনীর চৌধুরীর ছাত্র তাই ধরে নিয়ে যাবার সময়েই অভ্যাসবশতঃ 'স্যার' সম্বোধন ছিল তাদের মুখে। আনোয়ার পাশাকে তো এক ছাত্র আগেই প্রকাশ্যে হুমকি জানিয়ে গিয়েছিল তবুও যে আনোয়ার পাশা ঢাকা ছাড়লেন না, হয়তো বার বার দেশ ত্যাগে তিনি শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু ঐ ছাত্রদের পরিচয় কি যারা আল-বদর হয়ে তাদের শিক্ষকদের নিজ হাতে হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করেনি? তাদের মধ্যে অনেকেই তো

এখনও সমাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা হয়তো আর প্রকাশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে প্রতি শুক্রবার দিন বাদ জুম্মা তালিম নিচ্ছে না কিন্তু খুব অপ্রকাশ্যেও তো নেই তারা। কিছু অর্থ, কিছু লাভের বিনিময়ে অনেকে এই ঘাতকদের রেহাই দিয়েছে, আশ্রয় দিয়েছে, সাহায্য করেছে সীমান্ত পেরিয়ে যেতে। যারা ঐ ঘাতকদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে এবং আজও করেছে এই রক্তের ঋণ একদিন তাদের শোধ করতেই হবে।

অধ্যাপক আনোয়ার পাশা আর তাঁর বন্ধু অধ্যাপক রশিদুল হাসান নিরাপত্তার জন্যে সপরিবারে স্যাভেজ রোড পাড়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, প্রতিবেশী হয়েছিলেন ডক্টর মোহর আলীর, ডক্টর হাসান জামানের এমনকি ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনেরও। অধ্যাপক আনোয়ার পাশাকে বাঁচাতে পারল না মালেক মন্ত্রিসভার নওয়াজেশ আহমদ, যাঁর পরিবারকে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবার পর আনোয়ার পাশা আশ্রয় দিয়েছিলেন। ঐ মন্ত্রীর পরিবারকে তিনি রক্ষা করেছিলেন অথচ ঐ মন্ত্রী পারল না তাঁকে রক্ষা করতে আল-বদরের হাত থেকে। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস? অধ্যাপক আনোয়ার পাশা আর অধ্যাপক রশিদুল হাসান একই সঙ্গে শিকার হলেন আল-বদরের।

১৩ই ডিসেম্বর সকালে কিছুক্ষণের জন্যে কারফিউ উঠে গেলে অধ্যাপক আনোয়ার পাশা স্যাভেজ রোড ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নেবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সেদিন ঠিক সুবিধে হয়ে ওঠেনি, পরে তিনি এবং রশিদুল হাসান ঠিক করেন ঐ রাত দু'টি পরিবার এক সঙ্গেই থাকবেন এবং পরদিন ভোরে অন্যত্র চলে যাবেন। ১৩ই ডিসেম্বর রাত্রিটা অধ্যাপক আনোয়ার পাশা আর অধ্যাপক রশিদুল হাসান সপরিবারে একই সঙ্গে আনোয়ার পাশার বাড়ীতে কাটিয়ে দিলেন। ১৪ই ডিসেম্বর সকালে নাশতা খেয়ে রশিদ সাহেবের চলে যাওয়ার কথা। এই সময়ে সকাল পৌণে নয়টায়

এল কাদা-মাটি মাখা সেই লাল ষ্টেট বাসটি নিয়ে আল-বদরের কসাইরা। তারপর দরজায় ঘা, সবাইকে ঘর থেকে বের করল, নাম জিজ্ঞেস করল, ওদের হাতে সাদা কাগজে নামের তালিকা ছিল। অধ্যাপক আনওয়ার পাশা আর অধ্যাপক রশিদুল হাসানকে বিচ্ছিন্ন করে দুই পরিবারের আর সকলকে ঘরে ঢুকিয়ে দিল ওরা। নীচে নামিয়ে নিয়ে গেল ওদের দু'জনকে, দু'জনের গায়েই চাদর ছিল সেই চাদর দিয়েই চোখ বেঁধে ওদের গাড়ীতে তুলল, তারপরে সন্তোষ বাবুকেও একই গাড়ীতে তুলে একটা রুমাল দিয়ে চোখ বেঁধে নিয়ে গেল। নিয়ে গেল মীরপুরে বধ্যভূমিতে তারপরে সব শেষ।

আল-বদরের গাড়ী চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে রশিদুল হাসান সাহেবের স্ত্রী সাহায্যের প্রত্যাশায় একই দালানে অবস্থিত ডক্টর মোহর আলীর বাড়ীতে যান কিন্তু সেখানে তিনি ঢুকতে পারেননি। আল-বদরের গাড়ীটি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাশের দালানের বাশিন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরেক্টর অব একাউন্টস শামসুর রহমানের কাছে একটি টেলিফোন আসে। টেলিফোন করেছিলেন ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন। তিনি জানতে চান, 'ঐ যে গাড়ীটি চলে গেল তাতে কোন্ কোন্ অধ্যাপককে উঠিয়ে নিয়ে গেল।' স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে ঐ কারফিউর মধ্যে ভাইস চ্যান্সেলরের বাড়ীতে বসে ডক্টর সাজ্জাদ হোসায়েন কি করে টের পেলেন যে, আল-বদরের গাড়ী এসেছিল এবং তা এসেছিল মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে তাঁরই সহকর্মীদের জন্যে? তাহলে তিনি কি ঐ গাড়ীর আগমনের কথা অগ্রিম জানতেন? যদি জানতেন তবে তাঁদের তিনি সতর্ক করে দেননি কেন?

আল-বদরের গাড়ী চলে যাবার পর পরই মন্ত্রী নওয়াজেশ আহমদ এবং মন্ত্রী ওবায়দুল্লা মজুমদার আনোয়ার পাশার বাড়ীতে আসেন প্রথমোক্তর পরিবারবর্গের খোঁজ খবর নিতে। আনোয়ার

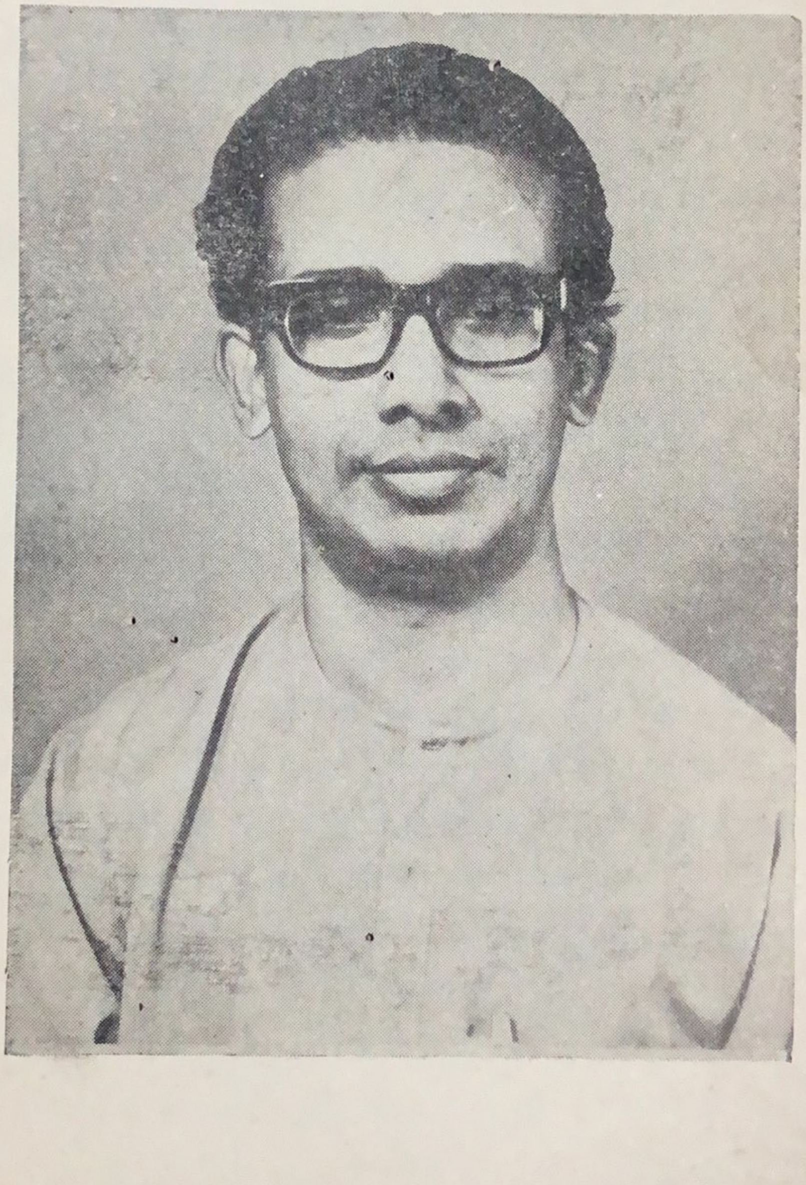

পাশার খবর জেনে তিনি গবর্নর হাউসে যান এবং সেখানে সম্ভবতঃ রাও ফরমান আলীর কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে ফোন করে জানান যে অধ্যাপকদের মিলিটারী বা রাজাকাররা ধরে নিয়ে যায়নি— নিয়েছে আল-বদর। এই প্রথম আল-বদরের কথা জানা গেল, এর আগে কিন্তু এই ঘাতক বাহিনী সম্পর্কে হানাদার কবলিত বাংলাদেশে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। মন্ত্রী নওয়াজেশ আহমদ ৩টার সময় আবার ফিরে আসে তার পরিবারবর্গ নিয়ে যেতে তখন সে প্রথমে এই বলে ফাঁকি দিতে চেয়েছিল যে অধ্যাপক আনোয়ার পাশা রমনা থানায় আছেন, ছেড়ে দেওয়া হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। পরে অবশ্য মন্ত্রী নাকি অধ্যাপক আনোয়ার পাশার এক আত্মীয়ের জেরার উত্তরে বলে ‘তুমি পরিস্থিতি বুঝতে পারছ না?’ এখন প্রশ্ন হল এই যে তিনি নিজে যদি পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন তাহলে ফরমান আলীর কাছে গিয়েও তিনি অধ্যাপকদের প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করলেন না কেন? শুধু ঐ মন্ত্রী নয়, একই বাড়ীতে থাকতেন ডক্টর মোহর আলী, পাশের বাড়ীতে ডক্টর হাসান জামান আর কাছেই ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন। তাদের চোখের ওপর দিয়ে আল-বদরের ঘাতকেরা অধ্যাপকদের তুলে নিয়ে যায়, তারা তাদের বাধা দিলেন না কেন? তারা কেন টেলিফোনে ফরমান আলীর সঙ্গে যোগাযোগ করে ঐ হতভাগ্যদের বাঁচানোর চেষ্টা করলেন না? ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন তো সঙ্গে সঙ্গেই টেলিফোন মারফতে জানতে পেরেছিলেন ঐ ঘটনা তারপরে তিনি কি করলেন? এ সব প্রশ্নের উত্তর কে দিবে?

আনোয়ার পাশা, রশিদুল হাসান, গিয়াসুদ্দীন আহমেদ, ডক্টর আবুল খয়ের, ডাক্তার মর্তুজা, ডক্টর মহী, ডক্টর সিরাজুল হক খান সবাই এখন শায়িত চির নিদ্রায় বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ সংলগ্ন মাঠে অথচ কি আশ্চর্য স্বাধীনতার পর প্রথম ঈদের নামাজের দিন বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে

ঈদের জামাতের পরে মোনাজাতের সময় ঈমাম সাহেব একটিবার প্রয়োজন বোধ করলেন না ঐ হতভাগ্যদের জন্যে দোয়া করার? স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদদের জন্যে দোয়া করার? বাংলাদেশের জন্যে দোয়া করার? যদিও 'মুসলমান জাতির অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ায়' এবং 'দেশের শাসকদের মনে ইসলামী ভাবধারা সঞ্চারের' জন্যে অনেক অশ্রু বিসর্জন করলেন ইমাম সাহেব আল্লাহ তায়ালার কাছে। বিস্ময়ের কিছু নেই ঐ মসজিদেই রোপিত হয়েছিল আল-বদরের বীজ, সেই বিষ-বৃক্ষ মহীরুহে পরিণত হয়েছে এই মসজিদেই। আর যাদের ছত্রছায়ায় তা হয়েছে তারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ শিক্ষকদের রুহের মাগফেরাতের জন্যে মোনাজাত করবে এমন আশা করা উচিত নয় আর তা আমাদের কাম্যও নয়। তাতে ঐ অমর শহীদদের পবিত্র স্মৃতির অবমাননাই করা হবে।

অধ্যাপক গিয়াসুদ্দীন আহমেদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সবচেয়ে প্রতিভাবান অধ্যাপক গিয়াসুদ্দীন আহমেদ মার্চের বিভীষিকার পরেও দেশ ত্যাগ করেননি। তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিউরো সার্জন ডাঃ রশীদকে তিনি সীমান্ত পেরিয়ে বিদেশে চলে যাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু নিজে সে সুযোগ গ্রহণ করেননি কারণ দেশে তাঁর অনেক কিছু করণীয় ছিল এবং নীরবে নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর আরব্ধ কার্য তিনি চালিয়ে যাচ্ছিলেন লোক চক্ষুর অন্তরালে। মুক্তিযুদ্ধ চলার সময় দেশের ভেতরে থেকে তিনি যে সব দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন সে সব কাজের ভার কেউ তাঁকে অর্পণ করেনি, নিজেই নিজের কর্তব্য স্থির করে নিয়েছিলেন তিনি আর মৃত্যুর দিনটি পর্যন্ত সে কাজ তিনি চালিয়ে গিয়েছিলেন। অধ্যাপক গিয়াসকে আমরা যে ছাত্র জীবন থেকে 'পরোপকারী' আখ্যায় ভূষিত করেছিলাম, এ বিশেষণ যথার্থই তাঁর প্রাপ্য ছিল। বন্ধু, আত্মীয়, পরিজন, চেনা অচেনা সবার যে কোন কাজে লাগতে পারলে তিনি আনন্দিত হতেন এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে তাদের উপকার করতে চাইতেন। এ যুগে আমাদের সমাজে এমন নিঃস্বার্থ পরোপকারী বিরল।

পঁচিশে মার্চ রাতের বিভীষিকার আঘাত কাটিয়ে উঠেই অধ্যাপক গিয়াসুদ্দীন আহমেদ তাঁর কর্তব্য ঠিক করে নিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সব শিক্ষক ও কর্মচারী পঁচিশে মার্চ রাত্রে প্রাণ

হারিয়েছিলেন তিনি তাঁদের একটি তালিকা প্রণয়ন করে তাঁদের প্রত্যেকের অসহায় পরিবারবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। ঐ গোলযোগপূর্ণ পরিবেশে যখন মৃত অধ্যাপক বা কর্মচারীদের পরিবার-পরিজনকে সকলে এড়িয়ে চলতেন, যখন তাঁরা তাঁদের উপার্জনক্ষম মানুষটিকে হারিয়ে অভাব-অনটনে অসহায় জীবন-যাপন করছিলেন, নিশ্চিত অনাহারের সম্মুখীন হয়েছিলেন তখন যে কি পরিশ্রম করে অধ্যাপক গিয়াসুদ্দীন তাঁদের খুঁজে বের করেছিলেন তাদের জন্যে সাহায্যের ব্যবস্থা করেছিলেন সে কথা আজও অনেকে জানেন না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সে সময় ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের নেতৃত্বে নিহত শহীদ শিক্ষক ও কর্মচারীদের 'নিখোঁজ' তালিকাভুক্ত করে এবং মার্শাল ল' কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ২০শে জুনের মধ্যে কার্যে যোগদান করতে অপারগতার অজুহাতে তাঁদের চাকুরী থেকে বরখাস্ত ধরে নিয়ে মাইনে, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকা, আবাসিক সুবিধাদি থেকে বঞ্চিত করে শহীদ পরিবারবর্গের প্রতি যে হৃদয়হীন আচরণ করেছিলেন তার নজীর সভ্য জগতে বিরল। এই মুহূর্তে এগিয়ে আসেন অধ্যাপক গিয়াসুদ্দীন, বিভিন্নসূত্র থেকে সাহায্য সংগ্রহ করে যে সব শহীদ পরিবার একেবারেই নিঃস্ব তাদের সে সাহায্য দান করে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন। হানাদার কবলিত ঢাকা শহরে মুক্তি সংগ্রাম চলাকালে এ কাজের জন্যে যে সাহস, যে মহত্বের প্রয়োজন ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মধ্যে একমাত্র গিয়াসুদ্দীনেরই তা ছিল।

শুধু শহীদ পরিবারবর্গের খোঁজখবর নেওয়া বা তাঁদের সাহায্য দানের মধ্যেই অধ্যাপক গিয়াসুদ্দীনের কর্মতৎপরতা সীমাবদ্ধ ছিল না, যখনই কোন অধ্যাপক গ্রেফতার হতেন তখনই তিনি তাঁদের পরিবারবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন, তাঁদের দেখাশুনা করতেন। সে সময় কিন্তু সকলে গ্রেফতারকৃত পরিবারবর্গকে এড়িয়ে চলতেন, পাছে তারা পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের কুনজরে পড়ে যান সেই ভয়ে।

আমি যখন আরও চারজন অধ্যাপকের সঙ্গে গ্রেফতার হয়ে গিয়েছিলাম তখন আমার স্ত্রী, কন্যা, পুত্র আমার এক ভাইয়ের বাড়ী গিয়ে আশ্রয় নেয়। আমার আটক থাকার পুরো সময়টা আমার বিভাগের সহকর্মীরা ছাড়া আর একটি মাত্র মানুষ নিয়মিত আমার পেছনে ফেলে যাওয়া স্ত্রী, পুত্র, কন্যার খোঁজ-খবর নিতেন, তিনি অধ্যাপক গিয়াসুদ্দীন আহমেদ। হানাদার কবলিত দেশে এ কাজটি খুবই বিপজ্জনক ছিল কারণ যখনই মিলিটারীরা কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে আটক করত সঙ্গে সঙ্গে তারা তার পরিবারকেও নজরবন্দী অবস্থায় রাখত এবং প্রায়শঃ আটক ব্যক্তির প্রাণনাশের ভয় দেখিয়ে ব্ল্যাকমেইল করে পরিবারের কাছ থেকে নিয়মিত মোটা টাকা আদায় করত। ফলে ভয়ে আত্মীয় পরিজনরাও গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির পরিবারকে আশ্রয় দিতে বা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে ভয় পেত। এমনও হয়েছে যে, পরিবারের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে ডাক্তার পর্যন্ত ঐ বাড়ীতে এসে চিকিৎসা করতে অস্বীকার করত। এমন অন্ধকারময় দিনে অধ্যাপক গিয়াসুদ্দীন আহমেদ বিনা দ্বিধায় গ্রেফতারকৃত অধ্যাপকদের পরিবারদের দেখা-শুনা করতেন।

এই কাজের জন্যেই অধ্যাপক গিয়াসুদ্দীন আহমেদ দেশ ত্যাগ করে যেতে পারেননি আর সম্ভবতঃ সেই কারণেই আল-বদরের খাতায় তাঁর নাম উঠেছিল। একবার মিথ্যা অভিযোগে তাঁরই কয়েজন ছাত্র (ইসলামী ছাত্র সংঘভুক্ত) তাঁকে ধরিয়েও দিয়েছিল কিন্তু সেবারে ছাড়া পেয়েও তিনি সতর্ক হলেন না, আত্মগোপন করলেন না, ঠিকানা বদল করলেন না। মোহসিন হলের হাউজ টিউটর ছিলেন তিনি। ডিসেম্বরের শুরুতে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেলে ঘোড়াশাল গ্রামের বাড়ীতে চলে যাওয়া সম্ভব হল না, আজিমপুর কলোনীতে বোনের বাড়ীতেও যাওয়া হল না বরং তারাই এসে আশ্রয় নিলেন তাঁর কাছে মোহসিন হলের বাড়ীতে। মোহসিন হলে সেই যুদ্ধের মধ্যেও ইসলামী ছাত্র

সংঘের কয়েকজন ছাত্র হলে অবস্থান করছিল। যুদ্ধের ফলে হলে পানি সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় আর ঐ ছাত্ররা তখন অধ্যাপক গিয়াসুদ্দীন আহমদকে পানির ব্যবস্থা করে দিতে আদেশ করে। ঐ অঞ্চলে তখন প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ হচ্ছিল, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, হলে কলের যে মিস্ত্রী ছিল সেও পালিয়েছিল। এহেন পরিস্থিতিতেও ঐ ছাত্ররা পানির জন্যে প্রবল গোলযোগ সৃষ্টি করে। অধ্যাপক গিয়াসুদ্দীন কারফিউর মধ্যে দেওয়াল টপকে হলে আসেন এবং নিজেই পানির পাম্প মেরামত করার চেষ্টা করতে লেগে যান। এভাবেই চৌদ্দই ডিসেম্বর সকালের দিকে যখন অধ্যাপক গিয়াসুদ্দীন আহমেদ মোহসিন হলে অবস্থানরত ইসলামী ছাত্র সংঘের ছাত্রদের জন্যে পানি সরবরাহের চেষ্টা করছিলেন তখন মাটি লেপা ছোট স্টেট বাসে করে আল-বদরের ছেলেরা মোহসিন হল সংলগ্ন অধ্যাপক গিয়াসুদ্দীনের বাসভবনে এসে হানা দেয়, তাঁকে বাড়ীতে না পেয়ে একজন দারোয়ানকে নিয়ে হলে আসে এবং অধ্যাপক গিয়াসুদ্দীনকে তুলে নিয়ে যায়। হলের ছাত্রদের মধ্যে যারা তাঁকে কল ঠিক করতে নিয়ে এসেছিল তারা তখন কি করছিল সেইটে জানা যায় নি। অধ্যাপক গিয়াসুদ্দীনের পর আল-বদরেরা ডাক্তার মর্তুজা, ডক্টর খয়ের, ডক্টর মহী, ডক্টর সিরাজুল হক খান, অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক আনোয়ার পাশা ও অধ্যাপক রশিদুল হাসানকেও ঐ একই গাড়ীতে তুলে নিয়ে মীরপুর বধ্যভূমিতে গুলী করে হত্যা করে। পরে তাদের দেহ ঐ স্থানের গণসমাধি থেকে উদ্ধার করা হয়। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের পাশে তাঁরা চির নিদ্রায় শায়িত। মহৎ প্রাণ পরোপকারী গিয়াসুদ্দীন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এভাবেই পরের উপকার করতে গিয়ে প্রাণ দিলেন। কিন্তু এমন মানুষের কি মৃত্যু আছে? গিয়াসুদ্দীনের মতো মহৎ প্রাণ অমর চিরঞ্জীব।

অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রবীণ অধ্যাপক শ্রী সন্তোষ ভট্টাচার্য দেশ বিভাগের পর দেশ ত্যাগ করলেন না। জগন্নাথ কলেজ ছেড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে যোগদান করলেন তিনি। ইতিহাস বিভাগের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক সন্তোষ বাবু কেবল যে ক্লাসে চমৎকার পড়াতেন তাই নয়, তিনি যে কেবল প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের একজন অভিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন তা-ও নয় তাঁর মত ভাষাজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব কম শিক্ষকের মধ্যে দেখেছি। ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত এই তিনটি ভাষাতেই তাঁর অভূতপূর্ব দক্ষতা ও নৈপুণ্য ছিল। এই জ্ঞানী, গুণী পণ্ডিত কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর যোগ্যতার যথাযথ স্বীকৃতি পাননি, তাঁর ছাত্রেরা রীডার, প্রফেসর হয়ে গেছেন, কিন্তু তিনি আজীবন থেকেছেন সহকারী অধ্যাপক। কিন্তু সে জন্য তাঁর মধ্যে কোনদিন কোন খেদ বা ক্ষোভ ছিল না, শিষ্যদের উন্নতিতে তিনি বরং আনন্দিতই হতেন। অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্য ছিলেন এমন এক আদর্শ শিক্ষক যা এ যুগে দুর্লভ তাই জীবন বিপন্ন জেনেও তিনি দেশ ত্যাগ করলেন না। পঁচিশে মার্চের ভয়াবহ রাত্রির পরে তিনি ঢাকার বাইরে গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেন। তখন তিনি স্বচ্ছন্দে সপরিবারে সীমান্তের ওপরে চলে যেতে পারতেন, ভারতে গেলে তাঁর কদর কারো চেয়ে কম হত না। কিন্তু সবাইকে

বিস্মিত করে তিনি ঢাকা ফিরে এলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকায় বসবাস করতে শুরু করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যাভেজ রোড আবাসিক এলাকায় সন্তোষ বাবু থাকতেন, এই এলাকাতেই ডক্টর হাসান জামানের এবং ডক্টর মোহর আলীর অবস্থান। এই পাড়াতেই থাকতে শুরু করলেন ব্রাহ্মণ সন্তোষ ভট্টাচার্য মুক্তি সংগ্রামের কালে। প্রতিবেশীদের ভয়, ভীতি, আশঙ্কা, বিরক্তির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে স্ত্রী কন্যা নিয়ে সন্তোষ বাবু স্যাভেজ রোডে থাকতে লাগলেন। একবার মিলিটারীরা এসে বাড়ী সার্চ করে গেল তবুও সন্তোষ বাবু বাড়ী ছাড়লেন না, পাড়া ছাড়লেন না। ঐ অন্ধকারময় দিনে এমন সাহসিকতার পরিচয় দুর্লভ, কিন্তু সে জন্য কি মূল্য দিতে হল সন্তোষ বাবুকে? এই জ্ঞানতাপস স্বদেশ-পরিত্যাগ করে গেলেন না কারণ স্বদেশ যে তাঁর কাছে স্বর্গাদপি গরীয়সী, স্বদেশের মাটিতে মৃত্যুও শ্রেয় তাই হয়েনার রাজ্য ছেড়ে গেলেন না তিনি।

১৪ই ডিসেম্বর, পরাজয় ও আত্মসমর্পণ নিশ্চিত জেনে ক্ষিপ্ত পাক বাহিনী তাদের শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করল, লেলিয়ে দিল বদর বাহিনীকে ঢাকার পথে পথে। ইসলামী ছাত্র সংঘের বিশ্বস্ত বাঙালী মুসলমান ছাত্রদের নিয়ে গঠিত আল-বদর বাহিনী, কিছু শিক্ষক কয়েক মাস ধরে বদর বাহিনীকে পাঠ দিয়েছে কি করে চরম মুহূর্তে পাকিস্তান বিরোধী বুদ্ধিজীবীদের নিচিহ্ন করে দিতে হবে, কি করে বাঙালীর জন্যে তাদের স্বাধীনতাকে অর্থহীন করে তুলতে হবে। পূর্ব প্রস্তুত তালিকা অনুযায়ী ১০ই ডিসেম্বর থেকে অভিযান শুরু হয়ে গিয়েছিল, মাটি লেপা ছোট একটা স্টেট বাস আর একটা মাইক্রোবাস নিয়ে আল-বদরের হিংস্র হয়েনারা খুঁজে খুঁজে বের করছিল সেরা বাঙালী অধ্যাপক, বৈজ্ঞানিক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, প্রকৌশলী, চিকিৎসকদের, তাদের চোখ বেঁধে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল মোহাম্মদপুর আর মীরপুরে আর পৈশাচিকভাবে হত্যা

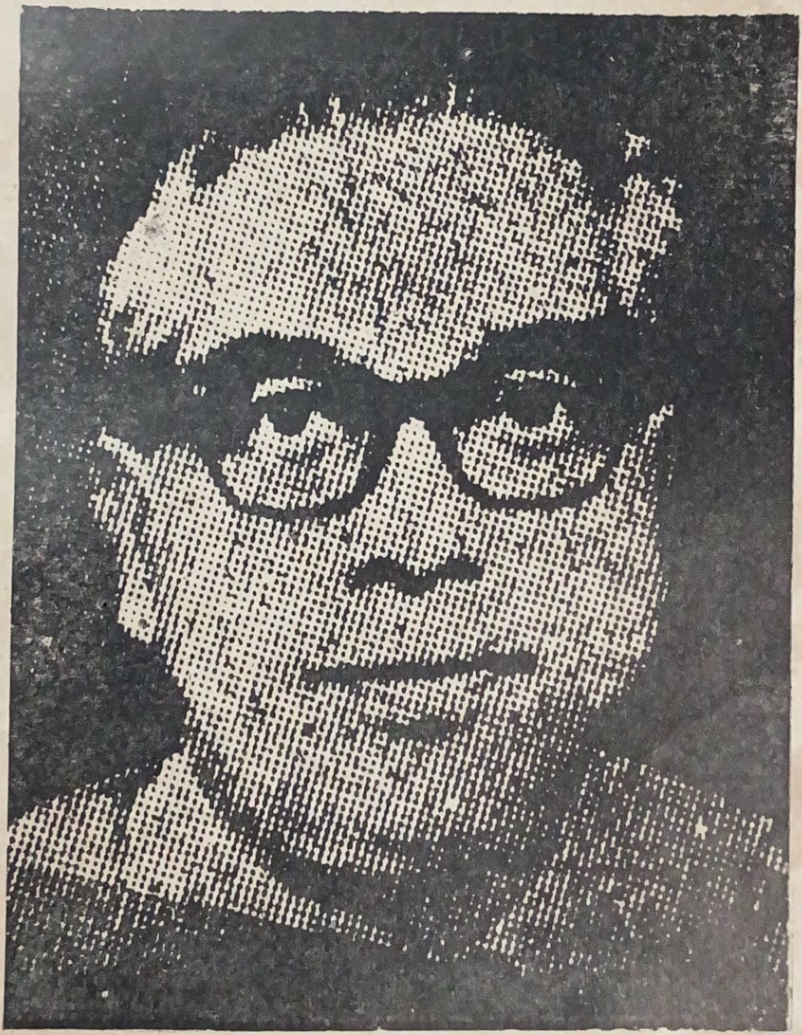

করছিল। পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ অবধি এমনকি হয়তো বা তারপরেও চলছিল এই নিধনযজ্ঞ। এ ভাবেই 'ইসলাম পসন্দরা' তাদের প্রতি-হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করল বাঙালীদের ওপরে। বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যারা পাকিস্তান বিরোধী তাদের নিশ্চিহ্ন করার হুমকি প্রকাশ্যে খোলাখুলিভাবে দিয়েছিলেন প্রখ্যাত দালাল ভাষ্যকার বেতার ও টিভি মাধ্যমে।

অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্যও শিকার হলেন আল-বদরের, পঁচিশে মার্চ যে তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন তবুও যে তিনি মাতৃভূমি পরিত্যাগ করে গেলেন না, ব্রাহ্মণ হয়েও বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ায় থেকে গেলেন তার চরম মূল্য দিতে হল তাকে, ঐ পাড়ারই অধ্যাপক আনওয়ার পাশাকে, অধ্যাপক রশিদুল হাসানকে আর পাড়া ছেড়ে গিয়েও অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীকে। স্যাভেজ রোডের বিশ্ববিদ্যালয় পাড়া একটা অভিশপ্ত পাড়া, দালাল শিক্ষকদের একটা আখড়া ছিল পাড়াটা, সে জন্যেই বোধ হয় কারফিউ হওয়া মাত্র মেইন গেইট খুলে যেত। দিনে-রাতে সামরিক, আধা-সামরিক, বেসামরিক নানা রকম গাড়ীতে নানা লোকজন আসত পাড়ায় দালালদের বাড়ীতে। একজনের বাড়ীতে তো প্রহরাও ছিল, তার বাড়ীর ঠিক ওপরেই বালুর বস্তা নিয়ে ঘাঁটি গেড়েছিল পাক বাহিনী। এমন পাড়ায় বসবাস করার স্পর্ধা আর দুঃসাহস দেখিয়ে সন্তোষ ভট্টাচার্য যে দালাল শিক্ষকদের ক্ষোভ, বিরক্তি আর ঘৃণার কারণ হয়েছিল তা সবাই জানত। এ নিয়ে দালাল শিক্ষকেরা খোলাখুলি আলোচনাও করত, বিরক্তি প্রকাশ করত।

১৪ই ডিসেম্বর সকাল, সন্তোষ বাবু আহ্নিকে বসেছেন, ঠিক সে সময় তাঁর স্ত্রী এবং কন্যা দেখলেন মাটি লেপা একটি ছোট স্টেট বাস তাঁদের বাড়ীর উল্টো দিকে এসে দাঁড়াল। তার ভেতর থেকে সশস্ত্র কয়েকজন অল্প বয়স্ক বাঙালী আল-বদর ও রাজাকার

নেমে আসে, প্রথমে তারা অধ্যাপক আনোয়ার পাশা ও অধ্যাপক রশিদুল হাসানের বাড়ীতে প্রবেশ করে। শ্রীমতী ভট্টাচার্য ও মেয়ে স্বপ্না কিছুক্ষণ পরে দেখতে পান অধ্যাপক রশিদুল হাসানকে চোখ বাঁধা, হাত বাঁধা অবস্থায় পেছনে বন্দুক ধরে নিয়ে আসছে, তাকে এনে গাড়ীতে ওঠান হল। অল্পক্ষণ পরেই আল-বদরেরা সন্তোষ বাবুর দালানে উঠে এল, প্রথমে তারা তিনতলায় গিয়ে ডক্টর লতিফের বাড়ীর দরজা ভেঙে ফেলে সেখানে সন্তোষ বাবুকে না পেয়ে দোতলায় নেমে আসে। সন্তোষ বাবুর ফ্ল্যাটে ঢুকেই কালো মত, গোল মুখ, ছাই রং-এর ইউনিফর্ম পরা একটি রাজাকার সন্তোষ বাবুর নাম জিজ্ঞেস করে, তিনি নাম বলতেই তাঁকে সঙ্গে যেতে আদেশ করা হয়। সন্তোষ বাবু জানতে চান 'কেন, আমি কি অপরাধ করেছি', সে খেঁকিয়ে ওঠে, 'চোপ, কথা বলবেন না, আমাদের যা খুশি করতে পারি, যেখানে খুশি নিয়ে যেতে পারি'। আর ঐ পিশাচেরা করলও তাই, নিয়ে গেল সন্তোষ বাবু, আনোয়ার পাশা, রশিদুল হাসান, গিয়াসউদ্দীন, ডাক্তার মর্তুজা, ডক্টর খয়ের, ডক্টর মহী, ডক্টর সিরাজুল হক খান, সবাইকে মীরপুরের গোরস্থানের পাশে একটা ধান ক্ষেতে, নিয়ে গিয়ে সে বধ্যভূমিতে তাঁদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে সেই ক্ষেতের মধ্যেই তাঁদের লাশগুলো পুঁতে রাখল। সম্ভবতঃ ১৪ই ডিসেম্বর তারিখেই তাঁদের হত্যা করা হয়, পরে তাঁদের সকলের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। ঐ স্টেট বাসের ড্রাইভার পালিয়ে গিয়েছিলেন, তিনিই এই তথ্য প্রকাশ করেন। অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্যের শবদেহ পরে যথারীতি সৎকার করা হয়, বাকি সবাই বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের পাশে চির নিদ্রায় শায়িত রয়েছেন।

সন্তোষ বাবুকে নিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কন্যা স্বপ্না পেছনের বাড়ীতে অবস্থানকারী সন্তোষ বাবুর ছাত্র ইতিহাসের

অধ্যাপক ডক্টর মোহর আলীকে ডেকে সাহায্য ভিক্ষা করেন, ডক্টর মোহর আলী হাত দিয়ে ইশারা করে মানা করে দেন। আশ্চর্য, পাকিস্তান সামরিক চক্রের এই বন্ধুরা একটি জীবনকেও রক্ষা করতে পারল না? ১৪ই ডিসেম্বরের আগের রাত্রে প্রতিবেশীরা কেউ আশ্রয় দেননি সন্তোষ বাবুকে, তার পরিবারবর্গকে— তবে সন্তোষ বাবুকে নিয়ে যাবার পরে শ্রীমতী ভট্টাচার্য ও স্বপ্নাকে রেজিস্ট্রার নূরুদ্দীন সাহেব আশ্রয় দেন। অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্যকে আল-বদরেরা ধরে নিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে একজন প্রতিবেশী এই বাড়ীতে এসে সহানুভূতি প্রকাশ করে বলে যায়, 'আহা, স্যারের মত মানুষকে ধরে নিয়ে গেল, আমরা তো কল্পনাও করতে পারি না'?

ডক্টর আবুল খয়ের

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর আবুল খয়েরের মতো রাজনীতি সচেতন শিক্ষক আমি খুব কম দেখেছি। তার অর্থ এই নয় যে, তিনি বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক ছিলেন, বিশেষ কোন মতাদর্শের দাসত্ব তিনি করেননি। অত্যন্ত খোলা মন নিয়ে তিনি সমসাময়িক দেশকালের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতির পর্যালোচনা করতেন এবং একটি উন্নতিশীল দেশের একটি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সচেতন শিক্ষক হিসেবে আপন কর্তব্য যথাযথভাবে করে যেতেন। কিন্তু ডক্টর খয়ের উচ্চকণ্ঠ ছিলেন না, চীৎকার করে কথা বলতেন না, কলরব করে তর্ক করতেন না, ধীর স্থির ও শান্তভাবে যুক্তির সাহায্যে আপন বক্তব্যের উপস্থাপনা করতেন। নিজের মতামত অপরের ওপরে জোর করে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন না কিন্তু কোন ভয় ভীতিতে আপন মতামতকেও কখনও বিসর্জন দিতেন না। ষাটের কালো দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যখন মোনেম খানের এন. এস. এফ'র দোর্দণ্ড প্রতাপে নরককুণ্ডে পরিণত হয়েছিল সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনগুলোতে যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন অধ্যাপক আপন বিবেককে বিসর্জন দেননি সামান্য লাভ-ক্ষতির সূক্ষ্ম বিচারের কাছে অত্মসমর্পণ করেননি ডক্টর খয়ের তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে

তাঁর আসন ছিল শ্রদ্ধার। এমন মানুষটিকেও বদর বাহিনীর শিকার হতে হল?

মুক্তি সংগ্রাম চলাকালে ডক্টর খয়ের দেশ ত্যাগ করেননি যেমন করেননি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক কিন্তু ঐ সময়েও খোলাখুলিভাবে আপন বক্তব্য উচ্চারণ করতে তাঁকে পিছ পাও হতে দেখিনি। দালাল্ শিক্ষকদের সঙ্গে, পাকিস্তানবাদী শিক্ষকদের সঙ্গে তাঁকে আমরা তখনও তর্ক করতে দেখেছি, ফলে তাঁকে গ্রেফতার হতে হল। মুক্তি সংগ্রামের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে পাঁচজন অধ্যাপককে গ্রেফতার করা হয়েছিল, ক্যান্টনমেণ্টের খাঁচায় পুরে রাখা হয়েছিল ডক্টর আবুল খয়ের তাঁদের অন্যতম ছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা যখন রণ সাজে সজ্জিত হয়ে মধ্য রাত্রে তাঁকে গ্রেফতার করতে এসেছিল তখনও তিনি ভীত হননি, ওয়ারেণ্ট দেখতে চেয়েছেন, কারণ জানতে চেয়েছেন, তর্ক করেছেন। অন্য সহকর্মীদের বাড়ী দেখিয়ে দিতে বললে তা করতে অস্বীকার করেছেন। ঐ সব মুহূর্তে অতিশয় সাহসী ব্যক্তিকেও সন্ত্রস্ত হতে দেখেছি কিন্তু ডক্টর খয়ের ছিলেন এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। ডক্টর খয়ের পাকিস্তানী সামরিক বন্দী শিবিরে যে অনমনীয় মনোবলের পরিচয় দিয়েছেন তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

ডক্টর খয়েরের সঙ্গে আমিও গ্রেফতার হয়েছিলাম, একই সঙ্গে বন্দী জীবনযাপন করেছিলাম তখন এই মানুষটিকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ হয়েছিল। বন্দী শিবিরেই মানুষের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়. সে সময়ে ডক্টর খয়েরের ব্যক্তিত্বের, সাহসের, ধৈর্যের আর স্থৈর্যের যে পরিচয় পেয়েছিলাম তার কোন তুলনা নেই। বন্দী শিবিরে তিনি আমাদের নেতা ছিলেন, সে শুধু বয়োজ্যেষ্ঠ বলে নয়, তিনি ছিলেন আমাদের সাহসের, প্রেরণার মনোবলের উৎস। বন্দী জীবনে একটি মুহূর্তের জন্যেও তাঁকে হতাশায় আচ্ছন্ন হতে

দেখিনি, মৃত্যু ভয়ে ভীত হতে দেখেনি। তিনি বলতেন, 'দেশ স্বাধীন হবেই, আমরা হয়তো দেখে যেতে পারব না কিন্তু আমরা মাথা নীচু করব না'। বস্তুতঃ ডক্টর খয়েরের নেতৃত্বে বন্দী শিবিরে জিজ্ঞাসাবাদের সময়ে আমরা মাথা নীচু করিনি, কোন মিথ্যা স্বীকারোক্তিতে স্বাক্ষর করিনি, পেছনে ফেলে আসা সহকর্মীদের নামে মিথ্যা বানোয়াট অভিযোগকে প্রাণের ভয়ে সত্য বলে সাক্ষ্যও দেইনি। ডক্টর খয়ের বন্দী শিবিরে বলতেন, 'আমরা ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, প্রাণ ভয়ে, মানসিক, দৈহিক নির্যাতনের ভয়ে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহান সংগ্রামী ঐতিহ্যকে কলঙ্কিত করব না।'

ঢাকা দ্বিতীয় রাজধানীর (তখন ক্যান্টনমেন্টে রূপান্তরিত) বন্দী শিবিরে আমরা পাঁচজন অধ্যাপক ছিলাম, ডক্টর আবুল খয়ের, অধ্যাপক আহসানুল হক, অধ্যাপক সাদউদ্দীন, অধ্যাপক শহীদুল্লাহ এবং আমি। প্রথমে আমরা একই ঘরে ছিলাম, পরে আমাকে এবং শহীদুল্লাহকে অন্য ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়, শেষে আমাকে এবং শহীদুল্লাহকেও বিচ্ছিন্ন করা হয়। আমরা পাঁচজন যতদিন একসঙ্গে ছিলাম ততদিন পরামর্শ করে বন্দী শিবিরে বিশেষতঃ জিজ্ঞাসাবাদের সময়ে আমাদের কর্তব্য আমরা স্থির করে নিয়েছিলাম এবং জিজ্ঞাসাবাদ বা ইন্টারোগেশনের কঠিন পরীক্ষা আমরা সাহসের সঙ্গে মোকাবেলা করেছিলাম। সেই সময় আমরা এ কথাও স্থির করেছিলাম যে, যদি দৈবাৎ আমরা বেঁচে যাই, যদি হঠাৎ ছাড়া পেয়ে যাই তাহলেই বা আমাদের কর্তব্য কি হবে। আমরা স্থির করেছিলাম ছাড়া পেলে আমরা পালাবো, পাক বাহিনী বা তাদের অনুচরদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকব, আমরা চারজনেই তদনুসারে কাজ করেছিলাম কিন্তু ডক্টর আবুল খয়ের যে কেন তা করেননি তা আজও আমরা ভেবে পাই না। জিজ্ঞাসাবাদের সময় আমরা স্পষ্টতঃ বুঝেছিলাম যে, এই বর্বরদের হাত থেকে আমাদের রেহাই নেই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

অধ্যাপকদের ওপর পাক সামরিক চক্রের বিশেষ ক্রোধ ছিল। সে অবস্থায় ছাড়া পেলেও আমরা বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করব সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।

আন্তর্জাতিক চাপের ফলে পাক সামরিক চক্র অধ্যাপকদের মুক্তি দিতে বাধ্য হলেও তারা স্থির করেছিল ছেড়ে দিয়ে পরে আলবদরের দিয়ে তাদের খতম করা হবে। তাই মুক্তি দিলেও আমাদের প্রত্যেকের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল ব্রিগেডিয়ার বশির। বস্তুত মেজর হায়দার নামক একজন পাঞ্জাবী অফিসার আমাদের পেছনে লেগেই থাকত। মুক্তির কয়েকদিন পরেই ঐ মেজর হায়দার আমাদের ডেকে পাঠান কিন্তু ডক্টর খয়ের ছাড়া আমরা সবাই তার আদেশ উপেক্ষা করি। পরে আবার ডক্টর খয়ের এবং আমাকে ডেকে পাঠান হয় ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে একদিন সন্ধ্যায়। আমি স্থির করেছিলাম এবারেও মেজর হায়দারের আদেশ উপেক্ষা করব কিন্তু ডক্টর খয়ের বললেন, 'আমাদের যাওয়া উচিত নইলে বিপদ হতে পারে'। সেদিন সন্ধ্যায় মেজর হায়দারের কাছে হাজিরা দিতে গিয়ে দেখলাম ডক্টর খয়ের আসেননি আমি একা। মেজর হায়দার এবং কুমিল্লার ইনটারোগেটিং অফিসার মেজর কোরেশি আমাকে দুই তিন ঘণ্টা ধরে জেরা করলেন এবং বলে দিলেন, অতি শীঘ্রই ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধবে এবং তখন যেন আমি ডক্টর খয়েরকে নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট-এ চলে যাই। সেদিন সন্ধ্যায় ঐ দুই মেজরের সঙ্গে কথা বলেই আমার সন্দেহ হল তাদের উদ্দেশ্য খুব খারাপ। পরদিন সকালেই আমি গা ঢাকা দিলাম, সরে যাবার আগে সহকর্মীদের যতজনকে সম্ভব সতর্ক করে দিয়ে গেলাম কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ডক্টর খয়েরকে সাবধান করে দিয়ে যেতে পারিনি। আমার ধারণা ছিল ডক্টর খয়ের যখন ঐ দিন সন্ধ্যায় মেজর হায়দারের কাছে যাননি তখন নিশ্চয়ই তিনি সরে পড়েছেন।

কিন্তু আমিতো জানতাম না যে, বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকায় নিজ বাড়ীতেই দালাল শিক্ষক পরিবেষ্টিত হয়ে ডক্টর খয়ের আল বদরের হিংস্রতার শিকার হবার জন্যে অপেক্ষা করছেন, যারা চৌদ্দই ডিসেম্বর স্বাধীনতার মাত্র দু'দিন আগে ডক্টর খয়েরকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল তাঁর স্ত্রী আর সন্তানদের কাছ থেকে, নিয়ে গেল সন্তোষ বাবু, গিয়াসুদ্দীন, ডাক্তার মুতুর্জা, আনোয়ার পাশা, রশিদুল হাসান, ডক্টর মহী, ডক্টর সিরাজুল হক খান ওদের সঙ্গে মাটি লেপা সেই লাল স্টেট বাসটায় করে, মীরপুরে গোরস্থানের পাশে, ধানক্ষেতে, তারপরে শেষ করে দিল সবাইকে, পুঁতে ফেলল ঐ ধান ক্ষেতে। আজ যারা সবাই চির নিদ্রায় শায়িত বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের পাশে সবুজ ঘাসের মধ্যে। আমার শুধু মনে হয় ডক্টর খয়ের কি বন্দী শিবির থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন চির মুক্তি লাভের জন্যেই ?

ডাক্তার মোহাম্মদ মর্তুজা

ডাক্তার মর্তুজা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম চিকিৎসক, পঁচিশে মার্চ রাত্রিতে তিনি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলেন। তিনি পঁচিশে মার্চের ভয়াবহ রাত্রি শেষে কারফিউর মধ্যেও পাশের এক বাড়ীতে গিয়ে ইকবাল হল থেকে আহত অবস্থায় পালিয়ে আসা দুইজন ছাত্রের চিকিৎসা করেন। বাড়ী ফিরে আসবার সময় তিনি পাক ঘাতকদের নজরে পড়ে যান, তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে নিহত অধ্যাপক মুকতাদিরের মৃতদেহ বহন করান হয় এবং পরে গুলী করার জন্যে দাঁড় করান হয়, কিন্তু জনৈক অফিসার এসে পড়ায় তিনি বেঁচে যান। চিকিৎসক জেনে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

ডাঃ মর্তুজার চিকিৎসক পরিচয়টাই বড় নয় তিনি ছিলেন একধারে ডাক্তার, সাহিত্যিক, রাজনীতিক। সমাজনীতি, রাজনীতি অর্থনীতিতে তাঁর অপরিসীম কৌতূহল এবং অগাধ পড়াশুনা ছিল। লিখেছেনও তিনি প্রচুর, জন-সংখ্যা সমস্যা সম্পর্কিত তাঁর পুস্তকটি পুরস্কারও লাভ করেছিল। কিছু কিছু সাংবাদিকতাও করতেন তিনি, 'গণশক্তি'র সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। রাজনীতিতে তিনি বামপন্থী ছিলেন এবং কখনও নিজের রাজনৈতিক মতাদর্শ গোপন করবার চেষ্টা করতেন না। তিনি ছিলেন অসম্ভব রকম সাহসী। সামাজিক প্রভাব, প্রতিপত্তি বা প্রতিষ্ঠার প্রতি তিনি ছিলেন একান্ত উদাসীন।

চিকিৎসক হিসেবেও তাঁর দক্ষতা ছিল খুবই বেশী, তিনি একজন আধুনিক ও সার্থক চিকিৎসক ছিলেন। তবে তিনি রোগের চিকিৎসা অপেক্ষা রোগের কারণ এবং উৎস খুঁজতেন বেশী সে কারণেই সামাজিক অসাম্য, শ্রেণী বৈষম্য দুর করায় এত উৎসাহী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন রোগের প্রকৃত কারণ দূর করতে না পারলে সমাজ থেকে ব্যাধি দুর করা যাবে না। সামাজিক ব্যাধির চিকিৎসক ছিলেন ডাঃ মর্তুজা এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে চীনা পদ্ধতিতেই কেবল মাত্র একটি অনুন্নত এশীয় দেশের সমাজ দেহের জরা ব্যাধি দুর করা সম্ভব তাই তিনি রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন এবং চীনাপন্থী রাজনীতিতে। কিন্তু চীনের বন্ধু পাক সামরিক চক্র এবং তাদের অনুচর আল-বদরেরা সে জন্যে ডাঃ মর্তুজাকে রেহাই দেয়নি, যেমন তারা রেহাই দেয়নি চীনাপন্থী রাজনীতিক সায়ীদুল হাসানকে এবং আরও বহু বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীকে।

ডাঃ মর্তুজা মুক্তি সংগ্রামের নয়টি মাস ফুলার রোডের বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাতেই থেকে যান সপরিবারে, দেশ ত্যাগের কথা তিনি ভাবতেও পারেননি এমনকি পঁচিশে মার্চের রাতে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেয়েও না। ডাঃ মর্তুজা যে চীনা পন্থী ছিলেন তা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজে সবারই জানা ছিল, যে সব দালাল শিক্ষক ফুলার রোডে তার প্রতিবেশী ছিল তারাও তা ভাল করেই জানতেন। কিন্তু ডাঃ মর্তুজা যা জানতেন না তা হল এই যে তাঁর চীনপন্থী মনোভাব এবং রাজনীতির সত্ত্বেও তিনি জামাতে ইসলামী, ইসলামী ছাত্র সংঘ বা আল-বদরের তালিকা থেকে বাদ পড়ার যোগ্যতা অর্জন করেননি।

১৩ই ডিসেম্বর তিনি অন্যত্র চলে যাবার জন্যে জায়গা ঠিক করে এসেছিলেন, হয়তো চলেও যেতেন কিন্তু এরই মধ্যে তাঁর প্রতিবেশীরা এলেন, সামনের বাড়ীর ডক্টর মুস্তাফিজুর রহমান এবং অধ্যাপক আশকার ইবনে শাইখ আর পাশের বাড়ীর অধ্যাপক সাবির, অনেক

আলোচনা হল। যুদ্ধের শেষ পর্যায়, তখন, স্বাভাবিকভাবেই সকলে ভীত, ডাঃ মর্তুজা সকলকে সাহস দিলেন, একজন তো বললেন, 'আমার তো ভীষণ ভয় লাগে, আপনি এত সাহসের কথা বলেন কি করে আমার তো ঘুম হয় না সারা রাত।' ডাঃ মর্তুজা তবু অভয় দেন। অধ্যাপক আশকার ইবনে শাইখ কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেন ডাঃ মর্তুজার ড্রইং রুমে। ডঃ মোস্তাফিজুর রহমান, অধ্যাপক সাবের রাজনীতি আর যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেন দীর্ঘ সময় ধরে। এভাবেই কেটে যায় ১৩ই ডিসেম্বর ততক্ষণে কারফিউ হয়ে গেছে কাজেই সেদিন আর ডাঃ মর্তুজার অন্যত্র চলে যাওয়া হয় না। ১৪ই ডিসেম্বর সকাল, হয়তো সেদিন তিনি স্ত্রী-কন্যা নিয়ে অন্যত্র চলে যেতেন কিন্তু তাঁকে আর সে সুযোগ দিল না আল-বদরের ঘাতকেরা। ডাঃ মর্তুজা ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়েছেন সবে এরই মধ্যে মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে মাটি লেপা সেই লাল স্টেট বাসটি এসে উপস্থিত হয়ে যায়, নেমে আসে রাইফেলধারী আঠার বিশ বছর বয়স্ক কয়েকটি ছেলে, পরনে তাদের ছাই রং-এর ইউনিফর্ম। দরজা খুলে দিয়ে ডাঃ মর্তুজা তাদের 'আচ্ছালামু আলাইকুম' সম্বোধন জানান। ডাঃ মর্তুজার যথার্থ নাম যাচাই করে নিয়ে তারা বেগম মর্তুজাকে বন্দুক ধরে ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়, বারান্দায় তার ছোট মেয়ে মিতির সাদা-কালো ডুরে শাড়ীটা ঝুলছিল সেটা দিয়েই মর্তুজার চোখ বেঁধে নিয়ে গাড়ীতে তুলে নেয়। ওপর তলায়ও তারা গিয়েছিল অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর খোঁজে, কিন্তু তাঁকে না পেয়ে তাঁর গৃহভৃত্য নুরুকে গাড়ীতে উঠিয়ে নেয় চৌধুরী সাহেবের ঠিকানা দেখিয়ে দেবার জন্যে। সামনের বাড়ী থেকে আরবীর অধ্যাপক ডক্টর মুস্তাফিজুর রহমানের শ্যালক অধ্যাপক সালাউদ্দীনকেও তারা সঙ্গে নেয়, পরের দিন ঐ সালাউদ্দীন ফিরে আসে। আর কেউ ফিরে আসেননি, ঐ গাড়ীতে আরও যারা

গিয়েছিলেন অধ্যাপক গিয়াসুদ্দীন, ডক্টর খয়ের, ডক্টর মহী, অধ্যাপক আনোয়ার পাশা, অধ্যাপক রশিদুল হাসান, অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্য, ডাঃ মর্তুজা কেউ ফিরলেন না। মীরপুরে বধ্যভূমিতে নিয়ে তাঁদের হত্যা করা হয়েছিল। ডাঃ মর্তুজার মৃতদেহ পরে সনাক্ত করা হয়েছিল মিতির শাড়ীটা দিয়ে।

আরবীর অধ্যাপক ডক্টর মুস্তাফিজুর রহমানের শ্যালক সালাউদ্দীনকে কেন আল-বদরেরা সঙ্গে নিয়েছিল তা জানা যায়নি, তিনি পরের দিন বাড়ীতে ফিরে আসেন। বেগম মর্তুজা তার সঙ্গে অনেক কষ্টে দেখা করলেও বিশেষ কিছুই বলেননি তিনি, শুধু নাকি এইটুকুই জানা যায় তার কাছ থেকে যে আল-বদরেরা রাত্রে তাকে ডাল, রুটি খেতে দিয়েছিল। এই সালাউদ্দীনই সম্ভবতঃ একমাত্র ব্যক্তি যিনি নিহত অধ্যাপকদের সঙ্গে গিয়েও ফিরে এসেছিলেন।

ডাঃ মর্তুজাকে নিয়ে যাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রতিবেশী ডক্টর আফতাব আহমদ সিদ্দিকী আসেন, বেগম মর্তুজাকে সাহস দিয়ে যান, কোন চিন্তা করতে মানা করেন। সামনের বাড়ী থেকে এক প্রতিবেশী আসেন তিনি বেগম মর্তুজাকে বলেন, ডাঃ 'মর্তুজাকে তো গ্রেফতার করেনি, ওকে চিকিৎসা করানোর জন্যে নিয়ে গেছে।' বেগম মর্তুজা যখন জানতে চান 'তাহলে লুঙ্গিপরা অবস্থায় চোখ বেঁধে নিয়ে গেল কেন' ? তিনি বলেন, 'ওরা রাজাকার, অশিক্ষিত তাই।' বিশ্ববিদ্যালয় কেয়ারটেকার দলিলউদ্দীন এসেছিলেন, তিনি নাকি বলেন, 'ওরা সব লালবাগ ফাঁড়ীর রাজাকার সঙ্গে একজন এস, আই'। বেগম মর্তুজা অনুনয় করেন, 'আপনি তো চেনেন, ছাড়িয়ে আনেন, আপনার তো কারফিউ পাস আছে, অন্ততঃ ভি. সি. ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের কাছে যান।'

তিনি নাকি ভাইস-চ্যান্সেলারের কাছে গিয়েছিলেন এবং সাজ্জাদ সাহেব নাকি বলে দিয়েছিলেন ওদের ব্রিগেডিয়ার বশির নিয়ে গেছে,

কারফিউ উঠে গেলে তিনি জেনারেল নিয়াজীকে টেলিফোন করতে উপদেশ দিয়েছেন। আরও আসেন ইসলামিক ইতিহাসের অধ্যাপক মাহদি হাসান, তিনি বলেন, 'ওরাতো আমার বাসায়ও এসেছিল এবং আমার বাসায় যে ছেলেটা রান্না করে তার সঙ্গে হ্যাণ্ড সেক করে গেছে।' তবে অধ্যাপক মাহদি হাসান কারফিউর মধ্যেও বেগম মর্তুজাকে ভাইস-চ্যান্সেলার ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু বাধা দিলেন এক প্রেতিবেশী। বললেন 'ওর সঙ্গে যাবেন না।' ১৭ই ডিসেম্বর উর্দু বিভাগের প্রধান ডক্টর আফতাব আহমেদ সিদ্দিকী পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর যখন এই দালানে এসেই আশ্রয় নেন তখন তিনি ডাঃ মুর্তুজার স্ত্রীকে বলেন, 'আল্লা আল্লা কর'। শেষ সময়ে হয়তো তিনি সত্য কথাই বলেছিলেন।

ডাক্তার আলীম চৌধুরী

ঢাকার বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক ডাক্তার আলীম চৌধুরীকে হানাদার সরকার একাত্তুরের জুন মাসে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজে বদলি করেছিল, তারপর আবার ৪ঠা নবেম্বর তারিখে তাঁকে ঢাকায় ফিরিয়ে আনা হয় আল-বদরের শিকার হবার জন্যে। রাজশাহী থেকে তিনি ওপারে চলে যাবার কথা ভাবতেন কিন্তু একটা বড় বাধা ছিল, ঢাকায় তাঁর আশ্রয়েই ছিলেন পুরো শ্বশুর পরিবার এবং তারা অমুসলমান। তাঁর শ্বশুর ছিলেন অসুস্থ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, এই মৃত্যু পথযাত্রীকে এবং অসহায় পরিবারটিকে ফেলে মানবিক কারণেই ডাঃ আলীম চৌধুরী রাজশাহী থেকে চলে যেতে পারলেন না, ফিরে এলেন ঢাকায়। আর এমনই দুর্ভাগ্য তাঁর পল্টনের বাড়ীর নীচের তলার বাশিন্দা মওলানা মান্নান। এই মওলানা এককালে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক ছিলেন আর হানাদার কবলিত বাংলাদেশে পাকিস্তানীদের প্রাণের দোসর। দিন-রাত তার কাছে মিলিটারী অফিসার, শান্তি কমিটির কর্মকর্তা, রাজাকার, আল-শামস আসা-যাওয়া করত। এর মধ্যে ডাঃ আলীম চৌধুরী ওপরে গোপনে মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের চিকিৎসা করতেন, তাদের ওষুধপত্র, টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করতেন। অবশ্য তিনি কয়েকবারই সংকল্প করেছিলেন নাজিমুদ্দিন রোডে এক আত্মীয়ের বাড়ী চলে যাবেন, স্ত্রী শ্যামলী চৌধুরী তৈরীও

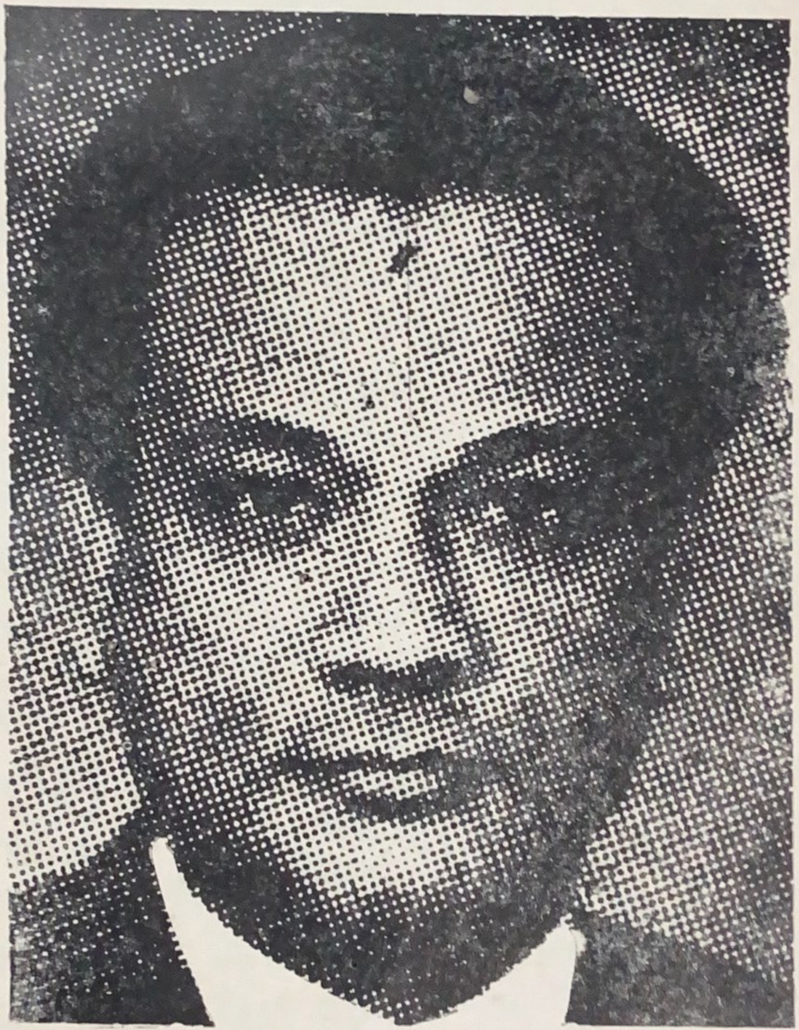

হয়েছিলেন কিন্তু যাওয়া আর হয়ে উঠেনি। মওলানা মান্নানের প্রতিবেশী হয়েই তিনি থেকে গেলেন।

একাত্তুরের ১১ই ডিসেম্বর, ঢাকা ইউ. এস. আই. এস.-এ মুক্তি বাহিনীর প্রচণ্ড গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটে প্রকাশ্য দিবালোকে, সেদিন সাংবাদিক হেদায়েত হোসেন মোর্শেদ এবং মেসবাউজ্জামান ও আর একজন ডাক্তার চোখ দেখাতে গিয়ে ডাঃ চৌধুরীর বাড়ীতে আটকে যান কারফিউর জন্যে। সাংবাদিক মোর্শেদ এবং মেসবাউজ্জামান কারফিউর মধ্যেই চলে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু ডাঃ চৌধুরী তাঁদের যেতে দেননি। ১২ তারিখ থেকে আল-বদরেরা বিভিন্ন বিশিষ্ট সাংবাদিকদের বাড়ীতে হানা দিতে শুরু করে, সেদিন হেদায়েত হোসেন ডাঃ চৌধুরী আশ্রয় না দিলে তিনিও হয়তো আল-বদরের শিকার হতেন। ১৩ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ওরা ছিলেন ডাঃ আলীম চৌধুরীর সঙ্গে। ডাঃ চৌধুরী মোর্শেদের চোখের পট্টি লাগিয়ে দিয়েছিলেন যাতে মওলানা মান্নান সন্দেহ করতে না পারে। মওলানা মান্নানের বাড়ী গিয়ে তাঁরা জানিয়েও দিলেন যে, চোখ দেখাতে এসে আটকে গেছেন। মওলানা মান্নান অবশ্য পাক-বাহিনীর ক্যাপ্টেন কাইয়ুমকে টেলিফোন করে আনিয়ে কারফিউর মধ্যেই তাঁদের পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিলেন! ১১ই ডিসেম্বর রাত্রিটা ঐ সাংবাদিক বন্ধু দুইজনের সঙ্গে কাটিয়ে দেন আলীম চৌধুরী। কারফিউ ব্ল্যাক আউট আর বিমান আক্রমণের মধ্যে তারা রাজনীতি আর যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেন। ডাঃ আলীম চৌধুরী মাঝে মাঝে ডাঃ রাব্বীর সঙ্গেও টেলিফোনে আলাপ করছিলেন। অসুস্থ শ্বশুর সম্পর্কে চিকিৎসার উপদেশ নিচ্ছিলেন।

১২ই ডিসেম্বর সকালে কারফিউর মধ্যেই মওলানা মান্নান রাস্তার উল্টো দিক থেকে ইউ. পি. পি'র সাংবাদিক মওলানা গনিকে ডেকে নিয়ে আসেন এবং সকলকে সপ্তম নৌ-বহরের আসন্ন হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা কথা উল্লাস ভরে পরিবেশন করেন। তখনই জানা যায় যে, বিশিষ্ট

সাংবাদিক সিরাজুদ্দিন হোসেন সাহেবকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মওলানা মান্নান সবাইকে বলেন, 'সিরাজুদ্দিন হোসেনকে ঠিক জায়গাতেই ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এদেশের বুদ্ধিজীবীরা সব মালাউন হয়ে গেছে' ইত্যাদি। এসব কথার ফাঁকে ফাঁকে মওলানা মান্নান বার বার ক্যাপ্টেন কাইয়ুমকে টেলিফোন করছিলেন। কারফিউর মধ্যে ১২ই ডিসেম্বর দিন আর রাত কাটল আলীম চৌধুরীর ঐ সাংবাদিক অতিথিদের নিয়ে। রাতে তিনি তাদের বলেছিলেন, ডাক্তার না হয়ে সাহিত্যিক হওয়াই উচিত ছিল তার। বলেছিলেন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র জীবনে তাঁর বিভিন্ন আন্দোলনের অভিজ্ঞতার কথা। তাঁর বের করা 'যান্ত্রিক' 'খাপছাড়া' কাগজ দেখালেন তাদের। বস্তুতঃ ডাঃ আলীম চৌধুরীর চিকিৎসক পরিচয়ই বড় পরিচয় ছিল না, বিভাগোত্তর ঢাকার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আন্দোলনে বিশেষতঃ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ভাল আবৃত্তি করতেন তিনি, টেইপে ধরা ছিল রবীন্দ্রনাথের 'ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে, ক্ষমাহীন এ সংসারে' সাংবাদিকদ্বয়কে শুনিয়েছিলেন তিনি সে আবৃত্তির রেকর্ড। ১২ই ডিসেম্বর রাতে ডাঃ আলীম চৌধুরী অধিকৃত এলাকায় মুক্তি সংগ্রামে ডাক্তারদের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। দেশ স্বাধীন হলে তিনি যে ভ্রাম্যমান চক্ষু চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করে দেশময় চক্ষু রোগের চিকিৎসা করে বেড়াবেন সে পরিকল্পনার কথাও বলেন। আর বলেন, 'দেশ তো স্বাধীন হবেই, কেবল ভয় হয় আমরা না ধ্বংস হয়ে যাই'!

১৩ই ডিসেম্বর সকালে কিছুক্ষণের জন্যে কারফিউ উঠে গেলে সাংবাদিক বন্ধুরা চলে যান, যাবার সময় বার বার তাঁকে অনুরোধ করে যান তিনি যেন অবশ্যই এ বাড়ী ছেড়ে চলে যান। ডাঃ আলীম চৌধুরী সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আশ্রয় নেবার কথা ভেবেছিলেন এবং সব ব্যবস্থা করার জন্যে ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে

সকালে কিছুক্ষণের জন্যে কারফিউ উঠে গেলে হাসপাতালে গিয়েছিলেন, সেখানে সহকর্মী অনেক ডাক্তারই ইতিমধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সে সময়ে সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল ছিল কুখ্যাত রাও ফরমান আলীর আত্মীয় ডাক্তার লতিফ। ডাক্তার লতিফের কাছে গিয়ে আলীম চৌধুরী হাসপাতালে আশ্রয় চেয়েছিলেন কিন্তু ফরমান আলীর ঐ আত্মীয়টি তাঁকে বলে দিয়েছিল, 'আলীম, আমি দুঃখিত তোমাকে আশ্রয় দিতে পারব না, তবে আজ সমস্ত দিন বাড়ীতে থাকবে, ইমারজেন্সী ডিউটিতে ডাকতে পারি,' ডাঃ লতিফের এই কথাতে ডাঃ চৌধুরী একেবারে ভেঙে পড়েন। কিন্তু ডাক্তার লতিফের কথা শুনেও যে তিনি বুঝতে পারেননি কি আসছে ভবিষ্যতে এইটেই আশ্চর্য। দুপুর বারটা থেকে কারফিউ, তখন আর সময়ও নেই অন্য কোথাও চলে যাবার ফলে তিনি বাড়ী ফিরে যান, সংকল্প করেন পরের দিন অন্যত্র চলে যাবেন। কিন্তু আল-বদরের ঘাতকেরা তাঁকে আর সে সুযোগ দেয়নি। ১৫ই ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে চারটায় ডাঃ আলীম চৌধুরী আর তাঁর স্ত্রী শ্যামলী চৌধুরী বারান্দায় বসে পিলখানায় মিত্রবাহিনীর বিমান হামলা প্রত্যক্ষ করেছিলেন এই সময় এল মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে মাটি লেপা একটি মাইক্রোবাস। ঐ বাস থেকে নামল দশ এগার জন আল-বদর, তারা প্রথমে নীচে মওলানা মান্নানের কাছে যায় এবং প্রায় বিশ মিনিট সেখানে অতিবাহিত করে তারপর ওপরে এসে দরজায় ঘা দেয়। ডাঃ চৌধুরী সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যান এবং মওলানা মান্নানের দরজায় ঘা দিতে থাকেন। পাঁচ মিনিট ধরে দরজায় আঘাত করার পরে মওলানা মান্নান দরজাটা একটু ফাঁক করে শুধু বলে আপনি যান। ডাঃ আলীম চৌধুরী আবার উপরে উঠে আসতে চেষ্টা করেন কিন্তু ঘাতকেরা তাকে আর সে সুযোগ দেয় না, তার নামও জিজ্ঞেস করে না, বন্দুক ধরে তাঁকে শার্ট আর লুঙ্গি পরা অবস্থাপেই মাইক্রোবাসে নিয়ে ওঠায়।

ডাঃ আলীম চৌধুরীকে নিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বেগম শ্যামলী চৌধুরী নীচে ছুটে গিয়ে মওলানা মান্নানের পায়ে পড়েন, অনুনয় করে বলেন 'গাড়ীটা এখনও ছাড়েনি, আপনি একটু যান ওকে বাঁচান' মওলানা কোন কথাই বলে না, গাড়ীটা ছেড়ে দিলে তবে বলে, 'আপনি চুপ করে বসেন, এরা সব আমার ছাত্র, আল-বদর, চোখ দেখাতে নিয়ে গেছে, অস্থির হবেন না, আরও ডাক্তারকে নিয়েছে, ডাঃ রাব্বীকেও নিয়েছে।' বেগম চৌধুরী জিজ্ঞেস করেন, 'তাহলে বন্দুক ধরে নিয়ে গেল কেন ?' মওলানা উত্তর দেয়, 'আজকাল ডাক্তাররা যেতে চায় না তাই।' এরপর মওলানা মান্নান কাইয়ুমকে টেলিফোন করে আর বেগম চৌধুরীকে মিথ্যা প্রবোধ দেয়, 'সি এম এইচ এ আছেন, রাত্রেই দিয়ে যাবে'। সে রাত্রি আর কোন দিন আসেনি, তবে পরদিনও মওলানা খুশী মনে জানায় 'সি এম এইচ-এ আছে।' বেগম চৌধুরী বিশ্বাস করতে পারেন না তাই পুলিশ এবং সামরিক বন্দী শিবিরের চিকিৎসক ডাঃ ওয়াকিল আহমেদকে টেলিফোন করেন, অনুরোধ করেন স্বামীর খবর নিয়ে জানাতে। পাক সামরিক বাহিনীর চিকিৎসক ডাঃ ওয়াকিল আহমেদ বেগম চৌধুরীকে আরও বড় মিথ্যা উত্তর দেন, 'ডাঃ আলীম চৌধুরী সি. এম. এইচ. এ. নেই, কাউকে জানাবেন না, ওকে মুক্তিবাহিনী ধরে নিয়ে গেছে।' ডেপুটি স্পীকার আবদুল মতিন আর 'প্লেনট্রুথ' ভাষ্যকার আজিজুর রহমানও জানায় 'সি এম এইচ এ আছেন, চোখ দেখাতে নিয়ে গেছে।' এই ভাবে পাকিস্তানীদের বন্ধুরা একের পর এক মিথ্যা প্রবোধ দিতে থাকে বেগম চৌধুরীকে। বস্তুতঃ ডাঃ আলীম চৌধুরীকে সি. এম. এইচ. এ. বা মুক্তি বাহিনীতে নেয়নি, তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল মোহাম্মদপুরে কাঁটাবনে, ডাঃ রাব্বীকেও একই জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, ওখানেই আল বদরের কশাইরা বাংলার এই দুই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসককে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। ১৮ই ডিসেম্বর দুই বন্ধুর

মৃতদেহ পাওয়া যায় ঐ জায়গায়, ডাঃ আলীম চৌধুরীর হাত দুইটি নারকেলের দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল। ডাঃ চৌধুরীর কপালে, কোমরে বেয়নেটের ক্ষত ছিল, বুকে ছিল বুলেটের আঘাত কিন্তু মুখটি ছিল হাসি মাখা। হাসি মুখে মৃত্যুবরণ করেন ডাঃ আলীম চৌধুরী।

১৬ই ডিসেম্বর হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণের পর সাংবাদিক হেদায়েত হোসেন মোর্শেদ ডাঃ চৌধুরীর বাড়ীতে গিয়ে দেখেন বেগম চৌধুরী স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন, টেইপে বাজছে আলীম চৌধুরীর কণ্ঠস্বর, 'ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে ক্ষমাহীন এ সংসারে……তারা বলে গেল ক্ষমা কর সবে, বলে গেল ভালবাস।'

ডাক্তার ফজলে রাব্বী

শ্রেষ্ঠ বাঙালী চিকিৎসক প্রতিভা ডাক্তার ফজলে রাব্বীর মতো ব্যক্তিত্ব যে কোন দেশের যে কোন জাতির, যে কোন সমাজের পক্ষে গর্বের বিষয়। বাঙালী যাদের নিয়ে গৌরব করতে পারতো তাদের আনেককেই হারাতে হয়েছে স্বাধীনতার পূর্বলগ্নে, ডাক্তার রাব্বীও তাদের একজন। বস্তুতঃ পাক পশুবাহিনী আর তাদের অনুচরেরা মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ডাক্তার ফজলে রাব্বী, শহীদুল্লা কায়সার, ডাক্তার আলীম চৌধুরী প্রমুখ প্রতিভা থেকে স্বাধীন বাঙালী জাতিকে বঞ্চিত করেছে তাই আজ স্বাধীন দেশে চারদিকে দেখতে পাই প্রতিভাহীন মুর্খদের আস্ফালন নকলবাজদের লীলারঙ্গ। আজ আমাদের গর্ব করার মতো বাগ্মী নেই, সত্যিকারের ডাক্তার নেই, নেই যথার্থ ঔপন্যাসিক। এক শূন্যতার মধ্যে বিরাজ করছি আমরা, যে শূন্যতা নিষ্ঠার, দক্ষতায় উৎকর্ষের। এক কথায় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকৃত প্রতিভাবনের অভাব আজ বড় বেশী অনুভূত হচ্ছে। পদ, অর্থ, ক্ষমতা আর প্রভাব দিয়েতো প্রতিভার অভাব পূরণ করা যায় না। ডাঃ রাব্বীর অভাব তাই আজ বড় বেশী অনুভূত হয়। ডাঃ রাব্বীর মতো ডাক্তার আর হবে?

ডাঃ ফজলে রাব্বী এ দেশের একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক মাত্রই ছিলেন না, এদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি,

সমাজ সর্ব বিষয়ে তাঁর নিজস্ব একটা চিন্তাধারা ছিল, সে জন্যেই একাত্তুরের মার্চ মাসে অসহযোগ আন্দোলনের সময় ডাঃ রাব্বী নিজেকে হাসপাতালের চার দেয়ালের মধ্যে বন্ধ করে রাখতে পারেননি, পথে নেমে এসেছিলেন সহকর্মীদের নিয়ে জনতার সঙ্গে, আওয়াজ তুলেছিলেন স্বাধীকারের তথা স্বাধীনতায়। এ বিষয়টি পাক পশু বাহিনীর দৃষ্টি এড়ায়নি, সেদিনই ডাঃ রাব্বী তালিকা ভুক্ত হয়েছিলেন অন্তর্ভূক্ত হয়েছিলেন কালো তালিকার। যে তালিকায় কারো নাম উঠলে পাক পশুদের বিধানে এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার থেকে তিনি বঞ্চিত হতেন। আল-বদর সব জায়গাতেই ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ে, বেতারে, সংবাদপত্রে এমন কি মেডিক্যাল কলেজেও।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ এ দেশের বহু প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রাণ কেন্দ্র, বায়ান্ন সালে ভাষা আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র মেডিকেল কলেজ, পঞ্চাশ দশকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ আর তার ছাত্রাবাস ছিল প্রগতিশীল শিল্প সাহিত্য আর সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র। সে যুগে যাদের কেন্দ্র করে ঢাকা মেডিকলে কলেজ সব প্রগতিশীল আন্দোলনের পুরোধায় থাকত ডাঃ ফজলে রাব্বী, ডাঃ আলীম চৌধুরী তাঁদের অন্যতম। মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক হিসেবেও তাঁদের এই ভূমিকায় কোন ছেদ পড়েনি, এই ঐতিহ্য তাঁরা ছড়িয়ে দিতেন তাঁদের ছাত্রদের মধ্যে, সহকর্মীদের মধ্যে, তাঁদের এ ভূমিকা চোখ এড়ায়নি পাক পশু বাহিনীর আর তাদের অনুচরদের তাই তাদের নাম উঠে গেল সেই কালো খাতায়। সর্বোপরি মুক্তি যুদ্ধে প্রত্যেক্ষ সহায়তা দান করতেন ডাঃ রাব্বী, ডাঃ আলীম চৌধুরী। অর্থ, ওষুধ, চিকিৎসা দিয়ে সাধ্যমতো সাহায্য করতেন ডাঃ রাব্বী, নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে হানাদার কবলিত বাংলাদেশে ঐ বিপজ্জনক কর্ম থেকে দুরে থাকতে পারেননি তিনি।

হানাদার কবলিত বাংলাদেশের অসহায় রুগ্ন মানুষদের ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারলেন না তিনি, নিজের অসুস্থ অবস্থায়ও। অবিচল রইলেন নিজের কর্তব্য কর্মে অটল রইলেন আত্মবিশ্বাসে। বলি হলেন পশু শক্তির।

ডাঃ রাব্বীর সঙ্গে আমার শেষ দেখা একাত্তুরের ত্রিশে জুলাই তারিখে, আমার আব্বা তখন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যু শয্যায়, শেষ চেষ্টা করে দেখার জন্যে আমার কলেজ জীবনের বন্ধু ডাঃ রাব্বীকে সেদিন খুঁজে নিয়ে এলাম, আব্বাকে একবার দেখতে বললাম। আব্বাকে দেখে ব্যবস্থাদি করে দিয়ে রাব্বী সাহেব আমাকে ধরে নিয়ে গেলেন একটা অন্ধকার কামরায়, ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞেস করলেন আমি কেন এখনও দেশ ছাড়িনি? বললাম মৃত্যু পথ যাত্রী আব্বাকে ছেড়ে কি করে যাব। তিনি আমার হাতটা ধরে বললেন, 'জানেন আমার ছেলেটার কোন খোঁজ নেই', তারপর বললেন 'চলুন আমরা দু'জনে চলে যাই', আমি বললাম 'আব্বাকে ফেলে কি করে যাব? আব্বার একটা কিছু হয়ে গেলে সিদ্ধান্ত নেব, তখন আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।' সে সুযোগ আর আমার হয়নি, আব্বাকে হারালাম ৩০শে জুলাই আর তার কয়েকদিন পরেই আমি ধরা পড়ে গেলাম। ডাক্তার রাব্বীর সঙ্গে আর যোগাযোগ করতে পারিনি, পালিয়ে যেতে পারিনি নিরাপদ অঞ্চলে। ডাক্তার রশীদ চলে গিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর ভাই অধ্যাপক গিয়াসউদ্দীন যেতে পারেননি। পরে তিনি আল-বদরের শিকার হন, আজ আফসোস হয় ডাক্তার রাব্বীও যদি ডাক্তার রশিদের মতোই চলে যেতেন।

ডাক্তার রাব্বী যে বিপদের আশংকা করতেন না তা নয় তিনি খুবই উদ্বেগ এবং চিন্তার মধ্যে দিন যাপন করছিলেন। সামরিক চক্র এবং তাদের অনুচরেরা যে তাঁকে বিষ দৃষ্টিতে দেখত ডাক্তার

রাব্বী তা খুব ভাল করেই জানতেন এবং বুঝতেন কিন্তু ডাক্তার রাব্বীর মতো অতি পরিচিত, খ্যাতিমান ডাক্তারের পক্ষে কি আত্মগোপন করা সম্ভবপর ছিল? তাঁর ওপরে পাক-বাহিনীর আগাগোড়াই দৃষ্টি ছিল, তাঁকে গবর্নর হাউজে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, অভিযোগ করা হয় যে তিনি মার্শাল ল-এর সঙ্গে সহযোগিতা করছেন না। ডাক্তার রাব্বীর বিরুদ্ধে সামরিক কর্তৃপক্ষ মিথ্যা মামলাও সাজিয়েছিল। তাঁর একটি সখের বন্দুক ছিল 'চার্চিল এণ্ড চার্চিল' কোম্পানীর, সামরিক কর্তৃপক্ষের আদেশে তিনি বন্দুকটি জমা দিয়েছিলেন কিন্তু সেই বন্দুকটি ফেরত চেয়েও তিনি তাদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। ডাক্তার রাব্বীকে সব চেয়ে বেশী পীড়ন করেছিল মেডিক্যাল কলেজের কয়েকজন অবাঙালী ছাত্র, ইসলামী ছাত্র সংঘ ভুক্ত ঐ ছাত্র নামধারী বদরেরা সর্বদা ডাক্তার রাব্বীকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করত, টাকা আদায় করত। এমনই এক অসহনীয় পরিস্থিতির মধ্যে জীবন-যাপন করছিলেন ডাক্তার রাব্বী, তারপরে যুদ্ধ বেঁধে গেল ৩রা ডিসেম্বর। ১৪ই ডিসেম্বর পর্যন্ত কেটে গেল কোন রকমে। ১৫ই ডিসেম্বর কিছুক্ষণের জন্যে কারফিউ উঠে গেলে তিনি বাজারে গিয়েছিলেন আর সেদিন দুপুরে গিয়েছিলেন তিনি তাঁর প্রতিবেশী জনাব এস. এম. মুর্শেদের বাড়ী, মুর্শেদ সাহেব, বেগম মুর্শেদ ডাঃ রাব্বীকে অনুরোধ করেছিলেন ওদের বাড়ীতে থেকে যেতে কিন্তু একবার টেলিফোন করে বাড়ী ফিরে গেলেন তিনি। ১৫ই ডিসেম্বর বিকেল চারটায় আল-বদরের জল্লাদেরা ডাক্তার রাব্বীর বাড়ী ঘেরাও করে, মাধ্যাহ্নে ভোজনের পরে ডাক্তার রাব্বী তখন ওপরে বারান্দায় বসে ছিলেন। দু'জন বদর দরজা ধাক্কা দিলে ডাক্তার রাব্বী নিজেই দরজা খুলে দেন তারপর বন্দুক ধরে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। সম্ভবতঃ এই দলটিই ডাক্তার আলীম চৌধুরীকেও অপহরণ করে এবং এই দুই বন্ধুকে মোহম্মদপুরের কাঁটাবনে

জলাভূমিতে নিয়ে গিয়ে পৈশাচিকভাবে হত্যা করে ঐ রাত্রেই। পরে উভয়ের মৃতদেহ ঐ অঞ্চল থেকে উদ্ধার করা হয়। ১৫ তারিখ রাত্রে যখন ডাক্তার রাব্বীর আত্মীয় পরিজনেরা টেলিফোনে ডাক্তার রাব্বীর সংবাদ সংগ্রহ করার চেষ্টা করছিলেন তখন লেঃ কঃ হেজাজী জানিয়েছে, ডাক্তার রাব্বীকে ক্যান্টনমেণ্টে নেওয়া হয়েছে। ডাক্তার আলীম চৌধুরীর ক্ষেত্রেও জানান হয়েছিল যে তিনি ক্যান্টনমেণ্টে সি. এম. এইচ.-এ আছেন, মওলানা মান্নান বলেছিল ডাক্তার রাব্বী ডাক্তার আলীম চৌধুরীকে চিকিৎসা করার জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এরা কি জানতনা কোথায়, কেন নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওদের? স্বাধীনতার পূর্বলগ্নে বদর বাহিনীর শেষ শিকার ডাক্তার ফজলে রাব্বী, ডাক্তার আলীম চৌধুরী। বাংলামায়ের ছুটি সোনার টুকরো, এমন প্রতিভা আবার কবে জন্ম নেবে এই দেশে?

অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী

পঁচিশে মার্চ থেকে যে ভয়াবহ রক্তাক্ত পৈশাচিকতার পুনরাবৃত্তি বাংলাদেশে নয়টি মাস ধরে প্রতিনিয়ত ঘটেছে তা অবলোকন করেও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী দেশ ছেড়ে গেলেন না। অথচ সুযোগ ছিল তাঁর সবচেয়ে বেশী। শান্তিনিকেতনে গিয়ে তিনি নয় মাস কেন নয় বৎসর কাটিয়ে দিতে পারতেন। সেখানে তিনি সসম্মানে সপরিবারে শান্তিতে স্বস্তিতে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো কাটিয়ে আসতে পারতেন, সেখানে সবাই তাঁর জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছেন কিন্তু তিনি দেশ ছেড়ে গেলেন না। মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী নামটির সঙ্গে শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্রনাথ, বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য ও বঙ্গ সংস্কৃতির নাম এমন অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত ছিল যে, হানাদার কবলিত বাংলাদেশেই নয় আগেও পাকিস্তানে বসবাসই তার পক্ষে বিপদজনক ছিল কিন্তু তিনি সে সম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য করেছিলেন। হানাদার কবলিত বাংলাদেশে বিশেষতঃ দালাল অধ্যুষিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর উপস্থিতি দালাল শিক্ষকদের এবং তাঁদের শিষ্যদের অর্থাৎ আলবদরের উষ্মা ও জ্বালার কারণ হয়েছিল, ফলে 'ইসলাম' ও 'পাকিস্তান' বিরোধী বুদ্ধিজীবীদের যে তালিকা দালালরা প্রণয়ন করল তাতে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর নাম গুরুত্ব সহকারে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে অর্থাৎ পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করেন; তখন থেকে তিনি বিভিন্ন ঠিকানায় থাকতে শুরু করেন। বস্তুতঃ ৭ই ডিসেম্বর থেকে এক এক দিন এক এক জায়গায় রাত্রি যাপন করেন তিনি, তার থেকে মনে হয় তাঁর আসন্ন বিপদ সম্পর্কে তিনি একেবারে উন্নাসিক ছিলেন না যেমনটি তিনি ছিলেন পুরো মুক্তিযুদ্ধের সময়টা। যখন তিনি নিজের বিপদের সম্ভাবনাকে আমল না দিয়ে খোলাখুলি ভাবে ঢাকা শহরে চলাফেরা করেছেন, বন্দী সহকর্মীদের পরিবারবর্গের নিয়মিত খোঁজ খবর নিয়েছেন, তাদের মুক্তির ব্যবস্থার জন্যে বিভিন্ন মহলে মাথা খুঁড়েছেন। মহৎ প্রাণ মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, যিনি ঐ ভয়াবহ দিনগুলোতে সহকর্মীদের চরম বিপদের সময়ে স্থির থাকতে পারেননি, নিজের নিরাপত্তাকে বিসর্জন দিয়ে প্রাণপাত করেছেন বন্দী সহকর্মীদের নিরাপত্তার জন্যে, তাদের পবিবারবর্গের সাহায্যের জন্যে। এই মহৎ প্রাণ মনীষী তাই অপরাধী হলেন দালালদের চোখে। তাই আল বদরেরা একই সঙ্গে তুলে নিয়ে গেল অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী আর অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীকে। অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ও অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীকে একই গাড়ীতেই তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রথমে যমদুতেরা এসেছিল বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ায় তার জন্যে, সেখানে তিনি ছিলেন না, ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে তিনি ছিলেন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা লুৎফুল হায়দার চৌধুরীর বাড়ীতে। ফুলার রোডের বাড়ীতে তাঁর খোঁজে আল-বদরেরা এলে তাঁরই গৃহভৃত্য নুরু জল্লাদদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় লুৎফুল হায়দার চৌধুরীর বাড়ীতে। অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী তখন মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্যে তৈরী হচ্ছিলেন কিন্তু সে সুযোগ আর তাঁকে দেয়া হয়নি। যারা তাঁকে নিতে এসেছিল তারা বলে গিয়েছিল, 'স্যারকে আমরা যত্নে

রাখব', মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী শেষ কথা বলে গিয়েছিলেন 'আমি কোন অন্যায় করিনি আমি ফিরে আসব।' কিন্তু তিনি জানতেন না অন্যায় না করাটাই তাঁদের সবচেয়ে বড় অপরাধ আর সেজন্যেই তাঁদের বলি হতে হলো অন্যায়ের খড়্গের কাছে। অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী আর অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী এই দুই সুহৃদ একই সঙ্গে শেষ যাত্রা করেন তার তাদের কোন খবর পাওয়া যায়নি, এমন কি মৃতদেহও না। পশুরা তাদের কোন চিহ্ন অবশিষ্ট রাখেনি পাছে তাদের সমাধি হয়ে ওঠে বাঙালী জাতির পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, নোয়াখালী জেলার দুই কৃতী সন্তান, বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির দুটি উজ্জ্বল নক্ষত্র, ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামী, রক্ষণশীলতা আর সাম্প্রদায়িকতার দুই ভয়াবহ শিকার অথচ তাদের কোন সমাধি নেই। আমরা নাম না জানা শহীদ সৈনিকের সমাধি দেখেছি কিন্তু সমাধি বিহীন দুইটি অমর নাম 'মুনীর চৌধুরী' 'মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী' যাদের অভাবে শুধু বাংলা বিভাগ নয়, শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, শুধু আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি অঙ্গন নয় সমগ্র দেশ ও জাতি আজ ম্লান। কবে আবার বঙ্গজননী 'মুনীর চৌধুরী', 'মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর' মত প্রতিভার জন্ম দেবে কে জানে? আজ আমাদের গর্ব করার মত আর কিছু রইলনা শুধু তাঁদের অম্লান স্মৃতি ছাড়া। যে স্মৃতি যুগ যুগ ধরে আমাদের প্রেরণা যোগাবে, উদ্দীপিত করবে— ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সেবায়।

অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী

মুক্তি সংগ্রামের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের কোন অধ্যাপক দেশত্যাগ করেননি। চট্টগ্রাম এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান প্রধান অধ্যাপকদের প্রায় সকলেই দেশত্যাগ করে মুজিবনগরে গমন করেন এবং স্বাধীনতার পরে নিরাপদে স্বদেশে ফিরে আসেন। অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষকরা দেশত্যাগ না করার ফল হাতে হাতে ভোগ করেন। তিনজন অধ্যাপককে প্রাণ দিতে হয়, দুইজন অধ্যাপক পদচ্যুত হন, দুইজন অধ্যাপককে হুলিয়া মাথায় নিয়ে পুরো মুক্তিযুদ্ধের সময়টা আত্মগোপন করে থাকতে হয়, একজনকে টিক্কা খান সতর্ক করে দেয়, আর একজন পাকিস্তানী সামরিক বন্দী শিবিরে নিক্ষিপ্ত হন। বাংলা বিভাগের যে তরুণ অধ্যাপকটি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তিনিও দেশত্যাগ করেননি, যশোর অঞ্চলে দেশের মধ্যেই যুদ্ধ করেছেন। বাংলা বিভাগে ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ ছাড়া অপর সকল অধ্যাপককে পাক সামরিক চক্র বিশেষতঃ তাদের অনুচরেরা ভয়ংকর শত্রু বিবেচনা করত। বাংলা ভাষা, সাহিত্য, লিপি, রবীন্দ্রনাথ তথা বাঙ্গালী সংস্কৃতির অতন্দ্র প্রহরী বাংলা বিভাগ যখন ২৫শে মার্চের আক্রমণের পরেও টিকে রইল তখন তা হল জামাতে ইসলামী, ইসলামী ছাত্র সংঘ, বিএনআর

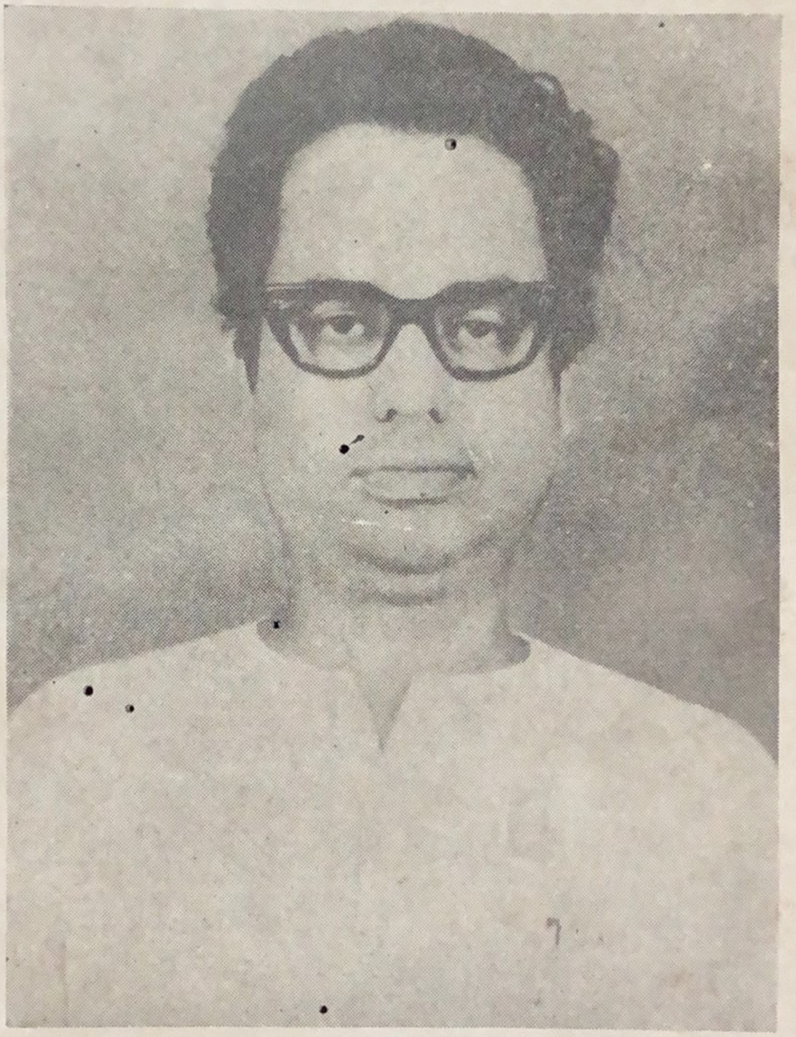

আল-বদর, রাজাকার, আল-শামসদের যন্ত্রণার কারণ। দালাল, রাজাকার, আল-বদর, জামাতে ইসলামী অধ্যুষিত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, প্রমুখ বাঙ্গালী সংস্কৃতির ধারক ও বাহকেরা জীবন্ত ঘুরে বেড়াবেন, পাঠ্য তালিকা থেকে রবীন্দ্রনাথ, বংকিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র বাদ দেবেন না, তাঁদের ক্লাসে ছাত্র আসলে বিরক্ত হবেন, দালাল শিক্ষকদের সভায় যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানাবেন, এমনকি বন্দী শিবিরে অকথ্য অত্যাচারের মুখেও মিথ্যা স্বীকারোক্তিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানাবেন, এমন দুঃসাহসের শাস্তি তাদের পেতে হল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষকেরা মুক্তিযুদ্ধের সময় স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাঁরা প্রাণভয়ে দেশত্যাগ করবেন না, মরতে হয় দেশের মাটিতেই মরবেন; কিন্তু বিভাগ ছেড়ে গিয়ে দেশ ছেড়ে গিয়ে দালালদের হাতে বাঙালী সংস্কৃতির পীঠস্থান বাংলা বিভাগকে ছেড়ে দিয়ে এই বিভাগের মহান ঐতিহ্যকে কলংকিত করতে দেবেন না। তাঁরা তাদের সংকল্প অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই-র ঐতিহ্যপূর্ণ বাংলা বিভাগ একটি দিনের জন্যেও দালালদের হাতে পড়েনি। কিন্তু সে জন্য কি মূল্য দিতে হল এই বিভাগকে? মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, আনোয়ার পাশার মতো প্রতিভাকে উৎসর্গ করতে হল স্বাধীনতার বেদীমূলে, দেশমাতৃকার কলঙ্কমোচনে তার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের আহুতি দিতে হল। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির এমন একনিষ্ঠ সেবক এমন অনন্য সাধারণ প্রতিভা বঙ্গজননী আবার কবে জন্ম দেবে কে জানে! স্বাধীনতার পর চতুর্দিকে প্রতিভাহীন ক্লীবদের আস্ফালন আর খিস্তি খেউড়ের যে বিরামহীন দৃশ্য আমরা অবলোকন করছি তাতে ঐ মনীষীদের অভাব আরও বিশেষভাবে অনুভব করছি,

আমাদের আর গর্ব করার কিছু রইলো না শুধু তাঁদের স্মৃতি ছাড়া।

পাক বন্দী শিবিরে পদার্পণ করেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম মুনীর চৌধুরীকে পাক জল্লাদেরা তাদের পয়লা নম্বর দুশমন বলে বিবেচনা করে এবং সুযোগ মতো তারা তাদের আঘাত হানবেই। সে কারণে বন্দী শিবিরের উৎপীড়ন কেন্দ্র এফআইসি থেকে স্পেশাল ব্রাঞ্চের একজন বাঙালী পুলিস কর্মচারী মারফত আমি মুনীর চৌধুরীকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম, সাবধান করে দিয়েছিলাম আর সব সহকর্মীদের, তাঁদের বলে পাঠিয়েছিলাম পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হওয়া মাত্রই তাঁরা যেন আত্মগোপন করেন। আমার স্থির ধারণা হয়েছিল শেষ মুহূর্তে চরম আঘাত আসবে। আমার এ আশংকার কথা বিভাগের সকলেই জানতেন, তাতে যাঁরা সতর্ক হয়েছিলেন তাঁরা বেঁচে গেছেন। ১লা ডিসেম্বর তারিখে পুনরায় আমাকে পাক বাহিনীর মেজর হায়দার এবং মেজর কোরেশী যে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ করে তাতে আমার ঐ ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়। আমি বুঝতে পেরেছিলাম আন্তর্জাতিক চাপে গ্রেফতারকৃত অধ্যাপকদের মুক্তি দিলেও তারা কিছুতেই রেহাই দেবে না আমাদের শেষ অবধি। পাক সামরিক চক্র তাদের ভৃত্য দালাল শিক্ষক ও ছাত্রদের মারফতে আমাদের প্রত্যেকের সম্পর্কে এমন বিশদ জানত যে আমাদের রেহাই পাবার কোন কারণই ছিল না, আর শেষ পর্যন্ত হলও তাই শেষ আঘাত তারা হানল চরম মুহূর্তে।

অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী পঁচিশে মার্চের বিভীষিকার পর বিশ্ববিদ্যালয় পাড়া ছেড়েছিলেন আর সেখানে ফিরে আসেননি, দালালদের প্রতিবেশী তিনি আর হননি; কিন্তু তাতেও কি শেষ রক্ষা হল? ১৪ই ডিসেম্বর দুপুর বেলায় তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে গেল আল-বদরের বাঙালী ছেলেরাই হাতীর পুলের পিতৃগৃহ থেকে। শেষ দেখাও তিনি করে যেতে পারলেন না তাঁর স্ত্রী, পুত্র, মা, ভাইবোনদের সাথে।

মুনীর চৌধুরীর আর কোন সন্ধান মেলেনি। মানবতার শত্রুরা তার কোন চিহ্ন অবশিষ্ট রাখেনি। মুনীর চৌধুরী গত বছর ডিসেম্বরে যুদ্ধ ভয়াবহভাবে শুরু হবার প্রাক মুহূর্তে একটি চিঠি লিখেছিলেন তাঁর সহকর্মী ও ছাত্র অধ্যাপক আকরম হোসেনের কাছে।

চিঠি তিনি শেষ করতে পারেন নি এবং বলাবাহুল্য ডাকে দেয়াও সম্ভব হয়নি।

দেশ শত্রুমুক্ত হবার কিছুদিন পর আকরম হোসেন যখন তাঁর স্বগ্রাম থেকে ঢাকায় ফিরে আসেন তখন মুনীর স্যারের বাসা থেকে এই ছোট্ট চিরকুটটি উদ্ধার করেন। এইটেই মুনীর চৌধুরীর শেষ চিঠি বা শেষ লেখা।

প্রিয়বরেষু,

> তোমার উভয়পত্র হস্তগত। আশ্চর্য এখনও প্রায় সবাই জীবিত অন্ততঃ। রফিক কিছুকাল আটক থেকে এখন মুক্ত যাকে বলে। অন্য দুজন অনাসক্ত উধাও ফেরার। আমার তো বটেই, অন্য সবার মনেও তুমি আবেগোষ্ণ স্পন্দিত উজ্জ্বল অম্লান। বেতারে ঘোষিত যশোহর ধূমায়িত ম্রিয়মান। আবার কি দেখবো তোমাকে চোখের সামনে প্রাণে, মেলাব প্রাণ? তোমার কথার রত্নভাণ্ডারে ভরে তুলবে আমার রচনা সম্ভার? কখনও কি লিখব আবার?

শহীদুল্লা কায়সার

আমাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জগতের এক উজ্জল নক্ষত্র শহীদুল্লা কায়সার। বামপন্থী রাজনীতির পথিকৃৎ শহীদুল্লা কায়সার, প্রবীণ সাংবাদিক শহীদুল্লা কায়সার, ঔপন্যাসিক শহীদুল্লা কায়সার ২৯শে মার্চ তারিখে 'সংবাদ' পুড়িয়ে দেওয়া হলেও তিনি দেশ ত্যাগ করলেন না। কনিষ্ঠ জহির রায়হান বার বার চেষ্টা করেছেন 'বড়দা'কে নিয়ে ওপারে চলে যেতে কিন্তু তিনি কিছুতেই দেশ ছেড়ে গেলেন না। 'জীবন থেকে নেয়া' ছবির পরিচালককে ২৫শে মার্চ থেকেই মিলিটারীরা খুঁজছিল ফলে কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থেকে ২৫শে এপ্রিল জহির চলে গেলেন। কিন্তু শহীদুল্লা কায়সার থেকে গেলেন। ২৫শে মার্চের বিভীষিকার বিবরণী দিয়ে জহির রায়হান যখন ওপার থেকে বেতারে দীর্ঘ কথিকা প্রচার করলেন তখন বিপদের আশঙ্কা করেও শহীদুল্লা যাবার কথা ভাবলেন না। পার্টি' সূত্র থেকে বার বার তাঁকে আহ্বান জানান হয়, শেষবার মণি সিং লেখেন তাঁকে 'আর ওখানে থাকা সঙ্গত নয়'? লাল কালি দিয়ে নিম্নরেখ করে দেন কথাগুলি তবুও দেশ ছাড়লেন না শহীদুল্লা কায়সার। আগস্ট মাসের দিকে একবার ভেবেছিলেন তিনি চলে যাবেন, খবরও পেয়েছিলেন জহির রায়হান, দাদার জন্যে বাড়ী ঠিক করেছিলেন, রোজগার করতে শুরু করেছিলেন, অথচ শহীদুল্লা গেলেন না। কেন গেলেন না?

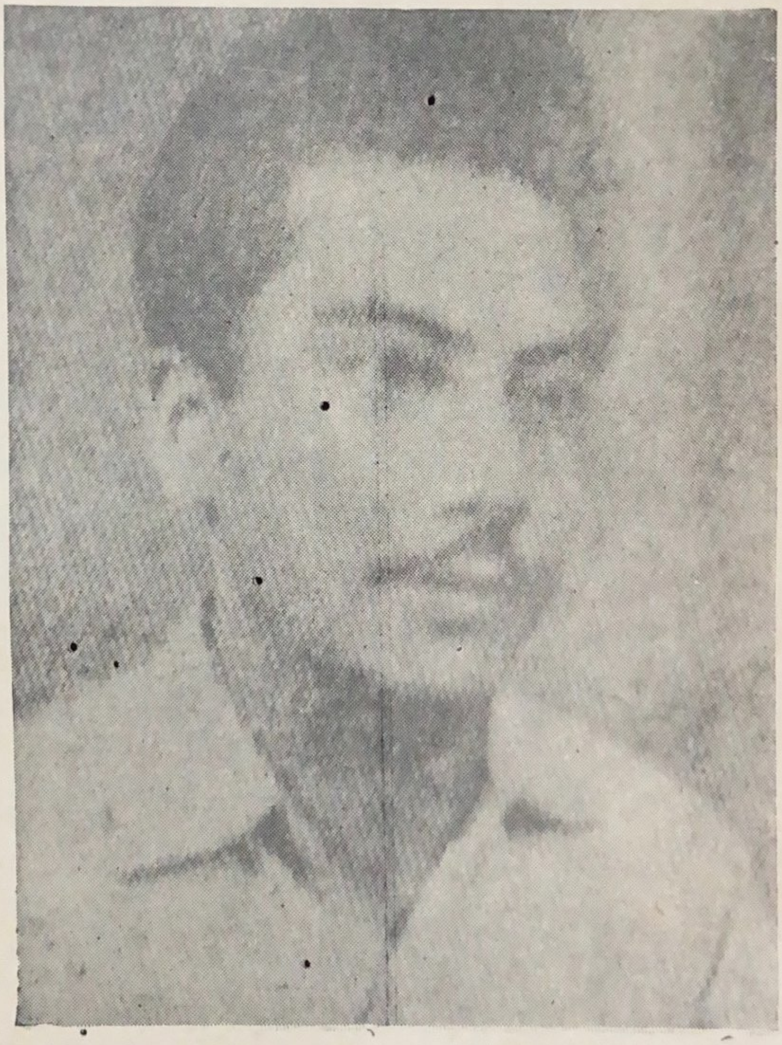

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসকাল শহীদুল্লা কোন চাকুরী করেননি কোন আয় ছিল না তাঁর, তবে কাজ করছিলেন তিনি, একটা কাজের মত কাজ। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের পটভূমিকায় একটি বিরাট উপন্যাস তিনি রচনা করছিলেন। মোট ৩টি খণ্ডে তিনি উপন্যাসটির পরিকল্পনা করেছিলেন, দুই খণ্ডে ৫০০ পৃষ্ঠার মতো লিখে শেষ করেছিলেন তিনি এই নয় মাসে, পরিকল্পনা ছিল তৃতীয় বা শেষ খণ্ডটি তিনি সমাপ্ত করবেন বাস্তুহারা শিবিরে গিয়ে, সেটি আর হয়ে উঠল না। সারা রাত জেগে তিনি লিখতেন সকালে মাটির নীচে তা পুঁতে রাখতেন। এই উপন্যাস রচনার জন্যেই তিনি দেশ ছাড়তে পারেননি, প্রকৃত মুক্তি-সংগ্রাম চলছিল দেশের মধ্যেই, যে সংগ্রামের অংশীদার ছিলো নিজ দেশে পরবাসী সাড়ে ছয় কোটি মানুষ। এই মহান সংগ্রাম ছেড়ে কোথায়ও চলে যাবার কথা ভাবতে পারতেন না শহীদুল্লা কায়সার। কোন মহৎ শিল্পীই তা করতে পারতো না, একটি জাতির জীবন-মরণ সংগ্রামের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে দূরে পালিয়ে যেতে পারে না কোন সংগ্রামী শিল্পী। শহীদুল্লা কায়সারও পারেননি, কাপুরুষের মতো পালিয়ে গেলে হয়তো তিনি জীবন বাঁচতে পারতেন কিন্তু ঐ মহান অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হতেন।

শুধু সাহিত্য কর্ম নয়, শুধু শিল্পীর দায়িত্ব পালন নয়, দেশের মধ্যে থেকেও সর্বদা চেষ্টা করেছেন আপন কর্তব্য করে যেতে। সংবাদের বেকার কর্মচারীদের সাহায্য করতে চেষ্টা করতেন, চেষ্টা করতেন সাহায্য করতে মুক্তি সংগ্রামীদের। অনেককে ওপারে চলে যেতেও সাহায্য করেন তিনি। ভাসানী পন্থী ন্যাপের কোষাধ্যক্ষ সায়ীদুল হাসানকে যখন মিলিটারী ইনটেলিজেন্স ফাঁদে ফেলে, যখন সিলেটের জমিদার নির্মল চৌধুরীর মুক্তিপণ বাবদ লেঃ কর্নেল মাকসুদ তাঁর কাছ থেকে কয়েক লক্ষ টাকা দাবী করে তখন শহীদুল্লা কায়সার চেষ্টা করেছিলেন তাঁকে সাহায্য করতে। সায়ীদুল হাসানকে যখন

লেঃ কর্নেল মাকস্থদ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল থেকে রহস্যজনকভাবে অদৃশ্য করে ফেলে তখন তাঁর নিরাপত্তার জন্য শহীদুল্লা কায়সার প্রাণপণ চেষ্টা করেন। সে সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানী ন্যাপনেতা মাহমুদ আলী কাস্থরী ঢাকায় এসেছিলেন, তার কাছে ছুটে যান শহীদুল্লা কায়সার, সায়ীদুল হাসানকে রক্ষা করার আকুল আবেদন জানান কাস্থরীকে। তিনি সফল হননি, কারণ সায়ীদুল হাসান এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের এক জঘন্য চক্রান্তের শিকার হয়েছিলেন। কিন্তু সেই অন্ধকারময় দিনে একমাত্র শহীদুল্লা কায়সারই নিজের নিরাপত্তাকে বিপন্ন করে এগিয়ে এসেছিলেন হতভাগ্য সায়ীদুল হাসানকে রক্ষা করতে।

শহীদুল্লা কায়সার কিন্তু নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেননি, তাই আগস্ট মাসে ওপারে চলে যাবার কথা একবার ভাবলেও সে সংকল্প পরিত্যাগ করে, ধানমণ্ডিতে যে বাড়ীতে লুকিয়ে ছিলেন সেখান থেকে কায়েতটুলীতে পৈতৃক বাসস্থানে ফিরে যান। তিনি সম্ভবতঃ ধরে নিয়েছিলেন তাঁকে গ্রেফতার করা হবে, যেমন আহমদুল কবির বা ডাঃ ওয়াহুদকে করা হয়েছিল, তিনি সেজন্যে মানসিক দিক দিয়ে প্রস্তুত ছিলেন। পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে তিনি অবশ্য খুব বিচলিত হয়ে পড়েন, তখন বোধ হয় তিনি বুঝতে পারছিলেন কি ঘটতে যাচ্ছে, তিনি তখন বলতেন, 'এবারে সব ধরে ধরে নিয়ে মারবে পাকিস্তানীরা', যেদিন রাতে পি,আই.-এর বিহারী পাইলট ইউস্থফ প্ল্যান্ট প্রটেকশনের এরোপ্লেনটা দিয়ে তেজগাঁয়ের এতিমখানায় বোমা ফেলে অসংখ্য মাস্থম বাচ্চাকে হত্যা করল সেদিন শহীদুল্লা কায়সার খুবই চিন্তিত ছিলেন। কিন্তু তখনও বোধ হয় তিনি তাঁর ভয়াবহ পরিণতির কথা ভাবতে পারেননি, নইলে রাশিয়ান দুতাবাস থেকে ১১ই ডিসেম্বর তারিখে যখন তাঁকে সেখানে গিয়ে সপরিবারে আশ্রয় নিতে অনুরোধ জানান হয়, তখন তিনি সে স্থযোগ গ্রহণ করলেন না কেন? ১৪ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় যখন বদরেরা শহীদুল্লা

কায়সারকে ধরতে গিয়েছিল তখনও তিনি লুকোতে পারতেন, পালিয়ে যেতে পারতেন। বেগম শহীদুল্লা কায়সার তাঁকে লুকিয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শহীদুল্লা কায়সার রাজী হলেন না। তিনি শিকার হলেন আল-বদরের।

১৪ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় কায়েতটুলীর বাড়ী ঘেরাও করে তাঁকে ধরতে যায় আল-বদর, বাড়ীর নীচে তারা অনেকে ছিল ওপরে যায় তিনজন, গিয়েই শহীদুল্লা কায়সারের হাত ধরে টানতে থাকে, তিনি ওদের বলেন, 'হাত ছেড়ে দাও আমি যাচ্ছি।' বেগম চৌধুরীকে শুধু বলেন, 'আমি যদি ধরা না দেই আমার ভাইগুলিকে মেরে যাবে।' যাবার সময় আর কিছুই বলে যেতে পারেননি তিনি, পেছন ফিরে তাঁকাতে চাইলেন পারলেন না, মুখটা মলিন হয়ে গেল। নিঃশব্দে যমদূতদের গাড়ীটা তাঁকে নিয়ে চলে গেল আর কোনদিন কোন খবর পাওয়া গেল না শহীদুল্লা কায়সারের। সেদিন সারাদিন তাঁর বন্ধু শিল্পপতি সাদরী ইস্পাহানী তাঁকে টেলিফোন করেছেন, বারবার শহীদুল্লা তাকে ভরসা দিয়েছেন, আশ্বাস দিয়েছেন। তারপর যখন তিনি নিজেই শিকার হলেন আল-বদরের, তখনই সঙ্গে সঙ্গে, শহীদুল্লা নীচে নামতে নামতেই বেগম শহীদুল্লা কায়সার টেলিফোন করলেন সাদ্‌রি ইস্পাহানীকে, ১৪ই ডিসেম্বর থেকে ১৭ই ডিসেম্বর এই চারটি দিন বার বার বেগম কায়সার তাকে টেলিফোন করছেন, অনুনয় করেছেন শহীদুল্লার খোঁজ করতে, তাঁর নিরাপত্তা বিধান করতে, সাদ্‌রি তাঁকে বার বার মিথ্যা সান্ত্বনা দেন, চিন্তা করতে মানা করেন। ১৪ই ডিসেম্বর রাত নয়টার পর থেকে কারফিউর মধ্যেও সাদ্‌রি ইস্পাহানীকে টেলিফোনে অনেকক্ষণ পাওয়া যায়নি, মনে হয় ঐ সময় তিনি বাঁইরে গিয়েছিলেন। পরে অনেক রাতে তাঁকে আবার টেলিফোনে পাওয়া যায়, তখন তিনি জানান যে, তাঁর বাবা অসুস্থ এবং তিনি তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন, এই সময়

তিনি প্রথম বেগম শহীদুল্লা কায়সারকে জানান যে তাঁর স্বামীকে বোধ হয় গ্রেফতার করা হয়েছে। ব্রিগেডিয়ার বশিরকেও বেগম কায়সার টেলিফোন করে, তিনিও ঐ একই কথা বলেন চিন্তার কোন কারণ নেই, গ্রেফতার করা হয়েছে তবে রাজবন্দীর সুবিধা পাবেন ইত্যাদি। স্বাধীনতার পরে অবশ্য ব্রিগেডিয়ার বশির এ সব কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। শহীদুল্লা হত্যা মামলার এক আসামী নাকি বলেছিল 'শওকত এমরান নামে মেডিকেল কলেজের একজন বদর ছাত্র সব কিছু জানে' কিন্তু সে এখন কোথায়? কোথায় চৌধুরী মঈনুদ্দীন? কাদের সাহায্যে এরা বাংলাদেশ থেকে পালাতে পারল? এই সব জল্লাদ, খুনী, কশাইদের নিরাপদে দেশ স্বাধীন হবার পরে সীমানা পার করে দিল কারা? এরা পশ্চিম পাকিস্তানে যেতে পারল কি করে? যাদের সাহায্যে এই খুনীরা পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যেতে পারল তাদের সাহায্যেই যে এরা আবার পাকিস্তান প্রত্যাগত বাঙালী হয়ে এদেশে ফিরে আসছেনা তার নিশ্চয়তা কোথায়?

জহির রায়হান

‘জীবন থেকে নেয়া’ ছবির পরিচালক জহির রায়হানকে পঁচিশে মার্চ, একাত্তর থেকেই মিলিটারীরা খুঁজছিল ফলে গা ঢাকা দিতে হয়েছিল জহির রায়হানকে। এক মাস গা ঢাকা দিয়ে থেকে ২৫শে এপ্রিল জহির চলে গেলেন ওপারে। ‘স্বাধীন বাংলা বেতার’ থেকে প্রচার করলেন স্বকণ্ঠে দীর্ঘ কথিকা। সে তো কথিকা নয় বাংলাদেশে গণহত্যা ধ্বংসযজ্ঞ আর নারী নির্যাতনের জীবন্ত চিত্রায়ন। উদ্বাস্তু শিবিরে ঘুরে ঘুরে সৃষ্টি করলেন অমর তথ্য চিত্রাবলী, দুনিয়ার সামনে তুলে ধরলেন বাংলা দেশ আর বাঙালী জাতির ট্র্যাজেডী, তুলে ধরলেন পাকিস্তানীদের পৈশাচিক বর্বরতা। আট মাস অমানুষিক পরিশ্রম করে দেশে ফিরলেন।

শহীদুল্লাহ কায়সার অদৃশ্য হয়ে গেলেন ১৪ই ডিসেম্বর আর ১৭ই ডিসেম্বরে ফিরে এলেন জহির রায়হান। সারাদিন তিনি ছবি তোলেন ঘুরে ঘুরে, কিছুই জানেন না তখনও। সব শুনতে পেলেন সন্ধ্যায় বাড়ী এসে। নিজেকে অপরাধী মনে হল জহির রায়হানের, মা, ভাবী কারও সঙ্গে দেখা করলেন না তিনি, শপথ নিলেন ‘বড়দা’কে ফিরিয়ে আনবেনই। রেডক্রসের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন কিন্তু কোন হদিস মিলল না। ক্যান্টনমেন্ট-এ গিয়ে বন্দী শিবিরে ব্রিগেডিয়ার বশিরকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন কিন্তু ঐ পিশাচ সব

অস্বীকার করল। পুলিশ, আই-বির কাছে গেলেন কিন্তু ঐ সব বিভাগ তখনও সংঘবদ্ধ নয়, সংগঠিত নয়। তাতেও দমে গেলেন না জহির রায়হান, বেসরকারী তদন্ত কমিশন গঠন করলেন তিনি, মুক্তিবাহিনীর ক্র্যাক প্ল্যাটুনের ছেলেদের নিয়ে রাজাকার আর আল-বদরের সব ক্যাম্পগুলো তিনি সার্চ করলেন। ফলে অনেক কাগজপত্র পাওয়া গেল, খালেক মজুমদারকে গ্রেফতার করা হল। আল-বদরদের গোপন সভার খবর পুলিশকে জানালেন তিনি। জহির রায়হানের মনে একটা ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে কিছু বুদ্ধিজীবী বোধ হয় তখনও জীবিত আছেন, একজন ধৃত আল-বদর নাকি বলেছিল যে ৩রা জানুয়ারী পর্যন্ত কিছু বুদ্ধিজীবী জীবিত ছিলেন। বুদ্ধিজীবী হত্যা ষড়যন্ত্র সম্পর্কে একটি শ্বেতপত্রও তৈরী করছিলেন তিনি। ইতিমধ্যে পরিবারের সকলকে নিয়ে জহির রায়হান আজমীর শরীফ গিয়ে খাজা বাবার দরগা জেয়ারত করে আসেন। আজমীর শরীফ থেকে ফিরে এসে ২৬শে জানুয়ারীতে তিনি কোন এক সূত্র থেকে এই মর্মে একটি খবর পান যে, মীরপুরের ১২ নং সেকশনে তখনও কিছু বাঙালী আটক আছেন। ২৭শে জানুয়ারী থেকে মীরপুরে গোলমাল শুরু হয়, এর মধ্যেও ৩০শে জানুয়ারী তারিখে জহির রায়হান মীরপুরে যান ঐ খবরের সূত্র ধরে 'বড়দা'র সন্ধানে। ভাবীকে বলে যান ১২টার মধ্যে বড়দা'কে নিয়ে ফিরব। কিন্তু তিনি আর ফিরে আসেনন নি। স্মরণীয় যে তারও প্রায় দুই সপ্তাহ পরে মীরপুর আত্মসমর্পণ করে কিন্তু কারও কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি, শহীদুল্লাহ কায়সার, নজমুল হক, সিরাজউদ্দীন হোসেন, নিজামুদ্দীন আহমেদ, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, মুনীর চৌধুরী কারও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। আর তাঁদের খুঁজতে গিয়ে চিরদিনের জন্যে হারিয়ে গেলেন জহির রায়হান!

জহির রায়হান আজমীর শরীফ থেকে ফিরে এসে যখন ২৬শে জানুয়ারী তারিখে খবর পান যে মীরপুরের ১২নং সেকশনে কিছু

বাঙালী আটক আছেন তখন মীরপুর এলাকা ভারতীয় বাহিনীর প্রহরাধীন ছিল। ইতিমধ্যে মীরপুর থেকে ভারতীয় বাহিনী সরে আসে এবং এলাকাটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রহরাধীনে যায়। ২৭শে জানুয়ারী থেকে মীরপুরে সশস্ত্র বিহারীরা গোলযোগ শুরু করে, ঐ দিনই মীরপুরে দুইজন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হন। ৩০শে জানুয়ারী মীরপুরে কারফিউ জারি করে সার্চ পার্টি পাঠান হয়, হাবিলদার হানিফের নেতৃত্বে এক সার্চ পার্টি'র সঙ্গে জহির রায়হান মীরপুরের ১২নং সেকশনে গিয়েছিলেন, তারপরে আর তাঁর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। ৩১শে জানুয়ারী তারিখে বাংলাদেশ বাহিনীর অপর একটি দল ঐ এলাকা খুঁজে সামরিক পোশাক পরিহিত দুই ব্যক্তির এবং ২৬ জন অসামরিক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করে কিন্তু তার মধ্যে জহির রায়হানের মৃতদেহ ছিল না।

এ ভাবেই জহির রায়হান এক ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করতে গিয়ে নিজেই শিকার হলেন আর এক ঘৃণ্য চক্রান্তের। জহির রায়হান সফল হলে বুদ্ধিজীবী হত্যা ষড়যন্ত্র ও রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ত তাই দেশ স্বাধীন হবার পরেও প্রাণ দিতে হল জহির রায়হানকে।

বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা ?
স্বর্গ কি হবে না কেনা ?
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন ?

বীরের এ রক্তস্রোত,
মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায়
হবে হারা ?
স্বর্গ কি হবে না কেনা ?
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না
দিন ?